Banglapdf.net

বিকাশ স্বরূপ'র

সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী উপন্যাস

স্লামডগ মিলিয়নেয়ার

আঠারো বছর বয়সী বস্তির এক ছেলে কুইজ শো'তে অংশ নিয়ে ১২টি প্রশ্নের সঠিক জবাব দিয়ে কিভাবে ১০০ কোটি রুপি জিততে পারে?

এ) সে প্রতিভাবান

বি) সে একজন জালিয়াত

সি) তার ভাগ্য ভালো ছিলো

ডি) এর জবাব নিহিত আছে *স্লামডগ মিলিয়নেয়ার*-এ

অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

SUVOM

Banglapdf.net

আঠারো বছরের বস্তির এক ছেলে ইতিহাসের সবচাইতে বড় কুইজ শো'তে অংশ নিয়ে বারোটি প্রশ্নের সঠিক জবাব দিয়ে একশো কোটি রুপি জিতে নেয়। কিন্তু তাকে তার প্রাপ্য পুরস্কার থেকে বঞ্চিত করতে জালিয়াতির মিথ্যে অপবাদে ধরিয়ে দেয়া হয় পুলিশের কাছে। কিভাবে বস্তির এক ছেলে এই অসাধ্য সাধন করলো–শুরু হয় সেই প্রশ্নের জবাব খোঁজা। উত্তরের জন্যে পাঠককে ভ্রমন করতে হবে বস্তির সেই ছেলের সমগ্র জীবন! সাসপেন্স, অ্যাডভেঞ্চার আর রোমান্সের এক অসাধারণ থৃলার। বর্তমান সময়ের সবচাইতে আলোচিত উপন্যাস *স্লামডগ মিলিয়নেয়ার*-এর সাথে পরিচিত হোন।

'এক দশকের মধ্যে সেরা 'ফিল-গুড' উপন্যাস'

–*টাইম*

'অসাধারণ কাহিনী, বৈচিত্রপূর্ণ, নানান ঘাত প্রতিঘাত...কোনোভাবেই মিস্ করা যাবে না—এমনই একটি উপন্যাস'

–*অবজার্ভার*

'জীবনের মতোই জীবন্ত, ফ্যান্টাসির মতোই রোমাঞ্চকর...সব মিলিয়ে ভালোলাগার একটি থৃলার'

–*সানডে টাইমস*

'উদ্দীপ্ত করার মতোই একটি আইডিয়া...উপন্যাসটি যখন পড়া শেষ করবেন পাঠক ভালোলাগার এক অদ্ভুত অনুভূতিতে আচ্ছন্ন থাকবেন'

–*সানডে টেলিগ্রাম*

'এটি যে অসাধারণ চলচ্চিত্র হবে সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। অপেক্ষায় রইলাম'

–*নিউই য়র্ক টাইম বুক রিভিউ*

'বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় এটি একজন ভারতীয় লেখকের প্রথম উপন্যাস...আবার এটাও ঠিক, কেবলমাত্র একজন ভারতীয়ের পক্ষেই সম্ভব ছিলো এরকম একটি উপন্যাস লেখা'

–*নিউইয়র্ক টাইম বুক রিভিউ*

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন...

ISBN 984872928-2
9789848729250

SUVOM

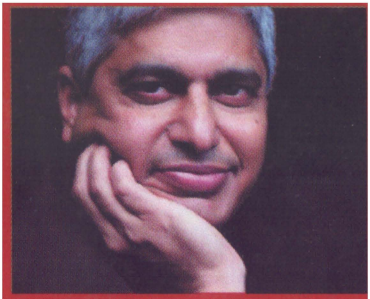

বিকাশ স্বরূপ একজন ভারতীয় কূটনৈতিক। কর্মসূত্রে দীর্ঘ দিন বিদেশে ছিলেন। চার বছর একান্ত গোপনে তিনি *স্লামডগ মিলিয়নেয়ার* (উপন্যাসটির প্রথম নাম ছিলো *কিউ অ্যান্ড এ*) লিখেছেন। সবাইকে অবাক করে দিয়ে আচমকা উপন্যাসটি যখন প্রকাশিত হয় তখন চারদিকে সাড়া পড়ে যায়। খুব বেশি দেরি না করে হলিউডের স্বনামখ্যাত পরিচালক ড্যানি বয়েল এটিকে চলচ্চিত্রে রুপান্তরিত করে ফেলেন—তার পর বাকিটা ইতিহাস। আটটি অস্কারজয়ী *স্লামডগ মিলিয়নেয়ার* বিশ্ব চলচ্চিত্রাঙ্গনে ঝড় তোলে।

এ পর্যন্ত বাংলাসহ একত্রিশটি ভাষায় উপন্যাসটি অনুবাদ হয়েছে। বিক্রি হয়েছে ৩০ মিলিয়ন কপিরও বেশি।

বিকাশ স্বরূপের দ্বিতীয় উপনাস *সিক্স সাসপেক্টস* অতিসম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

স্লামডগ মিলিয়নেয়ার

বিকাশ স্বরূপ'র

সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী উপন্যাস

স্লামডগ মিলিয়নেয়ার

অনুবাদ মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

শুভম ক্রিয়েশন

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

স্ক্যানিং
এডিটিং

শুভম

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

স্লামডগ মিলিয়নেয়ার

মূল : বিকাশ স্বরূপ

অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

SLUMDOG MILLIONARE

(priviously Published as **Q and A**)

copyright©2009 by Vikash Swarup

অনুবাদস্বত্ব © ২০০৯ বাতিঘর প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : মে ২০০৯

প্রচ্ছদ : ডিলান

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০; গ্রাফিক্স: ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০; কম্পোজ : অনুবাদক

মূল্য দুইশত টাকা মাত্র

স্লামডগ মিলিয়নেয়ার

মূলঃ বিকাশ স্বরূপ

অনুবাদঃ মোহাম্মাদ নাজিম উদ্দিন

কৃতজ্ঞতা

MOUSUMI

SCAN & EDITED BY:

SUVOM

WEBSITE:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

HTTPS://WWW.FB.COM/GROUPS/BANGLAPDF.NET

আমার বাবা-মা,
বিনোদ এবং ইন্দ্রা স্বরূপ

এবং আমার প্রয়াত দাদা
শ্রী জদদিশ স্বরূপ

মুখবন্ধ

একটা কুইজ শো জেতার জন্যে আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল শেষরাতে যখন তারা আমার কাছে আসে তখন এমনকি রাস্তার কুকুরগুলোও ঘুমিয়ে পড়েছিলো। আমার দরজা ভেঙে আমাকে হাতকড়া পরিয়ে অপেক্ষমান জিপ গাড়িতে ক'রে তুলে নিয়ে এসেছে তারা।

কোনো শোরগোল হয় নি। নিজের ছাপড়া ঘর থেকে একজন বাসিন্দাও বের হয়ে আসে নি। কেবল তেতুল গাছের বৃদ্ধ পেঁচাটা আমার গ্রেফতারে চিৎকার ক'রে বিলাপ করেছিলো।

লোকাল ট্রেনে পকেটমার হবার মতোই ধারাবি বস্তিতে গ্রেফতার হওয়াটা অতি সাধারণ ঘটনা। কোনো অসহায় বস্তিবাসীকে তুলে থানায় নিয়ে যাওয়া হয় না এরকম একটা দিনও পাওয়া যাবে না। এদের মধ্যে কাউকে কাউকে কনস্টেবলরা টেনে হিচরে নিয়ে যায়। নিয়ে যাবার সময় হাত-পা ছুড়ে চিৎকার চেচাঁমেচি করে তারা। আবার একেবারে চুপচাপও চলে যায় অনেকে। তারা হয়তো পুলিশের আগমনের অপেক্ষায়ই থাকে। তাদের জন্যে পুলিশের জিপ আসাটা এক ধরনের স্বস্তিও বটে।

আমার বেলায় হাত-পা ছুড়ে চিৎকার করাটাই সমুচিত ছিলো। নিজের নির্দোষিতা ঘোষণা করে আশেপাশের প্রতিবেশীদের জানিয়ে তোলাটাই ভালো হোতো। এতে যে কোনো লাভ হতো তাও নয়। কাউকে যদি ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলতামও সে আমার পক্ষ নিয়ে টু শব্দটিও করতো না। চেয়ে চেয়ে তারা দেখতো আর বলতো, "গেলো, আরেকজন গেলো।" তারপর তারা আবার ঘুমাতে চলে যেতো। এশিয়ার সবচাইতে বৃহত্তম বস্তিতে আমার এই প্রস্থানে কোনো ইতর বিশেষ হবে না। সকাল বেলায় পানির জন্যে ঠিক ঠিকই লাইন পড়বে। সকাল সাড়ে সাতটায় ঠিকই জীবন যুদ্ধে নেমে পড়বে সবাই।

তারা এমন কি আমার গ্রেফতার হবার কারণটা পর্যন্ত জানতে চাইবে না। আমার ঘরে যখন দু'জন কনস্টেবল এসে হানা দিলো তখন আমিও কারণটা জানতাম না। তোমার পুরো অস্তিত্বটাই যেখানে 'অবৈধ,' বসবাস করো শহরের

পরিত্যাক্ত কোনো জায়গায় অবৈধভাবে, ইঞ্চিখানেক জায়গার জন্যে লড়াই করো একে অন্যের সাথে, এমনকি হাগামুতা করতেও তোমাকে লাইন ধরতে হয়, সেখানে গ্রেফতার হওয়াটা অনিবার্য ঘটনা বলেই মনে হয়। তোমাকে এই বিশ্বাস নিয়েই থাকতে হয়, যেকোনো একদিন তোমাকে গ্রেফতার করার জন্যে ওয়ারেন্ট নিয়ে আসা হবে। একটা জিপে তুলে লালবাতি জ্বালাতে জ্বালাতে চলে যাবে তারা।

এখানে এমনও লোক আছে যারা মনে করবে এটার জন্যে আমি নিজেই দায়ি। কুইজ শো'তে চলে গেছি কিছু না বুঝেই। তারা আমার দিকে আঙুল তুলে বলবে, আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবে বস্তির মুরুব্বিদের সেই বিখ্যাত উক্তিটি, "ধনী গরীবের মধ্যে যে সীমারেখা আছে সেটা কখনও অতিক্রম করা ঠিক না।" হাজার হোক, কপর্দকহীন এক ওয়েটারের কুইজ শো'তে যাওয়ার দরকার কি? মস্তিষ্ক এমন একটা প্রত্যঙ্গ যেটা আমরা ব্যবহার করার অধিকার রাখি না। আমাদের তো কেবল হাত আর পা ব্যবহার করার কথা।

কেবল তারা যদি আমাকে সেই অনুষ্ঠানে করা প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে দেখতো—মানে অনুষ্ঠানটি দেখতো, তবেই কেবল নতুন ক'রে শ্রদ্ধার চোখে দেখতো আমাকে। দুঃখের ব্যাপার হলো সেই অনুষ্ঠানটি এখনও সম্প্রচারিতই হয় নি। তবে একটা কথা রটে গেছে, আমি নাকি কিছু একটা জিতে গেছি। লটারির মতো কিছু আর কি। অন্যসব ওয়েটাররা খবরটা শোনার পর ঠিক করলো আমার জন্যে একটা পার্টি দেবে রেস্তোরাঁয়। আমরা শেষরাত পর্যন্ত নাচলাম, গাইলাম পান করলাম। এই প্রথম আমরা রাতের খাবার হিসেবে রামজির বাসি খাবার খেলাম না। মেরিন ড্রাইভের ফাইভস্টার হোটেল থেকে চিকেন বিরিয়ানী আর শিক কাবাব আনালাম। মোটাসোটা বারটেন্ডার তার মেয়ের সাথে আমার বিয়ে দেবার প্রস্তাবও দিলো। এমনকি হারামজাদা ম্যানেজারও আমার দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাসলো, আগের পাওনা বেতনের টাকাও দিয়ে দিলো সে। সেই রাতে ম্যানেজার আর আমাকে ফালতু বানচোত বলে গালিও দিলো না—কিংবা নেড়ি কুত্তার বাচ্চা।

কিন্তু এখন গডবোল আমাকে সেই গালিটাই দিলো। আরো বিশ্রীভাবে। আমি বসে আছি ছয়-বাই-দশ ফুটের একটা লোহার শেলে। ছোট্ট গ্রিল দিয়ে কোনো রকম বাতাস আসা যাওয়া করছে। লকআপটা বেশ গরম। পাথরের মেঝেতে পড়ে থাকা আমের বোড়ার চারপাশে মাছি ভনভন করছে। আমার পায়ের কাছে একটা বিষন্ন দৃষ্টির তেলাপোকা। ওটা আস্তে আস্তে আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। পেটে প্রচণ্ড ক্ষুধা টের পাচ্ছি। চৌ চৌ করছে পাকস্থলী।

আমাকে বলা হয়েছে একটু বাদেই আমাকে আবার জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে নিয়ে যাওয়া হবে। গ্রেফতারের পর একদফা জিজ্ঞাসাবাদ হয়ে গেছে। একটু বাদেই আমাকে নিয়ে যেতে এলো ইন্সপেক্টর গডবোল নিজেই।

গডবোল খুব বেশি বয়স্ক নয়, সম্ভবত মধ্য চল্লিশে তার বয়স। মাথায় টাক, গোল মুখ আর পাকানো গোঁফ। ভারি পায়ে হাটার সময় তার ভূড়িটাও নড়তে থাকে। "শালার মাছি।" নিজের মুখের উপর বসা একটা মাছি মারতে উদ্যত হলো সে। পারলো না।

ইন্সপেক্টর গডবোলের মনমেজাজ আজকে খুব একটা ভালো নেই। এইসব মাছি তার মেজাজ আরো খারাপ ক'রে দিয়েছে। গরমে পেরেশানিতে পড়ে গেছে সে। কপাল বেয়ে দরদর ক'রে ঘাম ঝরছে। শার্টের হাতা দিয়ে সেই ঘাম মুছলো। সবচাইতে বড় কথা সে আমার নাম নিয়ে মহা ক্ষেপে আছে। "রাম মোহাম্মদ টমাস—এটা আবার কোন্ বালের নাম, সব ধর্মের মিশ্রণ আছে দেখছি?" বললো সে, তবে এটাই প্রথমবার নয়।

আমি এই অপমানটা হজম করলাম। এটা এমন কিছু যাতে আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

ইন্টেরোগেশন রুমের বাইরে দু'জন কনস্টেবল সটান দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে যে গুরুত্বপূর্ণ কেউ আছে তারই লক্ষণ এটি। সকালবেলায় তারা পান চিবালো, জঘন্য সব রসিকতা করলো একে অন্যের সাথে। গডবোল আমাকে অনেকটা ধাক্কা মেরেই সেই ঘরে ঢুকালো। সেখানে দু'জন লোক দেয়ালে টাঙানো অপহরণ আর হত্যা-খুনের তালিকা দেখছে। তাদের একজনকে চিনতে পারলাম আমি। মেয়েদের মতো লম্বা চুলের একজন—অথবা একজন রকস্টারের মতো—কুইজ শো রেকর্ড করার সময় এই লোক মাথায় হেডফোন লাগিয়ে নির্দেশনা দিচ্ছিলো। অন্য লোকটা কে আমি জানি না। এই লোকটা শ্বেতাঙ্গ এবং টেকো মাথার। পুরোপুরি টেকো। সুট-টাই পরে আছে সে। এই ভ্যাপসা গরমে কেবলমাত্র সাদা চামড়ার লোকেরাই সুট-টাই পরে থাকতে পারে। তাকে দেখে আমার কর্নেল টেলরের কথা মনে পড়ে গেলো।

সিলিং ফ্যানটা ফুলস্পিডে ঘুরছে, তারপরেও জানালাবিহীন হওয়াতে ঘরটা অসহ্য লাগছে। পুরো ঘরটা খালি, কেবল মাঝখানে একটা টেবিল আর তিনটা চেয়ার রাখা আছে। টেবিলের উপর ঝুলে আছে একটা মেটাল ল্যাম্প।

গডবোল আমাকে শ্বেতাঙ্গ লোকটার সামনে এমনভাবে পরিচয় করিয়ে দিলো যেনো আমি সাকার্সের রিঙে কোনো সিংহ। "এ হলো রাম মোহাম্মদ টমাস, স্যার।"

শ্বেতাঙ্গ লোকটি কপালে রুমাল দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে আমার দিকে এমনভাবে তাকালো যেনো আমি বানরের নতুন কোনো প্রজাতি। "তাহলে এই

হলো আমাদের বিখ্যাত বিজয়ী। বলতেই হচ্ছে, যা ভেবেছিলাম তারচেয়েও কম বয়স্ক দেখাচ্ছে তাকে।" আমি তার উচ্চারণভঙ্গী ধরার চেষ্টা করলাম। আগ্রায় দেখা বাল্টিমোর আর বোস্টন থেকে আগত পর্যটকদের মতো ক'রে সে কথা বলছে। আমেরিকান লোকটি আরাম ক'রে চেয়ারে বসলো। নীল রঙের চোখ আর গোলাপী নাক তার। "হ্যালো," আমার উদ্দেশ্যে বললো সে। "আমার নাম নেইল জনসন। আমি নিউ এজ টেলি মিডিয়ার প্রতিনিধি। আমাদের এই কোম্পানিই কুইজ শো'র লাইসেন্সধারী। এ হলো বিলি নন্দা, কুইজ শো'র প্রযোজক।"

আমি কিছু বললাম না। বানরেরা কথা বলে না। বিশেষ ক'রে ইংরেজিতে।

নন্দার দিকে ফিরলো সে। "সে ইংরেজি বোঝে না?"

"তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, নেইল?" নন্দা কিছুটা বিরক্ত হয়েই বললো। "আরে তুমি কি ক'রে আশা করো সে ইংরেজিতে কথা বলতে পারবে? একটা রেস্তোরাঁর সামান্য এক ওয়েটার সে!"

সাইরেনের শব্দ শোনা গেলো। গডবোলের কাছে দৌড়ে এসে এক কনস্টেবল কানে কানে কী যেনো বললে গডবোল তাড়াহুড়া ক'রে ঘর থেকে বের হয়ে কিছুক্ষণ পর ফিরে এলো পুলিশের উচ্চপদস্থ অফিসারের পোশাক পরা ছোটোখাটো এক লোককে নিয়ে। গডবোল জনসনের দিকে তাকিয়ে তার হলুদ দাঁত বের ক'রে হাসলো। "মিঃ জনসন, কমিশনার সাহেব এসেছেন।"

উঠে দাঁড়ালো জনসন। "আসার জন্যে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, কমিশনার। মনে হয় বিলিকে আপনি আগে থেকেই চেনেন।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো কমিশনার। "হোম মিনিস্টারের কাছ থেকে মেসেজটা পেয়েই ছুটে এসেছি।"

"ও আচ্ছা, তিনি মিঃ মিখাইলোভের পুরনো বন্ধু।"

"তো, আপনাদের জন্যে আমি কি করতে পারি?"

"কমিশনার *থ্রি ডব্লিউ বি*'র ব্যাপারে আপনার সাহায্য দরকার আমার।"

"থ্রি ডব্লিউ বি?"

"*হু উইল উইন এ বিলিয়ন*-এর সংক্ষেপ আর কি। মানে কে জিতবে শতকোটি টাকা।"

"এটা আবার কি?"

"একটা কুইজ শো। পয়ত্রিশটি দেশে এটা লঞ্চ করা হয়েছে। আমাদের কোম্পানি এর আয়োজক। সারা মুম্বাইতে আমাদের বিজ্ঞাপন নিশ্চয় আপনার চোখে পড়েছে?"

"খেয়াল করি নি বোধহয়। কিন্তু শতকোটি কেন?"

"কেন নয়? আপনি কি *হু ওয়ান্টস টু বি এ মিলিয়নেয়ার* দেখেছেন?"

"*কৌন বানেগা ক্রোড়পাতি*? ঐ অনুষ্ঠানটা তো সারা দেশে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিলো। আমার পরিবারে এটা দেখা রীতিমতো বাধ্যতামূলক ছিলো।"

"আপনি ওটা দেখতেন কেন?"

"দেখতাম...কারণ খুবই মজার ছিলো।"

"সর্বোচ্চ পুরষ্কারের টাকাটা যদি মিলিয়ন না হয়ে দশ হাজার হোতো তাহলে কি আপনার আগ্রহ একই রকম থাকতো?"

"মনে হয় না।"

"একদম ঠিক। বুঝলেন, যৌনতা কিন্তু এই পৃথিবীর সবচাইতে বড় প্রণোদনা নয়, টাকা। টাকাই হলো সবচাইতে বড় প্রণোদনা। যতো বড় অঙ্কের টাকা ততো বড় প্রণোদনা।"

"বুঝছি। তাহলে আপনাদের কুইজ মাস্টার কে?"

"প্রেম কুমার।"

"প্রেম কুমার? ঐ বি-গ্রেডের অভিনেতা? আরে ও তো *ক্রোড়পাতি*র উপস্থাপক অমিতাভ বচ্চনের অর্ধেক জনপ্রিয়ও না।"

"চিন্তা করবেন না। আস্তে আস্তে সেও জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। অবশ্য তাকে আমাদের নিতে হয়েছে কারণ ইন্ডিয়াতে নিউ এজ মিডিয়ার ২৯ শতাংশের মালিক সে নিজে।"

"এবার বুঝেছি। তাহলে এই যে ছেলেটা, রাম মোহাম্মদ টমাস, এরমধ্যে সে জড়ালো কিভাবে?"

"আমাদের গত সপ্তাহের পনেরোতম পর্বের একজন প্রতিযোগী সে।"

"তো?"

"বারোটি প্রশ্নের সব কটির জবাব দিয়ে সে শতকোটি টাকা জিতে নিয়েছে।"

"কি? ঠাট্টা করছেন।"

"না, ঠাট্টা নয়। আপনার মতো আমরাও অবাক হয়েছি। এই ছেলেটা ইতিহাসের সবচাইতে বড় অঙ্কের টাকা জিতে নিয়েছে। ঐ এপিসোডটা এখনও প্রচারিত হয় নি। তাই খুব বেশি লোকে এটা জানে না।"

"ঠিক আছে। আপনি যেহেতু বলেছেন সে জিতেছে, সে জিতেছে, আমার বলার কিছু নেই। তাহলে সমস্যাটা কি?"

জনসন একটু থামলো। "আমি আর বিলি কি আপনার সাথে একান্তে কিছু কথা বলতে পারি?"

গডবোলকে চলে যাবার ইশারা করলো কমিশনার। চলে যাবার সময় ইন্সপেক্টর আমার দিকে কটমট ক'রে তাকালো। ঘরে আমি রয়ে গেলাম কিন্তু সেটা কেউ লক্ষ্যই করলো না। আমি নিতান্তই একজন ওয়েটার। আর ওয়েটাররা ইংরেজি জানে না। বোঝে না।

"ঠিক আছে। এবার বলুন," বললো কমিশনার।

"কমিশনার সাহেব, মিখাইলোভ ঠিক এই মুহূর্তে শতকোটি রুপি দেবার মতো অবস্থায় নেই," জনসন বললো।

"তাহলে এতো টাকা দেবার কথা বললো কেন সে?"

"মানে...এটা বাণিজ্যিক গিমিক।"

"দেখুন, আমি এখনও বুঝতে পারছি না। এটা যদি গিমিক হয়েও থাকে, আপনাদের শো'টা কি এখন পর্যন্ত সেই রকম ভালো আয় করতে পারে নি যাতে ক'রে সর্বোচ্চ পুরস্কারটি দিতে পারে? আমার মনে আছে *কৌন বনেগা ক্রোড়পাতি*তে যখন কোনো প্রতিযোগী কোটি রুপি জিততো অনুষ্ঠানের দর্শক সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যেতো।"

"এটা টাইমিংয়ের ব্যাপার, কমিশনার। টাইমিং। *থ্ ডব্লিউ বি*-এর মতো শো চান্স আর ডাইসের সাহায্যে পরিচালিত হয় না। একটা স্ক্রিপ্ট অনুসরণ করতে হয় আমাদেরকে। আমাদের স্ক্রিপ্টের মতে আট মাসের আগে কোনো সর্বোচ্চ বিজয়ী থাকবে না। এই সময়ের মধ্যে আমরা আমাদের বিনিয়োগ ফিরে পাবো, পর্যাপ্ত টাকা জোগার করতে পারবো টিভি বিজ্ঞাপন থেকে। কিন্তু এখন এই টমাস নামের ছেলেটা আমাদের সব পরিকল্পনা ভণ্ডুল করে দিয়েছে।"

কমিশনার মাথা নেড়ে সায় দিলো। "ঠিক আছে। তো এখন আপনারা আমাকে কি করতে বলেন?"

"আমি চাই আপনারা প্রমাণ করবেন টমাস চিট ক'রে জিতেছে। কোনো রকম সাহায্য ছাড়া সে প্রশ্নের জবাবগুলো জানতো না। খালি একটু ভাবুন। জীবনে সে কখনও কোনো স্কুলে যায় নি। পত্রিকা পর্যন্ত পড়তে পারে না। পুরস্কার জেতার কোনো উপায় তার নেই। সে এটা জিততে পারে না।"

"বুঝলাম...কিন্তু আমি নিশ্চিত হতে পারছি না।" কমিশনার মাথা চুলকালো। "খুব গরীব ঘরে জন্ম নেয়া ছেলের পক্ষেও পরবর্তীতে জিনিয়াস হবার ঘটনা আছে। আইনস্টাইন কি হাইস্কুল ফেল করা ছিলো না?"

"দেখুন মিঃ কমিশনার, আমরা এক্ষুণি প্রমাণ ক'রে দিতে পারবো এই ছেলেটা আইনস্টাইন নয়," জনসন বললো। নন্দার দিকে ইঙ্গিত করলো সে।

নিজের চুলে আঙুল চালাতে চালাতে নন্দা আমার দিকে এগোলো।

হিন্দিতেই কথা বললো আমার সাথে। "মিঃ রাম মোহাম্মদ টমাস, তুমি যদি আমাদের কুইজ শো জেতার মতো মেধাবী হয়ে থাকো তবে এখন আরেকটা কুইজ শো'তে অংশ নিয়ে সেটা তোমাকে প্রমাণ করতে হবে। আমাদের সামনে। প্রশ্নগুলো খুবই সহজ হবে। গড়পড়তা বুদ্ধিমান প্রায় সব লোকেই এইসব প্রশ্নের জবাব জানে।" আমাকে একটা চেয়ারে বসালো সে। "তুমি প্রস্তুত? এক নাম্বার প্রশ্ন। ফ্রান্সের মুদ্রার নাম কি? অপশনগুলো হলো এ) ডলার, বি) পাউন্ড, সি) ইউরো অথবা ডি) ফ্রাঁ।"

আমি চুপ থাকলাম। আচম্‌কা কমিশনার আমার গালে কষে একটা চড় লাগালো। "বানচোত, বয়রা নাকি? জবাব দে, তা না হলে তোর চোপা ভেঙে ফেলবো," আমাকে শাসালো সে।

নন্দা উদভ্রান্তের মতো অথবা রকস্টারের মতো আচরণ করলো। "প্লিজ। আমরা কি এটা আরো ভদ্রভাবে করতে পারি না?" কমিশনারকে বলে সে তাকালো আমার দিকে। "হ্যা? তোমার জবাবটা কি বলো?"

"ফ্রাঁ," ইতস্তত ক'রে বললাম আমি।

"ভুল। সঠিক জবাব হলো ইউরো। ঠিক আছে, এবার দু'নাম্বার প্রশ্ন। চাঁদের মাটিতে প্রথম কে পা রেখেছিলো? এ) এডউইন অলড্রিন, বি) নিল আর্মস্ট্রং, সি) ইউরি গ্যাগারিন নাকি ডি) জিমি কার্টার?"

"আমি জানি না।"

"নিল আর্মস্ট্রং। তিন নাম্বার প্রশ্ন। পিরামিড কোথায় অবস্থিত? এ) নিউইয়র্ক, বি) রোম, সি) কায়রো, নাকি ডি) প্যারিসে?"

"জানি না।"

"কায়রোতে। চার নাম্বার প্রশ্ন। আমেরিকার বর্তমান রাষ্ট্রপতি কে? এ) বিল ক্লিন্টন, বি) কলিন পাওয়েল, সি) জন কেরি, নাকি ডি) জর্জ বুশ?"

"আমি জানি না।"

"জর্জ বুশ। আমি দুঃখের সাথে বলতে বাধ্য হচ্ছি, তুমি একটা প্রশ্নেরও সঠিক জবাব দিতে পারো নি।"

নন্দা এবার কমিশনারের দিকে ফিরে ইংরেজিতে বললো। "দেখলেন তো, আমি বলছি, এই ছেলেটা আস্ত একটা গর্দভ। কুইজ শো'তে সে ধাপ্পাবাজি ক'রে জবাব দিয়েছে।"

"কিভাবে চিট করেছে সে ব্যাপারে কোনো ধারণা আছে?" জিজ্ঞেস করলো কমিশনার।

"আরে এটাই তো সমস্যা। আমি আপনাকে অনুষ্ঠানের ফুটেজের দু'কপি ডিভিডি দিয়েছি। আমাদের এক্সপার্টরা মাইক্রোস্কোপ দিয়ে তন্ন তন্ন করে সবই

দেখেছে, কিছুই পায় নি। অবশ্য কিছু না কিছু শেষ পর্যন্ত পাওয়া যাবেই।"

ক্ষিদের চোটে আমার দম বেরোবার জোগার হলো। চোখে অন্ধকার দেখছি।

টেকো মাথার আমেরিকান জনসন আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো। "মিঃ কমিশনার, আপনার কি ইংল্যান্ডে *হু ওয়ান্টস টুবি এ মিলিয়নেয়ার* অনুষ্ঠানে এক আর্মি মেজরের ঘটনাটি মনে আছে? কয়েক বছর আগের ঘটনা সেটি। কোম্পানি সন্দেহ করলে তদন্ত শুরু হয়। পুলিশ তদন্ত ক'রে দেখতে পায় মেজর সাহেবের একজন সহযোগী প্রফেসর ভদ্রলোক দর্শক আসনে বসে কাশির সাহায্যে প্রশ্নগুলোর উত্তর জানিয়ে দিতো। মনে হয় এরকম কিছুই এখানে ঘটেছে।"

"তাহলে কি আমরা দর্শকদের মধ্যে কাশি দেয়া কোনো লোককে খুঁজবো?"

"না। কাশি দেয়ার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি। সে হয়তো অন্য কোনো সিগনাল ব্যবহার করেছে।"

"পেজার কিংবা মোবাইলের সাহায্যে কোনো সংকেত?"

"না, ওরকম কিছু সে ব্যবহার করে নি। এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত।"

কমিশনার আবার ভাবতে লাগলো। "আপনারা কি মনে করছেন তার মাথায় সে কোনো মেমোরি চিপ স্থাপন করেছে?"

জনসন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। "মিঃ কমিশনার, মনে হচ্ছে আপনি অনেক বেশি সায়েন্স ফিকশান ফিল্ম দেখেন। দেখুন, যাই হোক না কেন, আপনি সেটা খুঁজে বের করুন। তাকে কে সাহায্য করেছে সেটা আমরা জানি না। কোন্ ধরণের সিগনাল ব্যবহার করেছে সেটাও আমরা জানি না। তবে আমি একশত ভাগ নিশ্চিত, এই ছেলেটা জালিয়াতি করেছে। এটা প্রমাণ করতে আপনি আমাদেরকে সাহায্য করবেন।"

"তাকে কিছু টাকা পয়সা দিয়ে বিদায় করার কথা ভাবছেন কি?" খুব আশান্বিত হয়ে কমিশনার বললো। "আমি নিশ্চিত, এক বিলিয়নে কতোটি শূন্য বসে তাও সে জানে না। আমার ধারণা তাকে কয়েক হাজার রুপি দিয়ে দিলে সে খুশি মনে চলে যাবে।"

আমার ইচ্ছে করছে কমিশনারকে এক ঘুষি মেরে অজ্ঞান ক'রে ফেলি। মানছি, কুইজ শো'র আগে আমি জানতাম না এক বিলিয়ন মানে কি। কিন্তু সেটা তো এখন ইতিহাস। এখন আমি জানি। আমার পুরস্কারের টাকা পেতে আমি দৃঢ় প্রতীজ্ঞ। একেবারে পুরো নয়টি শূন্য। একটাও কম না।

জনসনের জবাব আমাকে আশ্বস্ত করলো। "এটা আমরা করতে পারি না,"

বললো সে। "এতে ক'রে মামলা খাবার সম্ভাবনা তৈরি হবে। তাকে হয় পুরস্কারের টাকা দিতে হবে, নয়তো প্রমাণ করতে হবে সে একজন জালিয়াত। এক বিলিয়ন নেবে, নয়তো সোজা জেলে যাবে সে। এর মাঝামাঝি কোনো জায়গা নেই। তাকে জেলে পাঠাবার ব্যাপারে আপনার সাহায্য লাগবে আমাদের। এই মুহূর্তে এক বিলিয়ন দিতে গেলে মিঃ মিখাইলোভের হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে।"

কমিশনার সরাসরি জনসনের চোখের দিকে তাকালো। "আমি আপনার কথাটা ধরতে পেরেছি," একটু থেমে আবার বললো, "তাতে আমার কি লাভ হবে?"

জনসন তার হাত ধরে এক কোণে নিয়ে গেলো তাকে। ফিস্‌ফিস্ ক'রে কথা বললো তারা। কেবল মাত্র দুটো শব্দই আমি ধরতে পারলাম "দশ পার্সেন্ট।" কথাটা শুনে কমিশনার বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলো। "ঠিক আছে, ঠিক আছে। মিঃ জনসন। মনে করেন আপনার কাজ হয়ে গেছে। এবার আমাকে গডবোলকে ডাকতে দিন।"

ইন্সপেক্টরকে ডেকে পাঠানো হলো। "গডবোল, এখন পর্যন্ত ছেলেটার কাছ থেকে কতোটুকু বের করতে পেরেছো?" জানতে চাইলো কমিশনার।

গডবোল আমার দিকে কটমট ক'রে তাকালো। "কিছু না, কমিশনার সাহেব। বানচোতটা বার বার এক কথাই বলেছে। সে নাকি জবাবগুলো জানতো। বলে তার ভাগ্য নাকি ভালো ছিলো।"

"ভাগ্য ভালো ছিলো, অ্যাহ্?" নাক সিঁটকালো জনসন।

"হ্যা, স্যার। আমি এখন পর্যন্ত থার্ড ডিগ্রি ব্যবহার করি নি। তা না হলে তো সে তোতা পাখির মতো গান শুরু ক'রে দিতো এতোক্ষণে। একবার খালি অনুমতি দেন, স্যার। ওর সাথে যারা যারা আছে সবার নাম এক সেকেন্ডে ওর মুখ দিয়ে বের ক'রে ছাড়বো।"

কমিশনার ভুরু কুচকে জনসন আর নন্দার দিকে তাকালো। "কি বলেন?"

উদভ্রান্তের মতো মাথা নাড়তে লাগলো নন্দা। "কোনোভাবেই না। কোনো রকম টর্চার করা যাবে না। পত্রিকায় জানাজানি হয়ে গেলে আমরা সবাই শেষ হয়ে যাবো। ইতিমধ্যেই অনেক এনজিও মানবাধিকারের লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে আমার নামে মামলা করেছে।"

কমিশনার তার পিঠে আলতো ক'রে চাপড় দিলো। "বিলি, তুমি একেবারে আমেরিকানদের মতো হয়ে গেছো। চিন্তা কোরো না। গডবোল এ কাজে খুব পারদর্শী। ছেলেটার শরীরে একটা দাগও পাওয়া যাবে না।"

আমার পেটটা মোচড় দিয়ে উঠলো। মনে হলো আমার বমি হবে যেনো।

কমিশনার চলে যেতে উদ্যত হলো। "গডবোল, আগামীকাল সকালের মধ্যে আমি ওর সহযোগীদের নাম-ধাম সব চাই। তথ্য আদায় করতে যা যা দরকার সবই করো। তবে সতর্ক থেকো। মনে রেখো, তোমার প্রমোশন এর উপরেই নির্ভর করছে।"

"ধন্যবাদ স্যার, ধন্যবাদ।" একটা কৃত্রিম হাসি দিলো গডবোল। "চিন্তা করবেন না। সকালের মধ্যে আমি তার মুখ দিয়ে মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করার কথা পর্যন্ত স্বীকার করিয়ে নিতে পারবো।"

মহাত্মা গান্ধীকে কে হত্যা করেছে তার নামটা স্মরণ করার চেষ্টা করলাম, ঐ লোকটা তো মারা যাবার আগে বলেছিলো "হায় রাম!" এ কথাটা আমার মনে আছে কারণ, এটা তো আমার নামই! ফাদার টিমোথি বেশ শান্তকণ্ঠে আমাকে বলেছিলেন, এই নামটি দেবতা রামের। যে হিন্দু দেবতাকে চৌদ্দ বছর জঙ্গলে নির্বাসন দেয়া হয়েছিলো। কমিশনার এবং বাকি দু'জন লোককে বিদায় জানিয়ে গডবোল ফিরে এলো আমার কাছে। ফোঁস ফোঁস করছে সে। দরজাটায় জোরে আঘাত ক'রে বন্ধ করলো। তারপর আমার দিকে আঙুল তুলে বললো, "ঠিক আছে মাদারচোদ, জামা-কাপড় সব খোল্।"

আমার সারা শরীরে তীব্র ব্যথা করছে। দড়ি দিয়ে আমার দু'হাত বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে ছাদের বিমের সাথে। আমি ঝুলছি। ফলে মনে হচ্ছে আমার হাত-পা টেনে ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে। সম্পূর্ণ নগ্ন আমি। আমার বুকের পাঁজরগুলো আফ্রিকার ক্ষুধার্ত শিশুদের মতো বের হয়ে আছে। একঘণ্টা ধরে গডবোল আমার উপর অত্যাচার চালিয়ে গেলেও এখনও তার কাজ শেষ হয় নি। আধ ঘণ্টা পরপর সে অত্যাচার করার নতুন নতুন ইন্সট্রুমেন্ট নিয়ে আসছে। প্রথমে আমার মলদ্বার দিয়ে কাঠের একটা রড ঢুকালো সে। ওটাতে খুব ঠাণ্ডা কোনো পাউডার মাখানো ছিলো। আমার মনে হলো আমার পেছন দিয়ে কাঁটাযুক্ত কিছু ঢুকে যাচ্ছে। এরপর এক বালতি পানিতে আমার মাথা ডুবিয়ে রাখলো যতোক্ষণ না আমার ফুসফুস পানিতে ভরে গেলো। বুক ফেঁটে দম বন্ধ হয়ে মরে যাবার অবস্থা হলো আমার।

এবার সে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া একটা তার ধরে রেখেছে। সেটার দু'মাথা এক করলে দিওয়ালির তারা বাতির মতো স্ফুলিঙ্গ বের হচ্ছে। আমার চারপাশে সে মাতাল কোনো বক্সারের মতো নাচতে নাচতে আচমকা তেড়ে এলো আমার দিকে। আমার বাম পায়ে বৈদ্যুতিক শক্ দেয়া হলে সারা শরীরে মনে হলো বিষ ছেঁয়ে যাচ্ছে। আপ্রাণ চেষ্টা করলাম ছোটার জন্যে। আমার দিকে তাকিয়ে

চিৎকার ক'রে বললো গডবোল, "বানচোত, এখনও বলবি না, শো'তে কোন্ চালাকি করেছিস তুই? আমাকে বল্, তাহলে এই অত্যাচার আর করবো না। বেশ ভালো খাবারও পাবি। এমনকি বাড়িতেও যেতে দেবো তোকে।"

কিন্তু আমার কাছে এ মুহূর্তে বাড়ি অনেক দূরের বলেই মনে হচ্ছে। আর খাবার দাবার মনে হচ্ছে বমির সমতুল্য। দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকলে ক্ষিদেও মরে যায়। কেবল পেটে একটা ভোতা যন্ত্রণা থাকে।

বমি বমি ভাব শুরু হলো আমার। জ্ঞান হারাতে বসলাম। ঘন কুয়াশার মধ্যে এক লম্বা মহিলাকে দেখলাম আমি। খোলা কালো চুল। বাতাসে তার চুলগুলো উড়ছে। ফলে তার মুখটা ঢাকা। সে পরে আছে সাদা রঙের একটা শাড়ি। সেটাও যেনো ঘুড়ির মতো উড়ছে। দু'হাত বাড়িয়ে সে চিৎকার ক'রে বলছে, "আমার বাবা...আমার লক্ষীসোনা... তারা তোমাকে কি করছে?"

"মা!" আমি চিৎকার দিয়ে কুয়াশা ভেদ ক'রে তার কাছে চলে যাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু গডবোল খপ্ ক'রে আমার গলাটা ধরে ফেললো। মনে হলো আমি দৌড়াচ্ছি কিন্তু এক জায়গাতেই থেমে আছি। সজোরে কয়েকটা চড় মারার পর চোখের সামনে থেকে কালো পর্দাটা সরে গেলো।

আবারো গডবোল একটা কলম বের ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। কালো রঙের কলম, যার নিবটা সোনালী রঙের। "স্বীকারোক্তিতে সাইন কর," আদেশ করলো সে।

স্বীকারোক্তিটা খুবই সহজ সরল :

> আমি রাম মোহাম্মদ টমাস, এই মর্মে স্বীকার করছি যে, দশই জুলাই তারিখে আমি *হু উইল উইন এ বিলিয়ন* কুইজ শোতে অংশ নিয়েছি। সজ্ঞানে জানাচ্ছি, আমি জালিয়াতি করেছি। প্রশ্নের জবাবগুলো আমি জানতাম না। অনুষ্ঠানের কোনো পুরস্কার নেবার দাবি প্রত্যাখ্যান করছি সেজন্যে। এ ব্যাপারে আমার আর কোনো দাবি থাকবে না। তদুপরি আমি ক্ষমা প্রার্থী। আমি সজ্ঞানে, সচেতন অবস্থায় এই স্বীকারোক্তি প্রদান করছি। কোনো চাপ বা হুমকীর মুখে নয়। স্বাক্ষর—রাম মোহাম্মদ টমাস।

আমি জানি এই স্বীকারোক্তিতে স্বাক্ষর করা আমার জন্যে এখন কেবলমাত্র সময়ের ব্যাপার। আমাদেরকে সবাই বলতো পুলিশের সাথে লাগতে যেয়ো না। আমার মতো রাস্তার ছেলেরা এসেছে সমাজের একেবারে প্রান্তসীমা থেকে। আমাদের উপরে আছে ছিচকে সন্ত্রাসী। যেমন পকেট মার। তাদের

উপরে আছে চাঁদাবাজরা। আর তাদেরও উপরে রয়েছে ডনেরা। ডনেদের উপর আছে বড় বড় ব্যবসায়ী। কিন্তু সবার উপরে রয়েছে পুলিশ। তাদের রয়েছে অসীম শক্তি। কেউ তাদেরকে চেক্ করে না। পুলিশকে নিয়ন্ত্রণ করবে কোন্ পুলিশ? সুতরাং আমি স্বীকারোক্তিটা স্বাক্ষর করবো। দশ, বারো কিংবা পনেরোটি চড় থাপ্পড়ের পর হয়তো। পাঁচ ছয়টি ইলেক্ট্রিক শকের পরেও হতে পারে সেটা।

আচম্কা দরজার কাছে চিৎকার চেঁচামেচি শুনতে পেলাম। দরজায় কয়েকটা আঘাত করার পর সেটা ধপাস ক'রে খুলে গেলো। এক তরুণী হুড়মুড় ক'রে ঢুকালো ঘরে। গড়পরতা উচ্চতার আর হালকা পাতলা গড়নের এক মেয়ে। তার দাঁত আর ভুরু জোড়া খুব সুন্দর। কাপালে নীল টিপ দেয়া। খুবই সুন্দর লাগছে তাকে। সাদা সালোয়ার কামিজ আর নীল রঙের ওড়না পরে আছে মেয়েটা। তার পায়ে চামড়ার স্যান্ডেল। তার লম্বা কালো চুলগুলো খোলা। বাম কাঁধে একটা বাদামী রঙের ব্যাগ। তার বেশ ভূষায় নির্দিষ্ট একটা মাত্রা রয়েছে।

গডবোল এতোটাই ভড়কে গেলো যে, নিজের হাতেই ইলেক্ট্রিকের তার লাগিয়ে শক্ খেয়ে বসলো। মেয়েটার কলার ধরতে যাবে মাত্র তখনই সে বুঝতে পারলো অনুপ্রবেশকারী একজন নারী। "আরে, আপনি আবার কে, এভাবে ঢুকলেন যে? দেখতে পাচ্ছেন না আমি ব্যস্ত আছি?"

"আমার নাম স্মিতা শাহ," মেয়েটি শান্ত কণ্ঠে গডবোলকে নিজের নাম বললো। "আমি মিঃ রাম মোহাম্মদের উকিল।" এরপর সে আমার দিকে ভালো ক'রে তাকিয়ে দু'চোখ সরিয়ে ফেললো সঙ্গে সঙ্গে।

গডবোল একেবারে হতভম্ব। এতোটাই বিস্মিত যে সে এটাও লক্ষ্য করলো না, আমিও তার মতো অবাক হয়েছি। এই মেয়েকে আমি জীবনে কখনও দেখি নি। একটা ট্যাক্সি ভাড়া করার মতো টাকা আমার নেই। উকিল ভাড়া করা তো অনেক দূরের ব্যাপার।

"আপনি এসেছেন?" গডবোল ঢোক গিলে বললো। "মানে, আপনি তার উকিল?"

"হ্যা! আর আপনি আমার মক্কেলের সাথে যা করছেন তা সম্পূর্ণ বেআইনী এবং অগ্রহণযোগ্য। এক্ষুণি এইসব টর্চার বন্ধ করুন। ৩৩০ ধারা এবং ৩৩১ ধারায় আপনাকে অভিযুক্ত করতে পারে সে। তার গ্রেফতারের জন্যে যে ওয়ারেন্ট আছে সেটা আমি দেখতে চাই। কোনো এফআইআর করা হয় নি বলেই মনে হয়। কোনো ওয়ারেন্ট ছাড়া গ্রেফতার করাটা ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের আর্টিকেল নাম্বার ২২-এর লঙ্ঘন। সুতরাং কোনো ওয়ারেন্ট দেখাতে

না পারলে আমি আমার মক্কেলকে এখান থেকে নিয়ে যাবো। তার সাথে আমাকে কথা বলতে হবে।"

"উমম...আমাকে...কমিশনার সাহেবের সাথে একটু কথা বলতে হবে। একটু অপেক্ষা করুন," কেবল এ কথাটুকুই বলতে পারলো গডবোল। মেয়েটার দিকে অসহায়ের মতো তাকিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেলো মাথা নাড়তে নাড়তে। আমি একেবারে মুগ্ধ। জানতাম না পুলিশের উপর উকিলদের দাপট এতোটা প্রকট।

জানি না গডবোল ঘরে কখন ফিরে এলো, উকিলের সাথে কী কথা বললো কিংবা উকিল তাকে কী বললো, কারণ তার আগেই আমি জ্ঞান হারাই। ক্ষুধা যন্ত্রণা আর সুখী এক অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে...

হাতে এক কাপ গরম চা নিয়ে আমি বসে আছি চামড়ার একটা সোফায়। চারকোণা একটা ডেস্কে প্রচুর কাগজপত্র। কাঁচের একটা পেপারওয়েট আর একটা টেবিল ল্যাম্পও রয়েছে। ঘরের দেয়াল গোলাপী রঙের। শেল্‌ফে কালো রঙের মলাটের অসংখ্য বই। দেয়ালে কিছু সার্টিফিকেট আর ডিপ্লোমা ফ্রেমে বাঁধানো অবস্থায় আছে। ঘরের এককোণে পাত্রে রাখা আছে মানিপ্লান্ট।

প্লেট আর গ্লাস হাতে ফিরে এলো স্মিতা। খাবারে গন্ধ পাচ্ছি আমি। "জানি তোমার অনেক ক্ষিদে পেয়েছে। এখানে কিছু চাপাতি, ভাজি আর কোক আছে। আমার ফ্‌জে এই-ই ছিলো।"

তার হাত থেকে খাবারগুলো নিলাম আমি। "আপনাকে ধন্যবাদ," বললাম। এখনও জানি না কিভাবে সে পুলিশ স্টেশনে গেলো কিংবা কেন গেলো। সে কেবল বলেছে পত্রিকায় আমার গ্রেফতারের খবর পড়ে থানায় চলে এসেছে। এখন আমি তার বান্দ্রায় অবস্থিত বাড়িতে আছি। আমাকে এখানে নিয়ে আসার সময় তাকে কোনো প্রশ্ন করি নি। অলৌকিক কিছু নিয়ে তো আর প্রশ্ন করা চলে না।

খেতে শুরু করলাম আমি। সবগুলো চাপাতিই খেয়ে ফেললাম। ভাজিগুলোও। আর এক ঢোকেই শেষ করলাম এক গ্লাস কোক। পেট পুরে তৃপ্তি নিয়েই খেলাম।

এখন প্রায় সন্ধ্যা। খেয়েদেয়ে ঘুমিয়েছিলাম। স্মিতা এখনও আমার সাথে আছে, তবে এখন আমি তার বেডরুমে। বসে আছি বড়সড় একটা বিছানায়।

আমার আগেরকার মালেকিন চিত্রতারকা নিলীমা কুমারির চেয়ে তার বেডরুমটা অনেক আলাদা। বড় বড় আয়না আর পুরস্কারের ট্রফির বদলে এখানে কেবল মোটা মোটা বই। দুয়েকটা টেডি বিয়ারও আছে। তবে নিলীমার মতো তার ঘরেও আছে সনি টিভি এবং ডিভিডি প্লেয়ার।

হাতে একটা ডিস্ককেস নিয়ে বিছানার এক প্রান্তে বসে আছে স্মিতা। "দ্যাখো, আমি তোমার শো'য়ের একটা ডিভিডি কপি জোগার করেছি। এখন আমরা এটা চুলচেড়া বিশ্লেষণ করবো। আমি চাইবো তুমি সত্যি ক'রে বলবে এতোগুলো কঠিন কঠিন প্রশ্ন তুমি কিভাবে দিতে পারলে?"

"সত্যি ক'রে বলবো?"

"যদি চিট করেও থাকো তবে আমি তোমাকে বাঁচাবো। এখন যা বলবে সেটা কোর্টে তোমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে না।"

আমার মনে যে সন্দেহটি প্রথম উঁকি দিলো সেটি হলো, এই মেয়ে কি এতোটাই ভালো যে তাকে সত্যি কথা বলা যায়? মেয়েটাকে কি ঐ হারামজাদা জনসন পাঠিয়েছে আমার কাছ থেকে আসল তথ্য বের করার জন্যে? তাকে কি আমি বিশ্বাস করতে পারি?

সিদ্ধান্ত নেবার সময় এসে গেছে। আমার অতি বিশ্বস্ত এক রুপির কয়েনটা বের করলাম। হেড হলে আমি তাকে বিশ্বাস করবো। টেইল হলে তাকে টা-টা জানিয়ে চলে যাবো। কয়েনটা টস্ করলাম। হেড পড়লো।

"আলবার্ট ফার্নানডোকে চেনেন আপনি?" তাকে জিজ্ঞেস করলাম।

"না। কে সে?"

"ধারাবিতে তার একটা অবৈধ কারখানা আছে। হাতঘড়ির লেদার স্ট্র্যাপ তৈরি করে সে।"

"আর?"

"সে *মাটকা* খেলে।"

"মাটকা?"

"তাস দিয়ে জুয়া খেলা।"

"আচ্ছা।"

"গত মঙ্গলবার সে মাটকা খেলে বিস্ময়করভাবেই জিতে গেছে।"

"কি হয়েছিলো?"

"এক নাগারে সে পনেরো হাত জেতার মতো তাস পেয়েছিলো। বিশ্বাস করতে পারেন? এক নাগারে পনেরো হাত! ঐদিন সে পনেরো হাজার রুপি জিতেছিলো।"

"আমি তো কিছুই বুঝলাম না।"

"কিছুই বুঝলেন না? কার্ডের ব্যাপারে তার ভাগ্য ভালো ছিলো। ঐ শো'তে আমারও তেমনি ভাগ্য ভালো ছিলো।"

"তুমি বলতে চাচ্ছো, সৌভাগ্যবশত সবগুলো প্রশ্ন তুমি আন্দাজে সঠিকভাবে দিতে পেরেছো?"

"না, আমি আন্দাজে বারোটি প্রশ্নের সঠিক জবাব দেই নি। আমি ওগুলো জানতাম।"

"তুমি প্রশ্নের জবাবগুলো জানতে?"

"হ্যা। সবগুলো।"

"তাহলে ভাগ্যের ব্যাপারটা এলো কিভাবে?"

"না, মানে, আমি যেসব প্রশ্নের জবাব জানি কেবল সেইসব প্রশ্ন করাটা কি ভাগ্যের ব্যাপার নয়?"

স্মিতার মুখটা দেখার মতো হলো। আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। দুঃখে ক্ষোভে ফেটে পড়লাম। "আমি জানি আপনি কি ভাবছেন। গডবোলের মতো আপনিও ভাবছেন আমি কুইজ শো'তে চিট করেছি। গডবোলের মতো আপনিও ভাবেন আমি কেবল হোটেল রেস্তোরাঁর চিকেন ফ্রাই আর হুইস্কি পরিবেশন করতে পারি। আমি কেবল কুকুরের মতো বেঁচে থাকতে পারি। মরে যেতে পারি কীটপতঙ্গের মতো। তাই না?"

"না রাম," আমার হাত ধরে মেয়েটা বললো, "আমি সেটা কখনই বিশ্বাস করবো না। তবে তোমাকে বুঝতে হবে। তোমাকে যদি সাহায্য করতে হয় তবে আমাকে আগে জানতে হবে কিভাবে বিলিয়ন রুপি জিতলে তুমি। মানছি, এটা বিশ্বাস করা আমার পক্ষেও কষ্ট হচ্ছে। হায় ঈশ্বর, এমনকি আমিও অর্ধেকের বেশি প্রশ্নের জবাব দিতে পারতাম না।"

"ম্যাডাম, আমরা গরীবেরাও প্রশ্ন করতে পারি, জবাব চাইতে পারি। আমি বাজি ধরে বলতে পারি, গরীবেরা যদি কুইজ শো'র আয়োজন করে তবে ধনীরা একটা প্রশ্নেরও সঠিক জবাব দিতে পারবে না। আমি ফ্রান্সের মুদ্রার নাম জানি না। তবে আমি আপনাকে বলতে পারবো আমার প্রতিবেশী শানিনি মহাজন থেকে কতো রুপি ধার করেছে। চাঁদের মাটিতে প্রথম কে পা রেখেছে সেটা আমি জানি না, তবে ধারাবিতে প্রথম কে ডিভিডি পাইরেসি করেছে সেটা জানি। আপনি কি আমার এসব প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন?"

"দ্যাখো রাম, রেগে যেয়ো না। আমি তোমার বিরুদ্ধে কিছু বলছি না। সত্যি আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই। তবে তুমি যদি চিট ক'রে না থাকো, আমাকে জানতে হবে প্রশ্নগুলোর উত্তর তুমি কিভাবে জানলে।"

"আমি বোঝাতে পারবো না।"

"কেন?"

"আপনি কি সচেতনভাবে শ্বাস নেন? না। আপনি এটা এমনিতেই করেন। আমি কোনো স্কুলে যাই নি। বইপত্র পড়ি নি। তবে আমি বলছি প্রশ্নের উত্তরগুলো আমি জানতাম।"

"তাহলে উত্তরগুলোর মূল উৎস জানতে হলে তোমার পুরো জীবনের গল্পটা আমাকে জানতে হবে?"

"হয়তো।"

স্মিতা মাথা নেড়ে সায় দিলো। "আমার মনে হচ্ছে সেটাই করতে হবে। হাজার হোক, কোনো কুইজ তো আর স্মৃতির পরীক্ষার চেয়ে বেশি কঠিন কিছু না।" সে তার নীল রঙের ওড়নাটা ঠিক ক'রে আমার দিকে তাকালো। "আমি তোমার স্মৃতিকথা শুনতে চাই। তুমি কি একেবারে প্রথম থেকে শুরু করবে?"

"মানে যে বছর আমি জন্মালাম সেখান থেকে?"

"না, এক নাম্বার প্রশ্ন থেকে। তবে শুরু করার আগে রাম মোহাম্মদ টমাস আমার কাছে প্রতীজ্ঞা করো, যা বলবে সত্য বলবে।"

"মানে ছবিতে যেমনটি দেখায়, 'যাহা বলিবো সত্য বলিবো, সত্য বৈ মিথ্যা বলিবো না?"

"ঠিক।"

বড় ক'রে একটা দম নিলাম আমি। "হ্যা, আমি প্রতীজ্ঞা করছি। কিন্তু আপনার শপথ নেবার বই কোথায়? গীতা, কোরান, কিংবা বাইবেল? যে কোনো একটা হলেই চলবে।"

"কোনো বইয়ের দরকার নেই। আমিই তোমার স্বাক্ষী। ঠিক যেমনটি তুমি আমার স্বাক্ষী।"

হাতের ডিস্ককেস থেকে স্মিতা একটা চকচকে ডিভিডি বের ক'রে প্লেয়ারে ঢোকালো।

এক নায়কের মৃত্যু

তৃতীয় বেলটা বেজে গেছে। বেগুনী রঙের মখমলের পর্দাটা উঠতে শুরু করলো এবার। সব বাতি নিভে যাচ্ছে একে একে। শেষ পর্যন্ত কেবল 'এক্সিট' লেখা লাল বাতিটাই জ্বলে থাকলো। পপকর্ন আর কোল্ডড্রিংকসের বিক্রেতারা বের হতে শুরু করেছে। সেলিম আর আমি আমাদের সিটে আরাম ক'রে বসলাম।

সেলিম সম্পর্কে প্রথমেই বলে নেয়া ভালো, সে আমার সবচাইতে ভালো বন্ধু। দ্বিতীয়ত সে হিন্দি ছবির পোকা। তবে সব হিন্দি ছবির নয়। কেবলমাত্র আরমান আলী যেসব ছবিতে অভিনয় করে সেগুলোর।

লোকে বলে প্রথমে ছিলো অমিতাভ বচ্চন। তারপর শাহরুখ খান। আর এখন কেবল আরমান আলী। একজন অ্যাকশন হিরো সে। ইন্ডিয়ার গৃক দেবতা। লক্ষ কোটি দর্শকের হার্টথ্রব। আরমানকে ভীষণ পছন্দ করে সেলিম। সত্যি ক'রে বলতে কি, সে তাকে পূজা করে। বস্তিতে তার ছোট্ট ঘরটা হলো একটা মন্দির। সারা ঘর তার নায়কের বিভিন্ন ছবিতে সাজানো। লেদার জ্যাকেট পরা আরমান। মোটর সাইকেলে বসে থাকা আরমান। শার্ট খোলা আরমান, অস্ত্র হাতে আরমান। ঘোড়ায় চড়ে আছে সে, সুন্দরী মেয়েদের নিয়ে সুইমিং পুলে সাতার কাটছে।

বান্দ্রার রিগ্যাল টকিজের ড্রেস সার্কেলের একেবারে প্রথম সারির এ-২১ এবং এ-২২ আসনে বসে আছি আমরা। এখানে আমাদের বসার কথা ছিলো না। আমার পকেটের টিকেটে লেখা নেই ড্রেসসার্কেল। ওটার দাম ১৫০ রুপি। টিকেট চেকার আজ খুব ভালো মুডে আছে। সে আমাদের বলেছে দোতলার বেলকনিতে চলে যেতে। কোনো সমস্যা নেই। কারণ বেলকনিটা প্রায় ফাঁকা বললেই চলে। আমি আর সেলিম ছাড়া ওখানে দুই ডজনের বেশি লোক হবে না।

আমি এবং সেলিম ছবি দেখতে গেলে সবসময় সামনের সারিতে বসি যাতে ক'রে শিষ বাজানো যায়। সেলিম বিশ্বাস করে পর্দার যতো কাছে থাকা যাবে অ্যাকশনের মজা ততোই বেশি। সে বলে সামনে ঝুঁকে সে নাকি আরমান আলীকে প্রায় ছুঁয়ে ফেলতে পারে।

আমি আরমান আলীর তেমন একজন ভক্ত নই। আমার কাছে মনে হয় লোকটা সব ছবিতে একই রকম অভিনয় করে। তবে আমিও সামনের সিটে বসতে পছন্দ করি। ছবির নায়িকার স্তন দুটো সামনে থেকে খুব বড় আর উত্তেজক দেয়ায়।

পর্দা উঠে গেলে রূপালী পর্দাটা এবার আলোকিত হয়ে উঠলো। কিন্তু বিজ্ঞাপন আর সরকারি প্রচারণা শুরু হয়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গে। আমাদেরকে বলা হলো নাস্তায় কর্নফ্লেক্স খেলে কতো জলদিই না আমরা স্কুলে যেতে পারবো, চ্যাম্পিয়ন হতে পারবো ক্রিকেটে। স্পাইস কোলন ব্যবহার ক'রে কতো দ্রুত গাড়ি চালিয়ে সুন্দরী মেয়েদের জয় করা যায় তাও দেখানো হলো। ("আরে এই পারফিউমটাই তো আরমান ব্যবহার করে," সেলিম চিৎকার ক'রে বললো।)

বিজ্ঞাপন শেষে শুরু হলো ছবি। এই ছবির সব দৃশ্যই সেলিমের মুখস্ত। কে ওয়ার্ডরোব ম্যান আর কে হেয়ার স্টাইলিস্ট, মেকআপ-ম্যান, সব তার জানা। ইংরেজিতে খুব একটা কথা বলতে না পারলেও সে ইংরেজি নাম পড়তে পারে। ইতিমধ্যে আটবার এই ছবিটা দেখেছে। তবে আপনি যদি তার মুখের দিকে তাকান মনে করবেন এই প্রথম সে ছবিটা দেখতে এসেছে।

দুই মিনিটের মাথায় আরমান আলীকে নীল-সাদা রঙের হেলিকপ্টার থেকে লাফিয়ে পর্দায় আবির্ভূত হতে দেখা গেলো। সেলিমের চোখ দুটো জ্বলজ্বল ক'রে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে। বছর খানেক আগে সে যখন আরমান আলীকে প্রথম দেখেছিলো তখনও ঠিক এই রকম জ্বলজ্বল চোখে তাকে দেখেছিলাম।

দৌড়ে ঘরে ঢুকে সেলিম বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো।

আমি ভড়কে গেলাম। "সেলিম...সেলিম!... " চিৎকার ক'রে বললাম। "তোর কি হয়েছে? এতো জলদি ফিরে এলি যে?" তাকে চিৎ ক'রে শুয়ে দেখি সে হাসছে।

"আজ দারুণ একটা ঘটনা ঘটে গেছে। আমার জীবনের সবচাইতে সেরা ঘটনা এটি," সে বললো।

"কি হয়েছে? তুই কি লটারি জিতে গেছিস?"

"না। এটা লটারি জেতার চেয়েও বেশি কিছু। আমি আরমান আলীকে দেখেছি।"

এক নিঃশ্বাসে পুরো ঘটনাটা সে বললো আমাকে। ঘাটকোপারে প্রতিদিনকার মতো ঘোরাঘুরি করার সময় সে আরমান আলীকে দেখেছে।

একটা মার্সিডিজ বেঞ্চ গাড়ি থেকে ফাইভস্টার হোটেলে ঢুকছিলো নায়ক। আর সেলিম তার শেষ টিফিন বক্সটা পৌছে দেবার জন্যে বাসে ক'রে যাচ্ছিলো। আরমানকে দেখা মাত্রই সে চলন্ত বাস থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ে। অল্পের জন্যে একটা চলন্ত মারুতির নিচে চাপা পড়ার হাত থেকে রক্ষা পায় সে। দৌড়ে নায়কের কাছে চলে যায়। তখন নায়ক দরজা দিয়ে ঢুকতে যাচ্ছে মাত্র। সেলিমকে লম্বা এক গার্ড ভেতরে ঢুকতে বাঁধা দিলে সে চিৎকার করে বলে "আরমান!" চিৎকারটা শুনে আরমান আলী থেমে পেছনে তাকায়। সেলিমের সাথে তার চোখাচোখি হয়। তার দিকে তাকিয়ে একটা স্মিত হাসি হাসে নায়ক। মাথা নেড়ে সেলিমের ডাকের জবাব দিয়ে লবিতে ঢুকে পড়ে সে। টিফিন ক্যারিয়ারের কথা ভুলে সেলিম বাড়িতে ছুটে আসে তার এই 'স্বপ্ন হলো সত্যি'র খবর জানাতে। ঘাউলির টিফিন ক্যারিয়ারের একজন কাস্টমার সেদিন দুপুরে অভূক্ত রয়ে যায়।

"পর্দায় যেমন দেখা যায় বাস্তবে কি আরমানকে অন্যরকম দেখায়?" জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"না। সামনাসামনি তাকে আরো বেশি ভালো লাগে," বললো সেলিম। "খুব লম্বা আর অনেক বেশি হ্যান্ডসাম সে। আমার জীবনের লক্ষ্য হলো তার সাথে হাত মেলানো। কমপক্ষে একবার। হাত মেলানোর পর সম্ভবত এক মাস আর সেই হাত ধোবো না আমি।"

আমি ভাবলাম, একজন নায়কের সাথে হাত মেলানোর মতো উচ্চাভিলাষিতা কতোই না সহজ সরল, জটিলতাহীন একটি ব্যাপার।

এতোক্ষণে পর্দায় সেই নায়কের হাতে একটা পিস্তল উঠে গেছে, তিন তিনজন পুলিশের দিকে তাক্ ক'রে রেখেছে সে। ছবিতে আরমান একজন গ্যাংস্টারের চরিত্রে অভিনয় করছে। তবে গ্যাংস্টার হলেও তার হৃদয় আছে। ধনীদের সম্পদ লুট করে গরীবের মাঝে সে বিলিয়ে দেয়। এক সময় নায়িকার প্রেমে পড়ে যায় আরমান। উঠতি নায়িকা প্রিয়া কাপুর নায়কের সাথে ছয়টি গানে নর্তন কুন্দন করেছে। নায়ক তার মায়ের ইচ্ছে পূরণ করাতে বৈষ্ণব দেবীর মন্দিরে নিয়ে যায়। ইন্টারভেলের আগে এই হলো ছবির কাহিনী।

ছবিতে প্রিয়া কাপুরকে দেখা মাত্রই সামনের সারি থেকে শিষ বাজানো হলো। লম্বা আর দেখতে আকর্ষণীয়া এই নায়িকা কয়েক বছর আগে মিস্ ওয়ার্ল্ড খেতাব জিতেছে। সরু কোমর আর বিশাল বক্ষার নায়িকার দেহ সৌষ্ঠব একেবারে নিখুঁত সৌন্দর্যের প্রতিভু। সে আমার প্রিয় নায়িকা। ছবিতে সে

অনেক হাসিয়েছে আর বার বার কমেডিয়ানকে 'শাট আপ' বলেছে, যতোবার বলেছে আমরা হেসেছি।

"তোর জীবনের লক্ষ্য তো আরমান আলীর সাথে হাত মেলানো," সেলিমকে বললাম আমি। "কিন্তু আরমানের জীবনের লক্ষ্য কি? মনে তো হয় তার সবই আছে—সুন্দর চেহারা, খ্যাতি, অর্থ।"

"তুই ভুল করছিস," সেলিম গুরুগম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলো। "সে এখনও উর্বশীকে পায় নি।" পত্রপত্রিকায় আরমান উর্বশীর বিচ্ছেদের খবরে সয়লাব। নয় মাসের রোমান্টিক সম্পর্কের অবসান হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, আরমানের হৃদয় ভেঙে খান খান হয়ে গেছে। নাওয়া-খাওয়াও নাকি ছেড়ে দিয়েছে সে। এমনকি আত্মহত্যাও করতে পারে। উর্বশী রানধাওয়া নিজের মডেলিং ক্যারিয়ারে ফিরে গেছে এখন।

আমি দেখলাম সেলিম কাঁদছে। সারা দিনে কিছুই খায় নি সে। হৃদয় আকৃতির কাঁচের যে ফ্রেমে আরমান-উর্বশীর ছবি আছে, যা কিনা তার সারা মাসের আয়ের অর্ধেক টাকা খরচ করে কেনা, ভেঙে মেঝেতে পড়ে আছে সেটা।

"আরে সেলিম। তুই তো পোলাপানের মতো করছিস। এ ব্যাপারে তুই তো কিছুই করতে পারবি না," তাকে আমি বললাম।

"ইস্ একবার যদি আরমানের সাথে দেখা করতে পারতাম। তাকে আমি সান্ত্বনা দিতাম। তাকে আমি সন্ত্বনা দিতে চাই। তার হাত ধরে তাকে আমার কাঁধে মাথা রেখে কাঁদতে দিতে চাই। লোকে বলে কাঁদলে নাকি বুক হালকা হয়ে যায়।"

"তাতে কি লাভ হবে? উর্বশী তো আর আরমানের কাছে ফিরে আসবে না।"

হঠাৎ সেলিম আমার দিকে মুখ তুলে তাকালো। "তোর কি মনে হয় উর্বশীর সাথে আমি কথা বলে দেখবো? হয়তো তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আরমানের কাছে ফিরিয়ে আনতে পারবো। তাকে বলবো, সবই ভুল বোঝাবুঝি। আরমান খুব ভেঙে পড়েছে।"

আমি মাথা বাঁকালাম। আমি চাই না সেলিম সারা মুম্বাই ঘুরে উর্বশীকে খুঁজে বেড়াক। "অন্যের ব্যাপারে তোর নাক গলানোটা ঠিক না। অন্যের সমস্যা তুই কেন নিজের কাঁধে নিবি? এটা ঠিক না। সেলিম, আরমান আলী খুবই বুঝদিল একজন মানুষ। নিজের সমস্যা সে নিজেই সামলাতে পারবে।"

"একটা গিফট তো তাকে পাঠাতে পারি," বললো সেলিম।

বিশাল এক বোতল ফেভিকোল আঠা কিনে সেই ভাঙা ফ্রেমটা জোড়া

লাগালো সেলিম। এ কাজ করতে তার এক সপ্তাহ লেগে গেলো। অবশেষে চৌচিড় হওয়া কাঁচ জোড়া লাগলো, সেলিমও খুশি হলো সেই সঙ্গে।

"এবার আমি আরমানের কাছে এটা পাঠাবো," বললো সে। "ভাঙা হৃদয় যে আবার জোড়া লাগে এটা তারই নির্দশন।"

"ফেভিকোল দিয়ে?" বললাম আমি।

"না। প্রেম ভালোবাসা দিয়ে।"

কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে সেটা আরমান আলীর বাড়ির ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলো সেলিম। আমি জানি না ওটা শেষ পর্যন্ত আরমান আলীর কাছে পৌছেছিলো কিনা। তবে আসল ব্যাপার হলো সেলিম বিশ্বাস করে ওটা তার নায়কের কাছে পৌছেছে, তার হৃদয়ের ক্ষত অনেকটাই প্রশমিত করেছে। আবারো তার নায়ক সিনেমাতে কাজ করতে শুরু করবে। এই ছবিটাই হলো সেই ছবি যা আমি প্রথম আর সেলিম নবম বারের মতো দেখতে এসেছে।

একটা ভক্তিমূলক গান দেখা যাচ্ছে পর্দায়। আরমান আর তার মা বৈষ্ণব দেবীর মন্দিরের সিঁড়ি দিয়ে উঠছে।

"তারা বলছে, বৈষ্ণবি মার কাছে আন্তরিকভাবে কোনো কিছু চাইলে সেটা পাওয়া যায়। আমাকে বল, তুই কি চাইবি?" সেলিমকে বললাম আমি।

"তুই কি চাইবি?" পাল্টা বললো সে।

"আমার মনে হয় টাকা চাইবো আমি," বললাম তাকে।

"আমি চাইবো আরমান আর উর্বশীর যেনো পূণর্মিলন হয়," এক সেকেন্ডও দেরি না করে বললো সে।

ঠিক এমন সময় পর্দায় 'ইন্টারভেল' লেখাটা ভেসে উঠলো।

সেলিম আর আমি উঠে দাঁড়িয়ে হাত-পা ছুড়ে আড়মোরা ভাঙলাম। ভ্রাম্যমান হকারের কাছে থেকে দুটো বাসি সমোচা কিনলাম আমরা। খালি খালি সিটগুলোর দিকে তাকিয়ে কোল্ড ড্রিংক বিক্রেতা ছেলেটার চেহারা বিমর্ষ হয়ে গেলো। আজকে তার বিক্রি ভালো হবে না। টয়লেটে গিয়ে আমি আর সেলিম আমাদের ব্লাডার দুটো খালি ক'রে ফেললাম। টয়লেটের দেয়ালে কিছু লেখা আছে। আমাকে চোদো...টিনু এখানে প্রস্রাব করেছে...শিনা একটা খানকি...আমি প্রিয়াংকাকে ভালোবাসি।

প্রিয়াংকা? লেখাটার দিকে ঝুঁকে আমি হাতে থুতু নিয়ে বাড়তি অক্ষরগুলো মুছে ফেলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কালিগুলো বেশ ভালো ছিলো মনে হয়, একটুও মুছলো না। ফলে হাতের নখ দিয়ে কিছু অক্ষর তুলে ফেললাম আমি।

এবার চার মাস আগে আমারই নিজের হাতে লেখাটা পুণরুদ্ধার হলো আমি প্রিয়াকে ভালোবাসি।

দ্বিতীয় বেলটা বাজলো। ইন্টারভেলের সময় শেষ। ছবিটা আবারো শুরু হলো। সেলিম আমাকে ছবির বাকি গল্প বলে দিয়েছে সংক্ষেপে। আরমান আর প্রিয়া সুইজারল্যান্ডে একটা গান গাইবে। এরপরই প্রতিপক্ষের হাতে খুন হবে প্রিয়া। তারপর শত শত খারাপ লোক খুন হবে আরমানের হাতে। দূর্নীতিবাজ রাজনীতিকদের কার্যকলাপ, পুলিশের আকাম-কুকাম সব ফাঁস হয়ে যাবে। অবশেষে মারা যাবে ছবির নায়ক আরমান আলী।

নিজেদের সিটে ফিরে এলাম আমরা। অন্ধকার হতেই হলে একজন লম্বা মতো লোক প্রবেশ করে সেলিমের পাশের সিটে বসলো। দুশো সিটের মধ্যে সে বেছে নিলো সেলিমের পাশেরটা। তার চেহারাটা দেখা অসম্ভব। তবে সে যে বেশ বয়স্ক আর দাড়িওয়ালা একজন সেটা বুঝতে পারলাম। পরনে তার পাঠানদের পোশাক।

লোকটার ব্যাপারে আমি কৌতুহলী হয়ে উঠলাম। ছবির অর্ধেক হবার পর সে কেন এলো? সে কি অর্ধেক টাকার টিকেট কিনেছে? সেলিম এসব কিছু খেয়ালই করছে না। ছবির দিকেই তার সমস্ত মনোযোগ।

আরমান আর প্রিয়া সুইজারল্যান্ডে গান গেয়ে নেচে বেড়াচ্ছে। তাদের সাথে যোগ দিয়েছে বিশ পঁচিশজন শ্বেতাঙ্গ রমনী। তারাও নাচছে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায়ও তারা সংক্ষিপ্ত পোশাক পরে নাচছে। সেখান থেকে নায়ক আরমান হোটেলে এসে পড়লো। ফায়ারপ্লেসের সামনে বসে আছে এখন।

প্রিয়া বাথটাবে শুয়ে গোসল করছে। গুণগুণ ক'রে গাইছে গান। হাতে পায়ে পিঠে সাবান ঘষে যাচ্ছে সে। আমরা আশা করলাম সাবানটা সে তার বুকেও মাখবে। কিন্তু আমরা হতাশ হলাম।

শেষে একটা গোলাপী রঙের টাওয়েল পেচিয়ে বাথরুম থেকে বের হয়ে এলো সে। আরমান তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো। প্রিয়া তার শার্টের বোতাম খুলতে শুরু করলো এবার। বেরিয়ে পড়লো আরমানের নগ্ন বুক। আগুনের শিখার পাশে তাদের দু'জনকে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। প্রিয়ার মুখ দিয়ে সুখের গোঙানী বের হচ্ছে সঙ্গীতের তালে তালে। আরমান আস্তে ক'রে প্রিয়ার টাওয়েলটা খুলে ছুড়ে মারলো ঘরের এক কোণে। পিঠ আর হাটু অবধি পায়ের একাংশ দেখা যাচ্ছে পর্দায়, কিন্তু বুক দেখা গেলো না কোনো মতেই। সেলিমের বিশ্বাস সেন্সরবোর্ড এটা কেটে দিয়েছে। আরমান আর প্রিয়ার

জড়াজড়ি চলছে। সেলিমের পাশে বসা বৃদ্ধলোকটা অস্বস্তিতে দু'পা নাড়াচাড়া করছে। এক পায়ের উপর আরেক পা রাখছে বার বার। আমি নিশ্চিত না, তবে আমার মনে হচ্ছে লোকটা তার লিঙ্গ হাত দিয়ে মোচড়াচ্ছে।

"তোর পাশের বুইড়াটার মাথায় মাল উঠে গেছে," সেলিমের কানে কানে বললাম। কিন্তু আমার আর বুড়োর দিকে তার কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। আরমান প্রিয়াকে পিষে ফেলছে নিজের বুকে। আস্তে আস্তে দৃশ্যটা মিলিয়ে গিয়ে আগুনের দৃশ্যে চলে এলো।

আমি বস্তির ঘরে ঢুকে ঠিক এই রকমই আগুন দেখতে পেয়েছিলাম। তবে কাঠের বদলে সেলিম কাগজ ব্যবহার করেছিলো। "বানচোত!...কুত্তার বাচ্চা!" একটা দামি ম্যাগাজিনের রঙ্গিন পৃষ্ঠা ছিড়তে ছিড়তে বলছে সেলিম।

"কি করছিস, সেলিম?" বললাম আমি।

"আরমানের বিরুদ্ধে যারা আজেবাজে কথা লিখেছে তাদের উপর প্রতিশোধ নিচ্ছি," কাগজগুলো আগুনে ছুড়ে মেরে বললো সে।

"কোন্ ম্যাগাজিন এটা? দেখে তো নতুন মনে হচ্ছে।"

"*স্টারবার্স্ট*'র নতুন সংখ্যা। যতোগুলো সংখ্যা আমার হাতে আছে সবগুলো আগুনে পোড়াবো আমি। মাত্র দশ কপি কিনেছি।"

অক্ষত একটা ম্যাগাজিন তুলে নিলাম। আরমান আলীকে প্রচ্ছদ ক'রে লেখা হয়েছে : এই লোকের আসল সত্য।

"এটা তো তোর প্রিয় নায়কের ছবি। তুই এগুলো কেন পোড়াচ্ছিস?" আমি আৎকে উঠে বললাম।

"কারণ ভেতরে তারা আরমানের সম্পর্কে জঘন্য সব কথা লিখেছে।"

"তুই তো পড়তে পারিস না, জানলি কিভাবে?"

"আমি ভালোই পড়তে পারি। শুনেছিও অনেক কিছু। এই ম্যাগাজিনের লেখা নিয়ে মিসেস ব্রেভ আর মিসেস শার্কির জঘন্য কথাবার্তা আমি আঁড়ি পেতে শুনেছি। আরমানের সম্পর্কে জঘন্য কথা লেখা হয়েছে এখানে।"

"কি লিখেছে?"

"লিখেছে উর্বশী নাকি আরমানকে ছেড়ে গেছে এজন্যে যে, সে তাকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। সে নাকি একজন সমকামী।"

"তো?"

"তুই কি ভেবেছিস তারা আমার নায়ক সম্পর্কে এসব যা তা লিখবে আর তাদের আমি ছেড়ে দেবো? আমি জানি এই রিপোর্টটা মিথ্যা। ইন্ডাস্ট্রিতে

আরমানের শত্রুরা এগুলো করিয়েছে। তার মান সম্মান নষ্ট করার জন্যেই এসব করা হয়েছে। তাদেরকে আমি সফল হতে দেবো না। আমি *স্টারবার্স্ট*র অফিসে গিয়ে আগুন ধরিয়ে দেবো।"

সেলিমের রাগের কারণটা আমি বুঝতে পারলাম। সে সমকামীদের ঘৃণা করে।

আমিও সমকামীদের ঘৃণা করি। এইসব খচ্চরদের আমি চিনি। অন্ধকার হলে, পাবলিক টয়লেটে বাচ্চা ছেলেদের সাথে তারা কি করে তাও জানি। মিউনিসিপ্যাল গার্ডেন আর জুভেনাইল হোমেও এসব চলে সমান তালে।

ভাগ্য ভালো, *স্টারবার্স্ট* তাদের পরবর্তী সংখ্যায় নিজেদের অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেয়। এর ফলে একজন ডাব্বাওয়ালা ভয়ংঙ্কর সন্ত্রাসী হবার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গিয়েছিলো।

ততোক্ষণে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে গেছে। সেটা পর্দার বাইরে। বিশ নাম্বার সিটে। বুইড়াটা সেলিমের আরো কাছে এসে পড়েছে। নিজের পা দিয়ে সেলিমের পায়ে একটা ঘষা দিলে সেলিম প্রথমবার ভেবে নিলো এটা তার নিজেরই ভুল। দ্বিতীয়বার হলে সে ভাবলো অনিচ্ছায় হয়েছে। কিন্তু তৃতীয়বারের বার সে নিশ্চিত ব্যাপারটা ইচ্ছাকৃতভাবে করা হচ্ছে।

"মোহাম্মদ," আমাকে চাপা কণ্ঠে বললো সে। "আমার পাশে বসা বুইড়া বানচোতটা যদি তার পা দিয়ে আমার পা ঘষাঘষি করা না থামায় আমি বানচোতটাকে কষে একটা লাথি মারবো।"

"আরে দেখ, লোকটা কতো বয়স্ক, সেলিম। হয়তো তার পা কাঁপছে," আমি বোঝাবার চেষ্টা করলাম। ফাইটিং সিকোয়েন্স শুরু হয়ে গেলে সেলিম একেবারে মগ্ন হয়ে পড়লো। আরমান ভিলেনের আস্তানায় হানা দিলে শুরু হয়ে গেলো লঙ্কাকাণ্ড। প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সবধরনের কেরামতিই দেখালো নায়ক—বক্সিং, কারাতে, কুং ফু।

বুইড়ার হাত দুটোও সচল হয়ে উঠলো। সেলিমের পাশে ঝুঁকে একহাত সেলিমকে আলতো স্পর্শ করছে সে। সেলিমের কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই। ছবিতে ডুবে আছে সে, একেবারে চূড়ান্ত ক্লাইমেক্সে।

ছবির সবচাইতে বিখ্যাত দৃশ্যটি দেখা যাবে এখন। সব মন্দলোককে শায়েস্তা করে নায়ক আরমান আলী মারা যাবে। তার বুক রক্তে ভেসে যাচ্ছে। সারা শরীরে বুলেটবিদ্ধ। কোনো মতে সে তার মায়ের কাছে চলে আসছে। এইমাত্র পর্দায় তার মাকে দেখা গেছে ঘটনাস্থলে এসে হাজির হতে। সেলিমের

দু'চোখে পানি। সামনে ঝুঁকে সে আওড়াতে লাগলো, "মা, আশা করি আমি তোমার সুসন্তানই ছিলাম। আমার জন্যে কেঁদো না। মনে রেখো, কাপুরুষের মতো বেঁচে থাকার চেয়ে সম্মানজনক মৃত্যু অনেক ভালো।"

মায়ের কোলে আরমানের মাথা। সে সেলিমের অনুকরণে বললো "মা, আশা করি আমি তোমার সুসন্তানই ছিলাম। আমার জন্যে কেঁদো না। মনে রেখো, কাপুরুষের মতো বেঁচে থাকার চেয়ে সম্মানজনক মৃত্যু অনেক ভালো।" আরমানের রক্তাক্ত শরীর দেখে মাও কাঁদছে। তার অশ্রুজল গড়িয়ে পড়ছে আরমানের মুখের উপর।

আমার কোলেও অশ্রুজল পড়ছে। আরেক জন মাকে আমি দেখতে পাচ্ছি কাফনের কাপড়ে ঢেকে দেয়ার আগে কপালে অনেক চুমু খেলেন তিনি। ব্যাকগ্রাউন্ডে বাতাসের গর্জন। সাইরেনের শব্দ। পুলিশ এসে পৌছেছে। যথারীতি দেরি করে। তাদের হয়ে নায়ক সমস্ত কাজ করার পর। এখন আর তারা তার কিছু করতে পারবে না।

আমি দেখলাম দাড়িওয়ালা লোকটার বাম হাত নড়ছে। সেটা এখন সেলিমের কোলে। মৃত্যুর দৃশ্য দেখে সেলিম একেবারে মুহ্যমান। সে এসব কিছুই খেয়াল করছে না। বুইড়া লোকটা সেলিমের জিঙ্গে তালু ঘষছে। পর্দায় নায়ক শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতেই বুইড়া সেলিমের লিঙ্গটা ধরে মোচড়াতে শুরু ক'রে দিলো।

সেলিম তেঁতে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে। "আরে শালার বানচোত। খাচ্চর ব্যাটা! আমি তোরে খুন করুম।" চিৎকার করে বলেই সে লোকটার গালে কয়েকটা চড় বসিয়ে দিলো বেশ শক্ত করে।

লোকটা হাত সরিয়ে চলে যেতে উদ্যত হলে সেলিম তাকে খপ্ ক'রে ধরে ফেললো। কলার ধরতে না পারলেও লোকটার দাড়ি ধরে ফেললো সে। কিন্তু ছিঁড়ে গিয়ে কিছু দাড়ি সেলিমের হাতে রয়ে গেলে লোকটা আর্ত চিৎকার দিয়ে লাফিয়ে চলে যেতে চাইলো। বিশ ফিট দূরেই এক্সিট সাইন। লোকটা সেদিকেই যাচ্ছে।

ঠিক সেসময় ইলেক্ট্রিসিটি চলে গেলে জেনারেটর চালু হয়ে গেলো। রূপালি পর্দা কালো হয়ে গেলে পুরো হলটা ঢেকে গেলো অন্ধকারে, জ্বলে উঠলো কেবল কয়েকটি ইমার্জেন্সি বাতি। লোকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো। কি করবে বুঝতে পারছে না।

আচম্‌কাই আবার ইলেক্ট্রিসিটি চলে এলো। কেবল কয়েক সেকেন্ডের বিরতি। ছবিটা আবারো শুরু হয়ে গেলো। অন্ধকার হল থেকে উধাও হয়ে গেলো খচ্চর বুইড়াটা।

তবে সেকেন্ডের ভগ্নাংশে সময়ে সেলিম এবং আমি সবুজ রঙের চোখ জোড়া দেখতে পেয়েছিলাম। খাড়া নাক। শক্ত চোয়াল।

পর্দায় কলাকুশলীদের নাম দেখাতে শুরু হলেও সেলিম তার হাতে ধরা দাড়ির অংশ ধরে রেখেছে। সেটা থেকে আঠার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। এবার আর সে কলা কুশলীদের নামধাম দেখলো না। কাঁদতে শুরু করলো।

তার নায়ক আরমান আলী মারা গেছে।

স্মিতা আমার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। "এই ঘটনা কবে ঘটেছিলো?"

"ছয় বছর আগে। তখন সেলিম আর আমি ঘাটকোপারের বস্তিতে থাকতাম।"

"তোমার কি কোনো ধারণা আছে এইমাত্র তুমি আমাকে কি স্মরণ করিয়ে দিয়েছো?"

"কি?"

"এই ঘটনা যদি জানাজানি হয়ে যায় তবে আরমান আলীকে ধ্বংস ক'রে দেবে সেটা। ধ্বংস করে দেবে তার ফিল্ম ক্যারিয়ার। অবশ্য ঘটনাটা যদি সত্য হয়ে থাকে।"

"তাহলে আপনি এখনও আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না?"

"আমি তো সেটা বলি নি।"

"আমি আপনার চোখে এখনও সন্দেহের ছটা দেখতে পাচ্ছি। আপনি যদি আমাকে এখনও বিশ্বাস করতে না পারেন তবে আপনি নিজের ক্ষতিই করছেন। কিন্তু আপনি এই ডিভিডিতে থাকা প্রমাণকে অস্বীকার করতে পারবেন না। আমরা কি প্রথম প্রশ্নটি দেখতে পারি?"

স্মিতা মাথা নেড়ে সায় দিয়ে রিমোটের 'প্লে' বাটনে চাপ দিলো।

স্টুডিওর বাতিগুলো মৃদু হয়ে গেছে। আমার চারপাশে বসে থাকা দর্শকদের দেখতে পাচ্ছি না। পুরো হলে মাঝখানের স্পটলাইটটাই কেবল জ্বলছে। আমি সেটার মাঝেই বসে আছি। আর আমার মুখোমুখি বসে আছে প্রেম কুমার। আমাদের মাঝখানে দুটো কম্পিউটার মনিটর। সেই মনিটরে প্রশ্নগুলো ভেসে উঠবে। স্টুডিওর সাইন জ্বলে উঠলো। তাতে বলা আছে 'সাইলেন্স।'

"ক্যামেরা রোলিং, তিন, দুই, এক, ওকে।"

পরিচিত সঙ্গীতটা বেজে উঠলে প্রেম কুমারের কণ্ঠটা শোনা গেলো একটু পরেই। "আবারও এসেছি আমরা। দেখি আজ কে ইতিহাসের সবচাইতে বড় গেম শোতে বিজয়ী হয়। হ্যা, ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ, প্রস্তুত হন। দেখুন কে জিতে নেয় এক বিলিয়ন রুপি!"

স্টুডিওর সাইন বদলে গিয়ে 'হাততালি' লেখাটা ভেসে উঠলে দর্শকেরাও হাততালি দিতে শুরু করলো নির্দেশনা অনুযায়ী। কেউ কেউ আবার শিষও বাজালো।

প্রেম কুমার বললো, "আজরাতে আমাদের সঙ্গে আছে তিন তিনজন সৌভাগ্যবান বিজয়ী। এদেরকে আমাদের কম্পিউটার বাছাই করেছে। প্রতিযোগী নাম্বার তিন, পশ্চিম বঙ্গের মালদা থেকে আসা কপিল চৌধুরী। প্রতিযোগী নাম্বার দুই, আহমেদাবাদের প্রফেসর হরি পারেখ। কিন্তু আমাদের আজকে প্রথম প্রতিযোগী হলো আঠারো বছরের রাম মোহাম্মদ টমাস। সে এসেছে আমাদের চিরচেনা মুম্বাই থেকে। লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলমেন, তার জন্যে হাততালি দিন।"

সবাই হাততালি দিলো। তালি দেয়া শেষ হলে প্রেম কুমার আমার দিকে ফিরলো। "রাম মোহাম্মদ টমাস, খুব অদ্ভুত নাম। এটাতে ভারতবর্ষের সমৃদ্ধশালী বৈচিত্রতার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। তুমি কি করো, মিঃ টমাস?"

"কোলাবার এলাকায় জিমি'স বারে ওয়েটারের কাজ করি।"

"একজন ওয়েটার! এটা কি আরো বেশি ইন্টারেস্টিং নয়? আমাকে বলো, মাসে তোমার আয় কতো?"

"প্রায় নয়শ রুপি।"

"মাত্র? তাহলে আজকে জিতে গেলে তুমি কি করবে?"

"জানি না।"

"তুমি জানো না?"

"না।"

প্রেম কুমার আমাকে সামান্য একটা ইশারা করলো। আমি স্ক্রিপ্ট অনুসারে কথা বলছি না। আমার তো কিছু মজার কথা বলার কথা। বলার কথা, আমি একটা রেস্তোরাঁ কিনবো, একটা প্লেন অথবা আস্ত একটা দেশও। আমি বলতে পারতাম একটা বড়সড় পার্টি দেবো। মিস্ ইন্ডিয়াকে বিয়ে করবো। টিম্বাকটুতে বেড়াতে যাবো ইত্যাদি।

"ঠিক আছে। নিয়ম কানুনগুলো তোমাকে বলে দিচ্ছি। তোমাকে মোট বারোটি প্রশ্ন করা হবে। যেকোনো সময় তুমি এই শো থেকে চলে যেতে পারো। তবে নয় নাম্বার প্রশ্নের আগে চলে গেলে যে টাকা তুমি পাবে সেটা

নিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু নয় নাম্বারের পর আর যেতে পারবে না। হয়তো খেলতে হবে নয়তো খালি হাতে চলে যেতে হবে। কোনো প্রশ্নের উত্তর না জানলে ঘাবড়ে যেয়ো না। তোমার জন্যে রয়েছে দুটো লাইফবোট—একটা হলো বন্ধুর কাছ থেকে সাহায্য, আর অন্যটা হলো হাফ অ্যান্ড হাফ। তাহলে আমরা এক হাজার রুপির জন্যে প্রথম প্রশ্নটা করতে পারি? তুমি কি রেডি?"

"হ্যা। আমি রেডি," জবাবে বললাম।

"ঠিক আছে। এই হলো এক নাম্বার প্রশ্ন। খুব সহজ একটি প্রশ্ন। আমি নিশ্চিত এখানকার সব দর্শকই সেটার জবাব জানে। আরমান আলী আর প্রিয়া কাপুর এখনকার সময়ের জনপ্রিয় জুটি। কিন্তু তারা প্রথম কোন্ ছবিতে জুটি বেঁধেছিলো? এ) ফায়ার, বি) হিরো, সি) হাঙ্গার, নাকি ডি) বিট্রেয়াল?"

ব্যাকগ্রাউন্ডে সাসপেন্স সঙ্গীত বাজতে শুরু করলো, সেই সাথে টিকটিক ক'রে সময় চলার শব্দ।

"ডি, বিট্রেয়াল," জবাবে বললাম আমি।

"তুমি কি খুব ছবি দ্যাখো?"

"হ্যা।"

ড্রামের ধুমধুম শব্দ বাজতে লাগলো। পর্দায় ভেসে উঠলো উত্তর সঠিক হয়েছে। "একদম ঠিক, একশত ভাগ সঠিক! তুমি এক হাজার রুপি জিতে গেছো! এখন আমরা ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাবো," প্রেম কুমার বললো।

স্টুডিওর সাইনটা আবারো 'হাত-তালি'তে বদলে গেলো। দর্শকেরাও শুরু করলো হাত তালি দিতে। প্রেম কুমার হাসছে। কিন্তু আমি হাসছি না।

একজন পাদ্রির দায়

আপনি যদি ট্রেনে ক'রে দিল্লিতে এসে থাকেন তাহলে আপনি অবশ্যই পাহাড়গঞ্জ গিয়ে থাকবেন। আপনি পাহাড়গঞ্জের হৈহল্লা আর ধূলোবালিতে পরিপূর্ণ রেল স্টেশনে কোনো না কোনোভাবে পৌছাবেনই। আপনি স্টেশন থেকে বের হয়ে অবশ্যই কনৌট প্লেসের অভিমুখে যাবেন। জনাকীর্ণ মার্কেট আর স্বল্পমূল্যের গেস্ট হাউজ পেরিয়ে টুরিস্টদের জন্যে সস্তা পতিতালয় পাশ কাটিয়ে যেতে হবে আপনাকে। কিন্তু আপনি যদি ডান দিকে মোড় নিয়ে মাদার ডেইরি অতিক্রম করেন তবে জে.জে হসপিটাল সংলগ্ন একটা বিশাল লাল রঙের ভবন দেখতে পাবেন। এ হলো সেন্ট মেরি চার্চ। আঠারো বছর আগে ওখানেই আমি জন্মেছিলাম এক ক্রিসমাসের দিনে। অথবা ঠিক ক'রে বলতে গেলে, এই সেই জায়গা যেখানে ডিসেম্বরের ২৫ তারিখে শীতের হিমশীতল রাতে আমাকে পরিত্যাক্ত অবস্থায় ফেলে দেয়া হয়। একটা বিশাল বিনে আমাকে ফেলে দেয়া হয়, যা সিস্টাররা পুরনো কাপড় রাখার কাজে ব্যবহার করতেন। কে আমাকে রেখে গিয়েছিলো, কেন রেখেছিলো আমি জানি না। আজ পর্যন্ত সেটা আমার অজানাই রয়ে গেছে। সন্দেহের তীরটা সব সময়ই কাছের জে.জে হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগের দিকে তোলা হোতো। সম্ভবত, আমি ওখানেই জন্মেছিলাম, কিভাবে কোন্ কারণে, সেটা কেবল তিনিই জানতেন। তবে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন আমাকে পরিত্যাগ করতে।

মনে মনে আমি প্রায়ই একটা দৃশ্য চোখের সামনে দেখি। শাড়ি পরিহিত লম্বা, অভিজাত এক মহিলা, কোলে বাচ্চা নিয়ে মাঝরাতে হাসপাতাল ত্যাগ করছেন। তার দীর্ঘ কালো চুলের কারণে মুখটা ঢেকে আছে। তার পায়ের নিচে মরা পাতা আর ধূলো উড়ছে। আলোর ঝলকানি। চার্চের সিঁড়ির কাছে এগিয়ে যাচ্ছেন তিনি। বাচ্চাটাকে বুকে জড়িয়ে চার্চের দরজায় কড়া নাড়লেন। কিন্তু বাতাসের বেগ খুব বেশি থাকায় কড়া নাড়ার শব্দটা মিলিয়ে গেলো। তার হাতে সময় খুব কম। অশ্রব ভরা চোখে বাচ্চাটার গালে চুমু খেলেন তিনি। তারপর পুরনো কাপড়ের বিনে বাচ্চাটা রেখে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখলেন। শেষবারের

মতো বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে মুখটা সরিয়ে নিলেন। দৌড়ে সরে গেলেন ক্যামেরার ফ্রেম থেকে। রাতের অন্ধকারে উধাও হয়ে গেলেন মহিলা...

সেন্ট মেরির সিস্টাররা একটা এতিমখানা এবং এডাপশান এজেন্সি পরিচালনা করেন। এখানে সব বাচ্চাই সংগ্রহ করা হয় কিন্তু কেউই আমার মতো এখানে আসে নি। সম্ভাব্য এক মা আর বাবা আমার দিকে তাকিয়ে একে অন্যের দিকে চাওয়া চাওয়ি করে মাথা নেড়ে পরবর্তী দোলনায় থাকা বাচ্চার দিকে এগিয়ে গিয়েছিলো দেখার জন্যে। আমি জানি না কেন। সম্ভবত, আমার গাঁয়ের রঙ খুব বেশি কালো। খুব বেশি কুৎসিত। হতে পারে আমার হাসি সুন্দর না। কিংবা মুখ দিয়ে ঘর ঘর শব্দ হয়। সুতরাং আমাকে দু'বছর পর্যন্ত এতিমখানাতেই থাকতে হলো। অদ্ভুত ব্যাপার হলো সিস্টাররা আমার কোনো নাম দিলো না। আমাকে কেবল খোকা বলে ডাকা হোতো যাকে কেউ নিতে চায় না।

অবশেষে আমাকে দত্তক নিলেন মিসেস ফিলোমেনা টমাস এবং ডমিনিক টমাস। তাদের মূল আবাস ছিলো তামিল নাড়ুর নাগের কয়েলে, তবে তখন তারা বাস করতেন দিল্লিতে। মিসেস টমাস সেন্ট জোসেফ চার্চে ক্লিনারের কাজ করতেন। আর তার স্বামী কাজ করতেন বাগানের মালি হিসেবে। যেহেতু তাদের দু'জনের বয়স চল্লিশ পেরোলেও নিঃসন্তান ছিলেন তাই চার্চের ফাদার টিমোথি ফ্রান্সিস তাদের জীবনকে পরিপূর্ণ করার জন্যে বাচ্চা দত্তক নিতে চাপাচাপি করেছিলেন। এমন কি সেন্ট মেরির এতিমখানার ঠিকানাও তিনিই তাদের দিয়েছিলেন। মিঃ টমাস আমার দিকে একবার তাকিয়েই পরের বাচ্চাটার কাছে চলে গিয়ে থাকবেন। কিন্তু মিসেস ফিলোমেনা আমাকে একবার দেখেই নির্বাচন ক'রে ফেলেন। তার কালো রঙের সাথে আমারটা খুব সুন্দরভাবেই খাপ খেয়ে গিয়েছিলো বলে।

আমার দত্তকের কাগজপত্র শেষ করতে টমাস দম্পতির দু'মাস সময় লেগে যায়। কিন্তু আমাকে তাদের বাড়িতে নেয়ার তিন দিনের মাথায় এবং আমাকে খৃস্ট ধর্মে দীক্ষিত করার আগেই মিঃ টমাস আবিষ্কার করলেন তার স্ত্রীর জীবনে যে শূন্যতা ছিলো সেটা ইতিমধ্যেই পূরণ হয়ে গেছে। আমার আগমনে নয়, মাস্তান শেখ নামের এক মুসলিম ভদ্রলোকের মাধ্যমে। ঐ লোকটা ছিলো স্থানীয় এক লেডিস টেলর। শর্ট স্কার্ট বানানোতে যার দক্ষতা ছিলো। মিসেস ফিলোমেনা টমাস তার স্বামী আর দত্তক নেয়া বাচ্চাটাকে ফেলে ঐ টেলরের সাথে ভুপালে ভেগে যান। আজ পর্যন্ত তার অবস্থানের কথা

জানা যায় নি। পুরো ঘটনায় মিঃ টমাস খুবই রেগে যান। আমাকে আমার দোলনাসহ পাদ্রির আঙিনায় ফেলে দেন তিনি। "ফাদার, এই বাচ্চাটাই আমার জীবনের এরকম জঘন্য ঘটনার জন্যে আসলে দায়ি। আপনিই তো আমাকে জোর করে ওকে দত্তক নিতে বলেছিলেন, এখন আপনিই ঠিক করেন কি করবেন।" ফাদার টিমোথি 'আমেন' বলার আগেই মিঃ টমাস চার্চ থেকে চলে যান। তাকে শেষ দেখা গেছে ভুপালের ট্রেনের টিকেট কাটতে। হাতে তখন একটা শর্টগান ছিলো। সুতরাং ঘুরে ফিরে আমি আবারো ফাদার টিমোথির দায় হয়ে উঠলাম। তিনি আমাকে খাবার, আশ্রয় আর নাম দিলেন জোসেফ মাইকেল টমাস। কোনো ব্যাপটিজম অনুষ্ঠান করা ব্যতীত। কোনো পাদ্রি আমার মাথায় পানি ঢেলে দেন নি। হলিওয়াটারও ছিটানো হয় নি। তবে আমি জোসেফ মাইকেল টমাস হয়ে উঠলাম। অবশ্য সেটা মাত্র ছয় দিনের জন্যে।

সপ্তম দিনের মাথায় ফাদারের সাথে দু'জন লোক এলো দেখা করতে। মোটাসোটা একলোক, পরনে তার সাদা রঙের কুর্তা পায়জামা আর শেরওয়ানি পরা চিকন একজন।

"আমরা সর্ব ধর্ম কমিটি থেকে এসেছি," মোটা লোকটা বললো, "আমি জগদিশ শর্মা। ইনি হলেন ইনায়েত হেদায়েতুল্লাহ। আমাদের তৃতীয় বোর্ড সদস্য হারবিন্দর সিং, যিনি শিখ সম্প্রদায়কে প্রতিনিধিত্ব করেন, তিনি একটা কাজে ব্যস্ত থাকায় আসতে পারেন নি। আমরা সোজা কাজের কথায় আসি। আমরা জানতে পেরেছি আপনি একজন শিশুকে এতিমখানায় আশ্রয় দিয়েছেন।"

"হ্যা। ঐ বাচ্চাটার দত্তক বাবা-মা লাপাত্তা হয়ে গেছে। আমার কাছে ফেলে রেখে গেছে তাকে," বললেন ফাদার, এখনও তিনি বুঝতে পারছেন না তারা কেন তার কাছে এসেছে।

"বাচ্চাটার নাম কি রেখেছেন?"

"জোসেফ মাইকেল টমাস।"

"এটা তো খৃস্টান নাম, তাই না?"

"হ্যা, তবে—"

"আপনি কিভাবে জানলেন বাচ্চাটা খৃস্টান হয়ে জন্মেছে? মানে তার বাবা মা খৃস্টান?"

"না, তা জানি না।"

"তাহলে তাকে খৃস্টান নাম দিলেন কেন?"

"তাকে তো কোনো নামে ডাকতে হবেই। জোসেফ মাইকেল টমাস নামটাতে সমস্যা কি?"

"অনেক সমস্যা। আপনি কি জানেন না, আমাদের এলাকায় ধর্মান্তরিত হবার বিরুদ্ধে কতো প্রবল আন্দোলন হচ্ছে? অনেকগুলো চার্চে আগুন দেয়া হয়েছে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করার জন্যে।"

"কিন্তু তাকে তো ধর্মান্তরিত করা হয় নি।"

"দেখুন ফাদার, আমরা জানি আপনার কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নেই। কিন্তু খবর ছড়িয়ে পড়েছে, আপুনি নাকি একজন হিন্দু ছেলেকে ধর্মান্তরিত করেছেন।"

"কিন্তু আপনি কি করে জানলেন সে হিন্দু?"

"আগামীকাল যেসব বিক্ষুব্ধ মানুষ আপনার চার্চে আগুন দেবে তাদের কাছে এটা কোনো বিষয় নয়। এজন্যেই তো আমরা এসেছি। পরিস্থিতিটাকে প্রশমিত করতে।"

"তাহলে আপনারা আমাকে কি করতে বলছেন?"

"আমি বলবো, বাচ্চাটার নাম বদলে ফেলুন।"

"কি নাম দেবো?"

"টমাস...তাকে একটা হিন্দু নাম দিয়ে দিলে মনে হয় কাজে দেবে। তাকে রাম নামটা দিলে কেমন হয়, রাম তো আমাদের খুবই জনপ্রিয় দেবতার নাম। তাই না?" মিঃ শর্ম বললো।

মিঃ হেদায়েতুল্লাহ্ আলতো ক'রে কাশি দিলেন। "মাফ করবেন, মিঃ শর্মা। আমরা কি এক শয়তানের বদলে আরেক শয়তানকে বসাচ্ছি না? মানে, ছেলেটা যে হিন্দু সেটারই বা প্রমাণ কি? মুসলিমও তো হতে পারে। তাকে কেন মোহাম্মদ নামে ডাকা হবে না?"

পরবর্তী ত্রিশ মিনিট ধরে মিঃ শর্মা আর মিঃ হেদায়েতুল্লাহ এ নিয়ে তর্ক বিতর্ক ক'রে গেলেন। শেষে ফাদার টিমোথি বললেন, "দেখুন, বাচ্চাটার নাম বদলালে যদি আমার পেছনে দুষ্কৃতিকারীরা না লাগে, তবে আমি নাম পাল্টাবো। আপনাদের দু'জনের নামটাই মেনে নিলে কেমন হয়? নামটা হবে রাম মোহাম্মদ? এতে তো সবাই খুশি হবে।"

আমার ভাগ্য ভালো ঐ দিন মিঃ সিং আসেন নি।

ফাদার টিমোথি লম্বা চওড়া মধ্যবয়স্ক শ্বেতাঙ্গ এক ভদ্রলোক। চার্চের কম্পাউন্ডের ভেতরে তার বিশাল একটা বাড়ি আর ফলের বাগান ছিলো। পরবর্তী ছয় বছর তিনি আমার বাবা, মা, প্রভু, শিক্ষক এবং যাজক হিসেবেই ছিলেন। আমার জীবনের কোনো সুখী মুহূর্ত থাকলে সেটা তার সান্নিধ্যে থাকা ঐ সময়গুলো।

ফাদার টিমোথি এসেছিলেন উত্তর ইংল্যান্ডের ইয়র্ক নামের অঞ্চল থেকে। তবে দীর্ঘ দিন ধরেই তিনি ইন্ডিয়াতে বসবাস ক'রে আসছেন। আমি যে কুইন্স ইংলিশ লিখতে ও পড়তে পারি সেটার জন্যে তাকে ধন্যবাদ দিতে হয়। 'টুইংকেল টুইংকেল লিটল স্টার' এবং 'বা বা ব্লাকশিপ' গান গাইতাম আমি বাজখাই গলায়। আমি ছিলাম ফাদার টিমোথির পাদ্রির কাজে একমাত্র বিনোদন।

ফাদার টিমোথির সাথে তার বিশ্বস্ত চাকর জোসেফ থাকতো। মিসেস গনজালেস নামের মহিলা পরিচারিকাও থাকতো বাড়ির খুব কাছেই। আর পথঘাটের শিশুর দল সুইপারের ছেলেমেয়েরা চার্চের খুব কাছেই থাকার জন্যে প্রায়শই তারা চার্চ কম্পাউন্ডে এসে ফুটবল-ক্রিকেট খেলতো। ফাদার টিমোথি আমাকে জিশু, আদম-হাওয়ার গল্প শোনাতেন। অন্যান্য ধর্মের ব্যাপারেও জানাতেন তিনি। মহাভারত আর পবিত্র কোরানের কথাও আমি তার কাছ থেকে শুনেছি। আমি জানতে পেরেছিলাম নবী মক্কা থেকে মদিনায় উড়ে গিয়েছিলেন। বেথলেহেম, অযোধ্যা, সেন্ট পিটার এবং হজ্জ সবই আমার জীবনের অংশ হয়ে উঠলো।

যদিও এর মানে এই নয় যে, আমি খুব ধর্মভীরু ছিলাম। অন্যান্য ছেলেদের মতো আমিও তিনটি বিষয়ে ব্যস্ত ছিলাম খাওয়া দাওয়া, ঘুম আর খেলাধূলা। শৈশবে আমি আমার অনেক বিকেল-দুপুর কাটিয়েছি প্রতিবেশী ছেলেমেয়েদের সাথে প্রজাপতি ধরে আর ফাদারের বাগানে পাখিদের অতিষ্ঠ করে। বাগানের মালিদের চোখ ফাঁকি দিয়ে গাছের পাকা আম চুরি ক'রে খেয়েছি অনেক বার। ধরা পড়লে আমি হিন্দি ভাষার অপব্যবহার করতাম উদারভাবে। বৃষ্টিতে অনেক ভিজেছি, নেচেছি, আশেপাশের নালা-ডোবায় মাছ ধরেছি। পথঘাটের বাচ্চাদের সাথে ফুটবল খেলেছি। তাদের হাতে মার খেয়ে নাস্তানাবুদ হয়ে কেঁদেছি কতো রাত।

ফাদার টিমোথি বেশ ব্যস্ত সময় কাটাতেন। প্রত্যেক সকালে হাটতেন, টেনিস, গলফ, ভলিবল খেলতেন। প্রচুর বই পড়তেন তিনি। বছরে তিনবার ছুটি কাটাতেন, ইংল্যান্ডে গিয়ে বৃদ্ধ মাকে দেখে আসতেন তখন। তিনি খুব ভালো বেহালা বাজাতেন। বেশির ভাগ রাতে তিনি বাগানে বসে চমৎকার সুরের মূর্ছনা তুলতেন। বর্ষাকালে রাতে বৃষ্টি হলে আমি ভাবতাম আকাশ তার সুর শুনে কাঁদছে।

চার্চে যেতে আমি খুব উপভোগ করতাম। ১৮৭৮ সালে তৈরি পুরনো একটা ভবন। বেদীটা ছিলো দারুণ সুন্দর। তার উপর ছিলো জিশুর ক্রুশবিদ্ধ একটা মূর্তি। সেই মূর্তির উপর লেখা ছিলো INRI। ভার্জিন মেরি আর শিশু

জিশুর মূর্তিও ছিলো ওখানে, ফাদার টিমোথি বেদীতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ সারমন প্রদান করতেন। আমি তখন বসে বসে ঝিমাতাম। চার্চের অরগান আর কয়্যার সঙ্গীতও আমার বেশ ভালো লাগতো। ইস্টারের ডিম আর ক্রিসমাস ট্রর প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম আমি। দুঃখের ব্যাপার হলো ওগুলো বছরে মাত্র একবার আসতো। তবে চার্চে অনুষ্ঠিত বিয়ের আসর চলতো সারা বছর ধরেই। ফাদার টিমোথির মুখ থেকে একটা কথা শোনার জন্যে আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম, "এখন তুমি তোমার নববধূকে চুমু খেতে পারো।" আমিই সবসময় প্রথম কনফেত্তি ছুঁড়ে মারতাম।

ফাদার টিমোথির সাথে আমার সম্পর্কটা কখনই চিহ্নিত করা যায় নি। আমার কাছে কখনই পরিষ্কার ছিলো না আমি তার চাকর, ছেলে, পরগাছা নাকি পোষা প্রাণী। তাই প্রথম কয়েক বছর আমি এই ভ্রান্ত এবং সুখী একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম যে, ফাদার টিমোথিই আমার সত্যিকারের বাবা। তবে আস্তে আস্তে আমি বুঝতে পারলাম অনেক ফাঁকই আছে তাতে। তার মধ্যে একটা হলো, যারা চার্চে আসতো তারা প্রায় সবাই তাকে ফাদার বলেই ডাকতো। এতে ক'রে আমার মনে হলো তিনি অনেক লোকেরই বাবা, আর আমার ভাইবোনের সংখ্যাও অনেক। যারা সবাই আমার চেয়ে অনেক বড়। তার গায়ের সাদা রঙও আমাকে দ্বিধায় ফেলে দিতো। কারণ আমারটা সেরকম নয়। তাই একদিন তাকে আমি একথা জিজ্ঞেস করলে তিনি আমার এতোদিন ধরে বাস করা জগৎটি ভেঙেচুড়ে দিলেন। খুব ভদ্রভাবে তিনি বললেন আমি একজন এতিম শিশু, আমার মা আমাকে ফেলে গেছেন এই চার্চে। এজন্যে তিনি শ্বেতাঙ্গ কিন্তু আমি তা নই। তখন থেকে আমি ফাদার এবং বাবার মধ্যে আসল পার্থক্যটা বুঝতে পারলাম। সেই রাতে আমার দু'চোখ বেয়ে কান্নাগুলো প্রথমবারের মতো শারিরীক যন্ত্রণা প্রসূত ছিলো না।

যখন থেকে এ সত্যটি জানলাম, আমার মনে হলো আমি ফাদারের উদারতার কারণে এখন পর্যন্ত টিকে আছি, সুতরাং তার প্রতি আমার অশেষ ঋণ শোধ করার সিদ্ধান্ত নিলাম আমি। তার জন্যে ছোটোখাটো কাজ করতে শুরু করে দিলাম। যেমন তার জামা-কাপড় ওয়াশিং মেশিনে ঢুকিয়ে বসে থাকতাম। দেখতাম কিভাবে ময়লা কাপড়গুলো পরিস্কার হয়ে বের হয়ে আসে। একবার কিছু ময়লা বইপুস্তকও ওটাতে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম পরিস্কার করার জন্যে। রান্নাঘরে তার ডিশগুলো ধুয়ে দিতাম। তরিতরকারি কাটতে গিয়ে হাতের আঙুলই কেটে ফেলতে যাচ্ছিলাম একবার।

ফাদার আমাকে তার কাছে আসা অনেক প্রার্থনাকারীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। বৃদ্ধ মিসেস বেনেডিক্টের সাথে আমার পরিচয় হয়, যিনি প্রতিদিনই চার্চে আসতেন। বৃষ্টিতে আছাড়া খেয়ে পড়ে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যাবার আগ পর্যন্ত তিনি একটা দিনও বাদ দিতেন না। আমি জেসিকার বিয়ের অনুষ্ঠানেও উপস্থিত ছিলাম, সে এতো বেশিই কান্নাকাটি করেছিলো যে, তার বাবা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যায়। একবার আমি কর্নেল ওয়াহ্‌র বাসায় চা পান করেছিলাম। যিনি ছিলেন দিল্লিতে অবস্থিত অস্ট্রেলিয়ান ডিফেন্স অ্যাটাশি। তিনি এবং ফাদার টিমোথি যখন কথা বলতেন আমি তার কিছুই বুঝতাম না। মনে হোতো অন্য কোনো ভাষায় তারা কথা বলছে। মি: লরেন্সের সাথে আমি মাছ ধরতে গিয়েছিলাম, কিন্তু কোনো মাছ না ধরতে পেরে বাজার থেকে একটা বড় মাছ কিনে তিনি তার বউকে ধোকা দিয়েছিলেন।

আমি যেসব লোকজনের সাথে পরিচিত হয়েছি তারা ফাদার টিমোথির দারুণ প্রশংসা করতো। তারা বলতো তিনি তাদের দেখা সবচাইতে সেরা পাদ্রি। দুঃস্থকে সেবা দেয়া, অসুস্থকে ওষুধ-চিকিৎসা দেয়া এবং অভাবিদের টাকা ধার আর অভূক্তকে নিজের খাবার থেকে খেতে দিতে দেখেছি। সবার সাথেই তিনি হাসি মুখে কথা বলতেন। আজ রোববার। প্রার্থনার জন্যে চার্চ ভরে গেছে লোকজনে। তবে আজ ফাদার টিমোথি আর বেদীতে একা নন। তার পাশে আরেক জন লোক আছে। এ লোকও ফাদারের মতো পোশাক পরে আছে। তাকে পাদ্রি না বলে বক্সার বললেই বেশি মানাবে। ফাদার টিমোথি তাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন, "ফাদার জন লিটলকে অভ্যর্থনা জানাতে পেরে আমরা ভীষণ খুশি। তিনি সেন্ট জোসেফ চার্চের সহযোগী পাদ্রি হিসেবে যোগ দিয়েছেন। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, ফাদার জন খুবই তরুণ। মাত্র তিন বছর আগে তিনি দীক্ষা লাভ করলেও বেশ অভিজ্ঞই বলা চলে তাকে। আমি নিশ্চিত, তিনি আমাদের তরুণ প্রার্থনাকারীদেরকে আরো ভালোমতো বুঝতে পারবেন, যারা পেছনের বেঞ্চে বসে ফিস্‌ফিস্ ক'রে আমাকে একজন 'বুড়ো' বলে অভিহিত করে থাকে।" সবাই হেসে উঠলো তার কথা শুনে। সেদিন রাতে ফাদার টিমোথি ফাদার জনকে ডিনারের জন্যে আমন্ত্রণ জানালেন। গৃহপরিচারিকা জোসেফেরই খাবার পরিবেশন করার কথা ছিলো, কিন্তু ফাদারকে খুব বেশি খুশি করার জন্যে রান্নাঘর থেকে আমি নিজেই সুপের বাটি নিয়ে ডাইনিং টেবিলের দিকে যেতে উদ্যত হই। সাত বছরের বালকের পক্ষে যেটা করা ঠিক না, সেটা করতে গিয়ে আমি টেবিলে সুপের বাটি রাখার সময় ফাদার জনের উপর ফেলে দেই। তিনি দ্রুত উঠে দাঁড়ান। আর তার মুখ দিয়ে যে শব্দটি বের হয় সেটা হলো, "ব্লাডি হেল।" ফাদার টিমোথি ভুরু তুললেও মুখে কিছু বললেন না।

তিন দিন পর ফাদার টিমোথি ছুটি নিয়ে ইংল্যান্ডে গেলেন। চার্চ এবং আমাকে ফাদার জনের হাতে রেখে গেলেন তিনি। দু'দিন পর চার্চের সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় আমার সাথে তার দেখা হলো।

"গুড ইভিনিং, ফাদার," আমি বললাম বেশ নম্রভাবে।

ফাদার জন আমার দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকালেন। "আমার গায়ে সুপ ফেলে দেয়া সেই এতিম ছেলেটা তুমি না? ফাদার টিমোথির অনুপস্থিতিতে তুমি ভালো ব্যবহার করবে। আমি তোমাকে কড়া নজরে রাখছি।"

জোসেফ আমাকে এক গ্লাস দুধ দিয়ে ফাদার জনের ঘরে পাঠালো। টিভিতে একটা ছবি দেখছিলেন তিনি। আমাকে ভেতরে আসতে বললেন ফাদার। "ভেতরে আসো, টমাস। তুমি কি আমার সাথে বসে এই ছবিটা দেখতে চাও?" টিভির দিকে তাকালাম আমি। একটা ইংরেজি ছবি চলছে—একজন পাদ্রি আরেকজন পাদ্রির সাথে কথা বলছে। ভাবলাম ছবিটা পাদ্রিদের নিয়ে। ফাদার জন ধর্মীয় ছবির ভক্ত দেখে আমি হাপ ছেড়ে বাঁচলাম। কিন্তু ঠিক পরের দৃশ্যটা দেখে আমার শিড়দাড়া দিয়ে শীতল একটা প্রবাহ বয়ে গেলো। কারণ পর্দায় দেখা গেলো আমার বয়সী এক মেয়ে বিছানায় বসে আছে। তার ভাবসাব দেখে আমার কাছে স্বাভাবিক ব'লে মনে হলো না। পাদ্রি ঘরে ঢোকামাত্রই মেয়েটা জঘন্য সব শব্দ আওড়াতে শুরু করলো। সেটাও আবার পরিপূর্ণ বয়স্ক কোনো তরুণের কণ্ঠে। আমি আমার কানে আঙুল দিয়ে চাপ দিলাম, কারণ ফাদার টিমোথি আমাকে বলেছিলেন খারাপ শব্দ না শুনতে। আচম্‌কা মেয়েটা কথা থামিয়ে উন্মাদের মতো হাসতে লাগলো। তারপর সে মুখ হা করলে মুখ দিয়ে সবুজ রঙের তরল পদার্থ বের হতে লাগলো বিশ্রীভাবে। দেখে আমার বমি হবার জোগার হলো। আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। দৌড়ে আমার ঘরে চলে এলাম। শুনতে পেলাম ফাদার জন অট্টহাসিতে ফেঁটে পড়ছেন। "ফিরে আসো, বোকাসোকা এতিম ছেলে। এটা তো কেবল একটা সিনেমা," চিৎকার ক'রে বললেন তিনি।

সেই রাতে আমি দুঃস্বপ্ন দেখলাম।

তিনদিন পর আমি জোসেফের সাথে কেনাকাটা করতে বাইরে গেলাম। আমরা দুধ, ডিম, শাকসব্জি আর ময়দা কিনলাম বাজার থেকে। সন্ধ্যার দিকে চার্চে ফিরে এলে আমি আমার পেছনে মোটর সাইকেলের শব্দ শুনতে পেলাম।

পেছনে তাকানোর আগেই মোটরসাইকেলের লোকটা আমাদের ঠিক কাছে এসে আমার মাথায় চাটি মেরে বসলো। তারপর চিৎকার ক'রে ধুলো উড়িয়ে চলে গেলো সে। আমি কেবল তার পেছনটা দেখতে পেলাম। মনে হলো বেশ মোটাসোটা এক লোক, লেদার জ্যাকেট আর কালো রঙের টাইট প্যান্ট পরা। ঠিক এরকমই পোশাক পরা আরেক লোক প্যাসেঞ্জার সিটে বসে আছে। ভাবলাম মোটরবাইকের লোকটা কে, আর কেনই বা আমার মাথায় চাটি মারলো। আমার এটা মনে হয় নি, লোকটা ফাদার জন হতে পারে। হাজার হোক, আমি হলাম বোকাসোকা এতিম এক ছেলে।

এক সপ্তাহ পর আমি ফাদার জনের কাছে কিছু চিঠি দিতে গেলাম। ফাদার তখন গোসল করছিলেন। চলে আসার সময় আমি দেখতে পেলাম তার ম্যাট্রেসের নীচ থেকে কি যেনো উঁকি মারছে। ভালো ক'রে সামনে গিয়ে দেখলাম একটা ম্যাগাজিন। টেনে বের করলাম সেটা। দেখতে পেলাম ম্যাট্রেসের নিচে ওরকম ম্যাগাজিন আরো অনেক রয়েছে। ম্যাগাজিনগুলোর নাম *গে প্যারেড, আউট* এবং *গে পাওয়ার*। কিন্তু প্রচ্ছদের লোকগুলো দেখে মনে হলো না তারা খুব সুখী এবং সমকামী। সবগুলো পুরুষই লোমশ আর নগ্ন। তাড়াতাড়ি ম্যাগাজিনগুলো ম্যাট্রেসের নিচে ঢুকিয়ে রাখলাম আবার। যখন চলে যাচ্ছি ফাদার জন বাথরুম থেকে বের হয়ে এলেন। তার কোমরে একটা তোয়ালে পেঁচানো। কিন্তু তার বুকটা অদ্ভুত কালো কালিতে আঁকিবুকি করা। তার হাতে শাপের ছবি আঁকা। "তুমি এখানে কি করছো?" বাজখাই গলায় বললেন তিনি। "ফোটো এখান থেকে!"

ফাদার জন কেন তার শরীরে এসব অদ্ভুত জিনিস এঁকে রেখেছেন আর কেনইবা তার বিছানার নিচে এসব ম্যাগাজিন রাখা আমি জানি না। আমি হলাম নিতান্তই বোকাসোকা এতিম এক ছেলে।

আমি প্রায়শই ফাদার জনের রুমে রাতের বেলায় অজানা সব লোকজনের আনাগোনা দেখতে লাগলাম। ফাদার টিমোথির কাছেও দিনরাত লোকজন আসতো, কিন্তু তাদের কেউই মোটরসাইকেলে চড়ে লেদার জ্যাকেট পরে হাতে গলায় চেইন লাগিয়ে আসতো না। সে রকমই একজন ভিজিটরকে অনুসরণ করলাম আমি। দরজায় নক্ করতেই দরজা খুলে দিলেন ফাদার জন,

আর লোকটা ভেতরে ঢোকা মাত্রই তিনি দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন। কি-হোল দিয়ে আমি চোখ রাখলাম। জানতাম কাজটা খারাপ কিন্তু আমার কৌতুহল ছিলো প্রচণ্ড। কি-হোল দিয়ে দেখতে পেলাম ফাদার জন আর ঐ লোকটা বিছানায় বসে আছে। ফাদার জন তার ড্রয়ার খুলে প্লাস্টিকের প্যাকেট থেকে সাদা পাউডার বের ক'রে তার বাম হাতের পেছনে পাতলা একটা লাইন করে ছড়িয়ে দিলেন। এরপর তিনি তার বন্ধুর বাম হাতেও একই কাজ করলেন। তারপর তারা দু'জনে বসে হাতের উল্টো দিকে রাখা পাউডারগুলো নাক দিয়ে টেনে নিলেন। ফাদার জন ছবির সেই মেয়েটির মতো হেসে উঠলেন। তার বন্ধু বললো, "খুব ভালো জিনিস, ম্যান! একজন পাদ্রির জন্যে তো আরো ভালো। এই চার্চে তুমি ঢুকলে কি করে?"

আবারো হেসে ফেললেন ফাদার জন। "আমি পোশাকটা পছন্দ করি," কথাটা বলেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। "আসো," বন্ধুকে ডেকে হাত বাড়ালেন তিনি। আমি তাড়াতাড়ি পিছু হটে গেলাম। ফাদার জন কেন নাক দিয়ে ট্যালকম পাউডার নিলেন, আমি জানি না। কিন্তু তখন তো আমি নিতান্তই বোকাসোকা এতিম এক ছেলে ছিলাম।

ফাদার টিমোথি ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এলে আমি খুব খুশি হলাম। আমি নিশ্চিত তিনি ফাদার জনের বিরুদ্ধে অনেক নালিশ শুনেছেন। কারণ তার ফিরে আসার দু'দিন বাদেই স্টাডিরুমে তাদের দু'জনকে তুমুল তর্ক করতে দেখা গেলো। ফাদার জন রেগেমেগে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

ইস্টার শেষ হয়ে গেছে। আমি আমার সবগুলো ইস্টার ডিম খেয়ে ফেলেছি। গৃহপরিচারিকা মিসেস গনজালেস গজ গজ করছে।

"কি হয়েছে, মিসেস গনজালেস?" আমি জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

"আরে, তুমি কি জানো না?" মহিলা বললো ফিস্‌ফিস্ করে। "ফাদার জনের সাথে এক লোককে ধরে ফেলেছে জোসেফ। কিন্তু কথাটা কাউকে বোলো না, ফাদার টিমোথি যেনো কিছু জানতে না পারেন, জানলে একেবারে যা-তা হয়ে যাবে।"

আমি বুঝতে পারলাম না। ফাদার জন অন্য কোনো লোকের সাথে থাকলে সমস্যা কি? ফাদার টিমোথি তো অনেক লোকের সাথে চার্চে দেখা করেন, আড্ডা মারেন। কনফেশনেও অংশ নেন তিনি।

আজ প্রথমবারের মতো আমি কনফেশন বক্সে।

"হ্যা বৎস, তুমি আমার কাছে কি বলতে এসেছো?" ফাদার টিমোথি বললেন।

"ফাদার, আমি বলছি।"

ফাদার টিমোথি প্রায় লাফ দিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। "তুমি এখানে কি করতে এসেছো, টমাস? আমি কি তোমাকে বলি নি এটা কোনো ঠাট্টার বিষয় নয়?"

"আমি কনফেশ করতে এসেছি, ফাদার। আমি পাপ করেছি।"

"তাই নাকি?" ফাদার টিমোথি একটু নরম হলেন। "কি পাপ করেছো তুমি?

"আমি কি-হোল দিয়ে ফাদার জনের ঘরে উঁকি মেরে দেখেছি। তার অনুমতি ছাড়াই আমি তার কিছু জিনিস দেখে ফেলেছি।"

"ঠিক আছে, বৎস। আমার মনে হয় না আমি এ ব্যাপারে কিছু শুনতে চাই।"

"না ফাদার, আপনাকে শুনতে হবে," বললাম আমি। তারপর ম্যাগাজিন থেকে শুরু করে সব খুলে বললাম ফাদারের কাছে।

সেই রাতে স্টাডি রুমে দু'জন পাদ্রির মধ্যে তুমুল বাকবিতণ্ডা হলো। দরজার কাছ থেকে সবই শুনলাম আমি। খুবই উচ্চস্বরে কথাবার্তা হলো দু'জনের মধ্যে। ফাদার টিমোথি তার কথা শেষ করলেন বিশপের কাছে ফাদার জনের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করার হুমকি দিয়ে। "আমি একজন পাদ্রি," তিনি বললেন, "আর একজন পাদ্রি হিসেবে খুবই গুরু দায়িত্ব পালন করতে হয় আমাকে। আপনি যদি সেটা করতে না পারেন তবে সেমিনারিতে ফিরে যান।"

এক ইংরেজ ব্যাকপ্যাকার সকাল-সকাল দিল্লি থেকে চার্চে এলে ফাদার টিমোথি দেখতে পেলেন এই লোকটাও ইয়র্ক থেকে এসেছে। সুতরাং তিনি তাকে নিজ বাড়িতে কয়েক দিন থাকতে দিলেন। তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন আমাকে। "ইয়ান, টমাসের সাথে পরিচিত হও। সে আমাদের সাথেই এখানে থাকে। টমাস, এ হলো ইয়ান। তুমি কি জানো, সেও আমার এলাকা ইয়র্ক থেকে এসেছে? তুমি তো সব সময় আমার নিজ শহরের কথা জানতে চাও, এখন তুমি তাকেও জিজ্ঞেস করতে পারবে।"

ইয়ানকে আমার বেশ পছন্দ হলো। তার বয়স পনেরো কি ষোলো হবে। সাদা চামড়া, সোনালী চুল আর নীল চোখ তার। সে আমাকে ইয়র্কের ছবি

দেখালো। বড় একটা ক্যাথেড্রাল দেখতে পেলাম আমি। "এটাকে বলে ইয়র্ক মিন্‌স্টার," সে বললো আমাকে। চমৎকার সব বাগান, জাদুঘর আর পার্কের ছবিও দেখালো।

"আপনি কি ফাদার টিমোথির মাকে দেখেছেন? তিনিও ইর্য়কে থাকেন," বললাম তাকে।

"না। তবে এখান থেকে ফিরে গিয়ে তার সাথে দেখা করবো। তার ঠিকানা এখন আমার কাছে আছে।"

"আপনার নিজের মায়ের খবর কি? তিনিও কি ইয়র্কে থাকেন?"

"থাকতেন। তবে দশ বছর আগে মারা গেছেন। এক মোটরসাইকেল আরোহী তাকে চাপা দেয়।" ওয়ালেট থেকে তার মায়ের একটা ছবি বের করলো সে।

"তাহলে আপনি ইন্ডিয়াতে এসেছেন কেন?" বললাম আমি।

"আমার বাবার সাথে দেখা করতে।"

"আপনার বাবা কি করেন?"

ইয়ান একটু ইস্তত করলো। "দেরাদুনের এক ক্যাথলিক স্কুলে তিনি শিক্ষকতা করেন।"

"তাহলে আপনি কেন দেরাদুনে বাবার সাথে থাকছেন না?"

"কারণ আমি ইয়র্কে পড়াশোনা করি।"

"তাহলে আপনার বাবা কেন ইয়র্কে থাকেন না?"

"অনেক কারণ আছে। তবে উনি বছরে তিনবার আমাকে দেখতে ইয়র্কে আসেন। এবার আমি ঠিক করেছি, আমি নিজেই ইন্ডিয়াতে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করবো।"

"আপনি কি আপনার বাবাকে ভালোবাসেন?"

"হ্যা, অনেক।"

"আপনি কি চান আপনার বাবা আপনার সাথে থাকুক?"

"হ্যা, তোমার বাবার খবর কি? তিনি কি করেন?"

"আমার বাবা নেই। আমি বোকাসোকা এতিম এক ছেলে।"

তিন রাত পরে ফাদার টিমোথি ইয়ানের সাথে ডিনার করার জন্যে ফাদার জনকে আমন্ত্রণ জানালেন। তারা রাতে খাওয়া দাওয়া ক'রে আড্ডা মারলো, এমনকি ফাদার টিমোথি বেহালাও বাজালেন। মধ্যরাতে ফাদার জন চলে গেলেও ইয়ান আর ফাদার টিমোথি কথাবার্তা বলতে লাগলো। বিছানায় শুয়ে

শুয়ে খোলা জানালা দিয়ে ভেসে আসা তাদের হাসি আর কথার শব্দ শুনতে পেলাম আমি। রাতে আমার ভালো ঘুম হলো না। পূর্ণিমার রাত, জোরে জোরে বাতাস বইছে। গাছের পাতার মরমর শব্দ। আমার মনে হলো আমি টয়লেটে যাচ্ছি। উঠে বসলাম। বাথরুমে যাবার সময় দেখতে পেলাম ফাদার জনের ঘরে বাতি জ্বলছে। আমি শব্দও শুনতে পেলাম। নিঃশব্দে দরজার কাছে গিয়ে দেখলাম সেটা বন্ধ। তাই কি-হোল দিয়ে তাকালাম ভেতরে। যা দেখলাম সেটা খুবই লোমহর্ষক। ইয়ান টেবিলের উপর উপুড় হয়ে আছে, আর ফাদার জন উপুড় হয়ে আছেন তার উপর। তার পাজামা তার পায়ের নিচে পড়ে আছে। আমি একেবারে হতবিহ্বল হয়ে পড়লাম। বুঝতে পারলাম উল্টাপাল্টা কিছু হচ্ছে। দৌড়ে চলে গেলাম ফাদার টিমোথির ঘরে, তিনি ঘুমাচ্ছেন। "উঠুন ফাদার। ফাদার জন ইয়ানের সাথে খারাপ কাজ করছেন!" চিৎকার করে বললাম আমি।

"কার সাথে? ইয়ানের সাথে?" ফাদার টিমোথি নড়েচড়ে বসলেন। আমরা দু'জনেই ফাদার জনের ঘরের দিকে ছুটলাম। ফাদার টিমোথি হুড়মুড় ক'রে ঘরে ঢুকে পড়লেন। আমি যা দেখেছি তিনিও তাই দেখতে পেলেন। তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো, আমার মনে হলো তিনি বুঝি জ্ঞান হারাবেন। কোনো রকম দরজার হাতলটা ধরে নিজেকে সামলালেন তিনি, তারপর রাগে ক্ষোভে লাল হয়ে গেলো তার মুখ। তাকে এতো বেশি রেগে যেতে কখনও দেখি নি। ভয় পেয়ে গেলাম আমি। "ইয়ান, নিজের ঘরে যাও," ধমকের সুরে বললেন তিনি। "তুমিও টমাস।"

কথামতো তাই করলাম আমি। আর আগের চেয়েও বেশি হতবিহ্বল হলাম বলা চলে। দুটো বিকট শব্দে আমি পরদিন সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। আওয়াজটা এসেছে চার্চ থেকে। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম কিছু একটা হয়েছে। দৌড়ে চার্চে গিয়ে যা দেখলাম তা আমাকে একেবারে ভড়কে দিলো। বেদীর কাছে ফাদার টিমোথি রক্তের স্রোতধারার মাঝে পড়ে আছেন। দেখে মনে হচ্ছে তিনি জিশুর মূর্তির সামনে হাটু মুড়ে প্রার্থনা করছিলেন। তার থেকে দশ ফুট দূরে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে ফাদার জনের দেহ। তার মাথা ফেঁটে কিছুটা মগজও বের হয়ে গেছে। তার গায়ে চামড়ার জ্যাকেট। তার হাতে কালো রঙের সাপের ছবি। ডান হাতে একটা শটগান।

এই দৃশ্যটা দেখে আমার দম বন্ধ হবার জোগার হলো। সুতীব্র এক চিৎকার দিলাম যা কিনা চার্চের শান্ত স্নিগ্ধ সকালটাকে বুলেটের মতোই বিদীর্ণ করলো। কাজ করতে থাকা জোসেফ আমার চিৎকার শুনে ছুটে এলো সঙ্গে সঙ্গে। আর মিসেস গনজালেস বাধ্য হলেন নিজের গোসল পর্বটা সংক্ষিপ্ত করতে। ইয়ানও ঘুম থেকে জেগে দৌড়ে চার্চে ছুটে এলো।

আমি ফাদার টিমোথির পাশে বসে পড়লাম, ইয়ানও আমার পাশে বসে পড়লো যন্ত্রের মতো। ফাদার টিমোথির প্রাণহীন দেহটার দিকে তাকিয়ে কাঁদতে লাগলো সে। আমরা দু'জন হাত ধরে তিন ঘণ্টা ধরে কেঁদে গেলাম। এরই মধ্যে পুলিশের জিপ আর অ্যাম্বুলেন্স এসে মৃতদেহ দুটো ব্যাগে ভরে নিয়ে যাওয়া হলো।

পরে, অনেক পরে ইয়ান আমাকে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি এতো কাঁদলে কেন, টমাস?"

"কারণ আজ থেকে আমি সত্যি সত্যি এতিম হয়ে গেলাম," জবাবে বললাম আমি। "তিনি আমার ফাদার ছিলেন। চার্চে আসা ঐসব লোকদের যেমন ফাদার ছিলেন সেইরকম ফাদার। কিন্তু আপনি কাঁদছেন কেন? ফাদার জনের সাথে যা করেছেন তার জন্যে?"

"না। আমি কাঁদছি কারণ আমিও সব হারিয়েছি। তোমার মতো আমিও এতিম হয়ে গেছি।"

"কিন্তু আপনার বাবা তো বেঁচে আছেন। দেরাদুনে আছেন তিনি," আমি চিৎকার ক'রে বললাম।

"না, সেটা মিথ্যে।" আবারো কাঁদতে লাগলো সে। "এখন আমি সত্যটা বলতে পারবো। টিমোথি ফ্রান্সিস তোমার ফাদার হতে পারেন, কিন্তু তিনি আমার বাবা।"

স্মিতার চোখে মুখে বিষণ্ন একটা অভিব্যক্তি। "কি ট্র্যাজিক গল্প," বললো সে। "একজন পাদ্রি হিসেবে, সঙ্গোপনে বিয়ে করা এবং সন্তানের বাবা হওয়ার মতো দ্বৈত জীবন যাপন করেছেন তিনি। বিস্ময়কর। তো, শেষ পর্যন্ত ইয়ানের কি হলো?"

"আমি জানি না। সে ইংল্যান্ডে ফিরে গেছিলো, মনে হয় তার কোনো চাচা কিংবা মামার কাছে।"

"আর তোমার?"

"আমাকে জুভেনাইল হোমে পাঠিয়ে দেয়া হয়।"

"বুঝেছি। এবার আমাকে দ্বিতীয় প্রশ্নটার ব্যাপারে বলো," স্মিতা রিমোটের 'প্লে' বাটনে চাপ দিয়ে বললো।

কর্মাশিয়াল ব্রেক চলছে। প্রেম কুমার আমার দিকে ঝুঁকে বললো, "পরের প্রশ্ন কি হবে, সেটা তোমাকে বলে দিচ্ছি। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করবো

এফবিআই দিয়ে কি বোঝানো হয়। এই সংস্থাটির নাম জানো?"

"না," আমি মাথা দোলালাম। তার মুখটা তিক্ত হয়ে উঠলো। "জানতাম আমি। দেখো, আমরা চাই তুমি অন্তত কিছু টাকা জিতে এখান থেকে চলে যাও। আমি প্রশ্নটা বদলে দিতে পারি। এবার আমাকে বলো, অন্য কোনো সংক্ষিপ্ত নাম কি তুমি জানো?"

জবাব দেবার আগে একটু ভেবে নিলাম। "আমি এফ.বি.আই সম্পর্কে কিছু জানি না। তবে INRI-র অর্থ জানি।"

"এটা আবার কি?"

"ক্রুশের উপরে এটা লেখা থাকে।"

"আচ্ছা! ঠিক আছে, আমাকে আমার ডাটা ব্যাংক চেক ক'রে দেখতে দাও।"

কমার্শিয়াল ব্রেক শেষ হয়ে গেলো। আমার দিকে তাকালো প্রেম কুমার। "আমি বেশ কৌতুহলী হয়ে উঠেছি, মিঃ রাম মোহাম্মদ টমাস। তোমার ধর্মের ব্যাপারে বলছিলাম আর কি। তোমার নামে তো দেখছি সব ধর্মের নামই রয়েছে। আমাকে বলো প্রার্থনা করতে কোথায় যাও তুমি?"

"প্রার্থনা করতে হলে কি কাউকে মন্দির, মসজিদ, গীর্জায় যেতেই হয়? কবির যা বলেছেন সেটাই আমি বিশ্বাস করি। হরি হলো পূর্ব, আল্লাহ হলো পশ্চিম। তোমার মনের দিকে দ্যাখো, সেখানে তুমি পাবে দু'জনকেই, রাম এবং রহিম।"

"খুব ভালো বলেছো, মিঃ টমাস। দেখে মনে হচ্ছে সব ধর্মেই তোমার ভালো জ্ঞান রয়েছে। সেটাই যদি সত্য হয় তবে পরের প্রশ্নটা তোমার কাছে সহজই হবে। তাহলে এবার পরের প্রশ্নে যাচ্ছি। প্রশ্ন নাম্বার দুই, দুই হাজার রুপির জন্যে। ক্রুশের উপরে যে লেখাটা থাকে, সেটা কি? এটা কি এ) IRNI, বি) INRI, সি) RINI নাকি ডি) NIRI? প্রশ্নটা কি বুঝতে পেরেছো, মিঃ টমাস?"

"হ্যা", জবাবে বললাম আমি।

"ঠিক আছে, তাহলে বলো।"

"বি। INRI।"

"তুমি কি একদম নিশ্চিত?"

"হ্যা।"

ড্রামের শব্দ শোনা গেলো। জবাব সঠিক হবার বাতিটা জ্বলে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে।

"একদম ঠিক! তুমি দু'হাজার রুপি জিতে গেছো।"

"আমেন," বললাম আমি।

এক ভায়ের প্রতীজ্ঞা

কোনো সিদ্ধান্ত নেবার আগে সব দিক বিবেচনা ক'রে নেবেন। অবশ্য জরুরি ব্যাপার হলে ভিন্ন কথা। নতুন প্রতিবেশীরা সৌভাগ্য বয়ে আনবে। বাড়িতে হয়তো ছোটোখাটো কোনো সমস্যার উদয় হবে, কিন্তু আপনি সেটা দ্রুত এবং সঠিকভাবেই সমাধা করবেন। কোনো বিষয়ে কাউকে যেচে উপদেশ দেবেন না।

আমার মতো যারা মকর রাশির তাদেরকে এই উপদেশই দিয়েছে মহারাষ্ট্রের *টাইম* পত্রিকার জ্যোতিষ বিভাগ।

আমি *মহারাষ্ট্র টাইম* পড়ি না। সত্যি বলতে কি, আমি কোনো পত্রিকাই পড়ি না। তবে মিঃ ব্রেভের ময়লা ফেলার বাস্কেট থেকে মাঝে মাঝে পুরনো কোনো সংখ্যা নিয়ে দেখতাম। রান্নার চুলার কাজে ব্যবহারে বেশ কাজে দিতো সেগুলো। আর যখন কোনো কিছু করার থাকতো না, পত্রিকাগুলোর পাতা উল্টাতাম।

আমি অবশ্য জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশ্বাস করি না। যদি করতাম তবে পণ্ডিত রামশংকর শাস্ত্রির ভবিষ্যৎ অনুযায়ী এরই মধ্যে মারা যেতাম আমি। কিন্তু আজকের জ্যোতিষ বিভাগের কথাটা আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সত্য হিসেবেই আবির্ভূত হলো। পাশের ঘরে এসে উঠছে নতুন প্রতিবেশীরা আর অবশ্যই গৃহস্থালীতে একটা সমস্যারও উদ্ভব হয়েছে।

রিগ্যাল টকিজ থেকে আমরা ম্যাটিনি শো দেখে ফিরেছি মাত্র, সেলিম রাগে ফুসছে। তিন বছর ধরে আরমান আলীর যেসব পোস্টার টাঙানো ছিলো সেগুলো সে ছিঁড়ে ফেলছে। সবগুলো ছিঁড়ে ফেলার পর আমাদের ঘরটা একেবারে নগ্ন বলেই মনে হচ্ছে।

জ্যোতিষের ভবিষ্যৎবাণী সত্ত্বেও আমি সেলিমকে একটা উপদেশ না দিয়ে পারলাম না। "দশ মাস আগে তোকে আমি যে কথাটা বলেছিলাম এবার তো

বুঝতে পারছিস। ঐ যে, যখন তুই আরমান আর উর্বশীর সম্পর্ক জোড়া লাগানোর চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলি? বলেছিলাম অন্যের ব্যাপারে নিজের নাক না গলাতে, অন্যের সমস্যা নিজের কাঁধে না তুলে নিতে। মনে রাখিস, ভবিষ্যতে এটা তোর জন্যে একটা শিক্ষা হয়ে গেলো।"

সেলিম চুপচাপ আমার কথা শুনে গেলো।

ঘরের বাইরে আমি পায়ের আওয়াজ আর মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। মনে হলো নতুন ভাড়াটিয়ারা বুঝি আমাদের ঘরেই উঠতে যাচ্ছে। আমি খুবই উত্তেজিত বোধ করলাম। আশা করলাম নতুন ভাড়াটিয়াদের আমার বয়সী কোনো ছেলে থাকবে। পুতুল এবং ধ্যানেশ খুব ভালো সঙ্গী হলেও তারা তাদের মা বাবার কাছ থেকে খুব কম রোববারেই আমাদের সাথে খেলার অনুমতি পায়। ঐ একটা দিনই আমি কোনো কাজ করি না। অজয় নামের ছেলেটা আমাকে সারাক্ষণ ক্ষ্যাপায়। তাকে যখন বললাম আমি একটা ভাট্টিখানায় কাজ নিয়েছি তখন সে পুরো বস্তির সামনে আমাকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করেছে। আমি জানি ভাট্টিখানায় কাজ করাটা কোনো ফিল্মস্টারের সাথে কাজ করার মতো ব্যাপার নয়, কিন্তু রাস্তার পাশে বসে থাকার চেয়ে তো এটা উত্তম।

অভিনেত্রী নিলীমা কুমারির বাড়িতে কাজ করার সময় আমি তার ফ্ল্যাটেই থাকতাম, এরপর সেই কাজ যখন ছেড়ে দিলাম তখন *চাউল* নামের বস্তিতুল্য ঝুপরি ঘরে থাকার কথা ভুলেই গেছিলাম। একসাথে গাঁদা গাদি করে গড়ে ওঠা অনেকগুলো ঘরের আস্তানা। এই সব বস্তিতুল্য চাউলগুলো মুম্বাই শহরের গন্ধযুক্ত বগলতলা। এখানে যারা থাকে তারা কেবল ধারাবি বস্তির চেয়ে একটু ভালো জায়গায় থাকে এই হলো সান্ত্বনা। মিঃ ব্রেভ আমাকে একবার বলেছেন, বড়লোকেরা মার্বেল-গ্রানাইটের প্রাসাদ আর ফ্ল্যাটে থাকে। তারা জীবনটা উপভোগ করে। আর বস্তির ঘুপচিতে যেসব গরীব থাকে তারা ধুকে ধুকে মরে। কিন্তু আমরা যারা চাউলে থাকি তারা নিতান্তই কোনোভাবে বেঁচে বর্তে থাকি।

চাউলে থাকার বিশেষ সুবিধা আছে। নিলীমা কুমারির যা ঘটেছে এখানে থাকলে তার জীবনে সেটা ঘটতো না। কারণ এখানে সবাই সবার কথা জানে। কি হচ্ছে সবই জানা থাকে। এখানকার বাসিন্দাদের সবারই মাথায় যেনো একটা ছাদ। এক বাথরুমেই সবাই গোসল করে, এক পায়খানাতেই সবাই ঢাগা-মুতা করে। চাউলে যারা থাকে তারা হয়তো সামাজিক কোনো অনুষ্ঠানে

মিলিত হয় না, কিন্তু পায়খানায় যাবার জন্যে যে লাইন থাকে সেখানে সবার সাথে সবার দেখা হয়। গুজব আছে যে, মিঃ গোখলে আর মিসেস গোখলের পরিচয় এবং প্রেম নাকি পায়খানার জন্যে লাইনে দাঁড়াতে গিয়েই হয়েছিলো। এক মাসের মধ্যে তারা বিয়ে করে ফেলে।

তবে এখানকার কোনো মেয়ের সাথে আমার প্রেমে পড়ার কেনো সুযোগ নেই। তারা সবাই মোটাসোটা আর কুৎসিত, আমার প্রিয় নায়িকা প্রিয়া কাপুরের ধারে কাছেও নয় তারা। তাছাড়া তারা সবাই আজেবাজে পুতুল খেলায় ব্যস্ত থাকে, ভদ্র কোনো খেলা, যেমন বক্সিং কিংবা কাবাডি খেলতে জানে না। সারা দিন আমি ভাট্টিখানায় কাজ করে সন্ধ্যা ছ'টায় ফিরে আসি। লোহা গলানো খুবই কঠিন কাজ। গলিত লোহা থেকে যে উত্তাপ নির্গত হয় সেটা চোখে খুব লাগে।

"টমাস!" একটা কণ্ঠ শুনতে পেলাম আমি। এই চাউলের হতাকর্তা মিঃ রামকৃষ্ণা আমাকে ডাকছেন। তিনি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। কোনো সমস্যায় পড়লেই আমরা তার কাছে যাই। অনুনয় বিনয় করে আমাদের দাবি আদায় করি।

ঘরের বাইরে এসে দেখি মিঃ রামকৃষ্ণা বেটে খাটো মধ্যবয়সী এক লোককে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার চোখ মুখ দেখে মনে হলো অনেকক্ষণ ধরে হাগামুতা বন্ধ রেখেছে সে। "টমাস, এ হলো মিঃ শান্তারাম। তিনি আমাদের নতুন ভাড়াটিয়া। তোমার পাশের ঘরেই থাকবেন। আমি মিঃ শান্তারামকে বলেছি তুমি খুবই দায়িত্ববান ছেলে। সুতরাং তাকে, তার বউ আর তার মেয়েকে গোছগাছ করতে সাহায্য করো। ঠিক আছে মিঃ শান্তারাম, এবার আমি আসি।"

"না," আমি মনে মনে বললাম। "কোনো ছেলে নেই।" আমি তার স্ত্রী আর মেয়েকে দেখার চেষ্টা করলাম, কিন্তু এক ঝলকই দেখতে পেলাম। মহিলার ধূসর চুল আর মেয়েটির লম্বা কালো চুলের কিছু অংশ, তবে মেয়েটা বয়সে আমার চেয়ে একটু বড়। বিছানায় বসে আছে সে। শান্তারাম যখন বুঝতে পারলো আমি তার ঘরের দিকে উঁকি মারছি, সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ ক'রে দিলো সে।

"আপনি কি করেন?" শান্তারামকে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"আমি একজন বিজ্ঞানী। জ্যোর্তিবিদ। তুমি বুঝবে না। তবে আজকাল একটু ছুটিতে আছি। জ্যোর্তিবিজ্ঞান নিয়ে কাজ করছি না। এখন বিমল শোরুমে সেল্‌স ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত আছি। এখানে এসেছি খুবই অল্পসময় থাকার জন্যে। অস্থায়ী ব্যবস্থা আর কি। খুব জলদি নরিমান পয়েন্টে একটা ডিলাক্স অ্যাপার্টমেন্টে উঠবো আমরা।"

আমি জানি মিঃ শান্তারাম মিথ্যে বলছে। যারা নরিমান পয়েন্টে থাকার মতো সক্ষমতা রাখে তারা এরকম চাউলে কখনই থাকতে আসবে না, এমনকি অস্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবেও না।

চাউলের এক একটি ঘর থেকে অন্য ঘরের মাঝখানে যে দেয়াল থাকে সেগুলো খুবই পাতলা হয়। সেই দেয়ালে কান পাতলে কিংবা কোনো খালি গ্লাস ঠেসে ধরে কান রাখলে ওপাশের ঘরের সব কথাই শোনা যায় স্পষ্ট। সেলিম আর আমি আমাদের বাম দিককার ঘরে থাকা মিঃ এবং মিসেস বাপাটের সব কথা প্রায়ই এভাবে শুনে থাকি। মিঃ এবং মিসেস বাপাট মোটেও কোনো তরুণ দম্পতি নয়। গুজব আছে মিঃ বাপাট মিসেস বাপাটকে মারধোর করে, তবে রাতের বেলায় তারা সব মিটিয়ে ফেলে। সেলিম আর আমি তখন ভারি নিঃশ্বাস এবং 'উহ্' 'আহ্' শব্দে শুনতে পাই। এসব শুনে আমরা মুখচাপা দিয়ে হাসি।

পাশের ঘরে থাকা মিঃ শান্তারামের কথাবার্তা শোনার জন্যে দেয়ালে একটা স্টেইনলেস স্টিলের গ্লাস রাখলাম আমি। শুনতে পেলাম শান্তারামের কথাবার্তা। "এই জায়গাটা একটা ব্লাকহোল ছাড়া আর কিছু না। এখানে থাকাটা আমার জন্যে অসম্মানজনক কিন্তু তোমাদের দু'জনের কারণে আমি ভালো একটা চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত এটা সহ্য করে যাবো। শোনো, আমি চাই না ঐসব রাস্তার ছেলেরা যেনো আমার ঘরে ঢোকে। ঈশ্বরই জানে, হারামজাদাগুলো কতো ভয়ংকর। ও রকম দু'জন আমাদের ঠিক পাশের ঘরেই থাকে। এক্কেবারে বদমাশ যাকে বলে। আর গুড়িয়া, শোনো, তোমাকে যদি আমি ঐসব ছেলেদের সাথে কখনও কথাবার্তা বলতে দেখি তো আমার বেল্টের মার খাওয়া থেকে কেউ তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। বুঝেছো?" গর্জন ক'রে বললেন তিনি। ভয়ে আমার হাত থেকে গ্লাসটা পড়ে গেলো।

পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ আমি মিঃ শান্তারামকে খুব একটা দেখলাম না। আর তার স্ত্রী এবং মেয়েকে তো একদমই দেখতে পেলাম না। মেয়েটা হয়তো প্রতিদিন কলেজে যায়। তবে আমি ভাট্টিখানা থেকে আসার আগেই সে বাড়ি ফিরে ঘরে ঢুকে পড়ে। তাদের দরজাটা সব সময়ই বন্ধ থাকে।

আমাদের যে একজন নতুন প্রতিবেশী এসেছে সেটা সেলিম খেয়ালই করছে না। একজন টিফিন ডেলিভারি বয় হিসেবে অবসর সময় বলতে গেলে সে খুব একটা পায় না। সকাল সাতটা বাজে ঘুম থেকে উঠে জামাকাপড় পরে। ঢিলেঢালা সাদা একটা শার্ট, কটনের পায়জামা আর মাথায় সাদা রঙের

নেহেরু টুপি পরে সে। এই টুপিটাই মুম্বাইর সব ডাব্বাওয়ালার আইডেন্টিটি কার্ড। পাঁচ হাজারের মতো ডাব্বাওয়ালা আছে পুরো মুম্বাইয়ে। পরবর্তী দুই ঘণ্টার মধ্যে কমপক্ষে পঁচিশটি ফ্ল্যাট থেকে সে ঘরের তৈরি খাবারের টিফিন বক্স সংগ্রহ করে ঘাটকোপারের লোকাল ট্রেন স্টেশনে চলে যাবে। সেখানে গন্তব্য অনুযায়ী টিফিনগুলো বাছাই করা হয়। প্রত্যেকটাতেই রঙ দিয়ে ডট দেয়া থাকে কোড হিসেবে। তারপর স্পেশাল ট্রেনে ক'রে সেগুলো লাঞ্চ টাইমের সময় মধ্যবিত্তে কর্মচারীদের কাছে পৌছে দেয়া হবে। সেলিমও আরেকটা ট্রেন থেকে টিফিন বক্স সংগ্রহ ক'রে ঘাটকোপার এলাকায় বিতরণ করবে। তাকে খুব সতর্ক থাকতে হয়। একটা ভুল হলেই তার চাকরি চলে যেতে পারে। কোনো হিন্দুকে ভুলক্রমেও গরুর মাংস আর কোনো মুসলমানকে শূকরের মাংস দেবার কথা সে ভাবতে পারে না।

রাত ন'টা বাজে সেলিম একটা ফিল্ম ম্যাগাজিনের পাতা উল্টাচ্ছে। আমি স্টিলের কাপ দেয়ালে লাগিয়ে শান্তারামের ঘরের কথাবার্তা শুনে যাচ্ছি এক মনে। "এই যে, গুড়িয়া, আইপিসের দিকে চোখ রেখে দ্যাখো। আমি টেলিস্কোপটা অ্যাডজাস্ট ক'রে দিয়েছি। মাঝখানে কি লাল রঙের কিছু দেখতে পাচ্ছো? ওটা হলো মঙ্গল।"

আমি সেলিমের উদ্দেশ্যে বললাম, "জলদি একটা কাপ নিয়ে দেয়ালে লাগিয়ে শোন্। তোর এটা শুনতে হবেই।"

সেলিমও আমার সাথে যোগ দিলো। পরবর্তী ত্রিশ মিনিট ধরে আমরা আকাশের নক্ষত্র সম্পর্কিত কমেন্ট্রি শুনে চললাম। আমরা মান মন্দির, গ্যালাক্সি আর ধূমকেতু সম্পর্কে অনেক কথা শুনলাম। ছোটো ভাল্লুক বড় ভাল্লুক সম্পর্কেও জানালাম। শনির বলয় আর বৃহস্পতির চাঁদ সম্পর্কেও অবহিত হলাম সেই সাথে।

শান্তারামের কথা শুনে অদ্ভুত এক ঘোরে চলে গেলাম আমি। আমারও যদি বাবা থাকতো তবে তিনিও আমাকে নক্ষত্র মণ্ডলী সম্পর্কে শেখাতেন। রাতের যে আকাশ আমার কাছে বিশাল কালো রঙের আখড়া হিসেবে ছিলো সেটা আচমকাই বদলে গিয়ে বেশ অর্থপূর্ণ হয়ে উঠলো। বিস্ময়ের আঁধার হয়ে গেলো সেটা। শান্তারামের টিউটোরিয়াল শেষ হতেই সেলিম আর আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে সদ্য অবহিত হওয়া বিভিন্ন তারার অবস্থান খুঁজতে শুরু ক'রে দিলাম। কোনো টেলিস্কোপ না থাকায় আমরা কেবল ছোটো ছোটো সাদা বিন্দু দেখতে পেলাম আকাশে। তবে আকাশে সপ্তর্ষি মণ্ডল আবিষ্কার করে আমরা বেশ পুলকিত হলাম। আরো অবাক হলাম এটা জেনে যে, চাঁদের গায়ে কালো দাগগুলো কোনো কলঙ্কের চিহ্ন নয়, ওগুলো চাঁদের

খাদ আর গিরিখাদ। আমরা মহাবিশ্বের রহস্য ভেদ ক'রে ফেলেছি এরকম এক সন্তুষ্টিতে ভুগতে লাগলাম।

সেই রাতে সাদা শাড়ি পরা কোনো মহিলাকে স্বপ্নে দেখলাম না আমি। তার বদলে শনির বলয় আর বৃহস্পতির চাঁদ দেখলাম।

এক সপ্তাহ পরে, শান্তারামের ঘর থেকে একেবারে ভিন্ন ধরনের শব্দ শুনতে পেয়ে আমি সতর্ক হয়ে উঠলাম। "মিউ!"

স্টিলের কাপটা দেয়ালে লাগিয়ে কান পাতলাম আমি।

গুড়িয়ার কথা শুনতে পেলাম। "বাবা, দ্যাখো আমার একটা বেড়াল আছে। খুব সুন্দর না? আমার বান্ধবী রোহিনী তার বেড়াল ছানা থেকে আমাকে এটা দিয়েছে। ওকে কি আমি রাখতে পারি?"

"আমি কোনো প্রাণী পোষার পক্ষে নই," মিসেস শান্তারাম বললেন। "এখানে মানুষেরই থাকার জায়গা নেই—এই জন্তু জানোয়ার থাকবে কোথায়?"

"প্লিজ মা, এতো ছোট্ট একটা প্রাণী। বাবা, প্লিজ রাজি হও," সে অনুনয় করলো।

"ঠিক আছে গুড়িয়া," বললেন শান্তারাম। "ওকে তুমি রাখতে পারো কিন্তু কি নামে ডাকবে তাকে?"

"ওহ্, ধন্যবাদ বাবা তোমাকে। আমি ভাবছি তাকে টমি বলে ডাকবো।"

"না, এটা তো খুবই কমন নাম হয়ে গেলো। এই বেড়ালটা একজন জ্যোর্তিবিদের বাড়িতে থাকবে। সুতরাং একটা গ্রহের নামেই তার নাম হওয়া উচিত।"

"তাহলে কি রাখবে? জুপিটার?"

"না। সে তো এই পরিবারের সবচাইতে ছোটো সদস্য। সেজন্যে তাকে প্লুটো নামেই ডাকা হোক।"

"দারুণ, নামটি আমার পছন্দ হয়েছে। এই যে প্লুটো! আসো, তোমাকে দুধ খাওয়াই।"

"মিউ!" বললো প্লুটো।

এই ছোট্ট ঘটনাটি আমাকে মিঃ শান্তারাম সম্পর্কে পুণরায় বিবেচনা করতে বাধ্য করলো। সম্ভবত সে লোক হিসেবে অতোটা খারাপ নয়। তবে আরেকবার আমি শিখলাম বেশভূষা ধোকা দিতে পারে, আর ভালো মন্দের মাঝখানে যে

বিভেদ রেখাটি আছে সেটা খুবই ক্ষীণ।

শান্তারামকে একরাতে বাসায় ফিরতে দেখলাম আমি; একেবারে মাতাল অবস্থায়। তার মুখ দিয়ে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। টলতে টলতে হাটছে সে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গেলে কারো সাহায্য লাগবে। এরকমটি ঘটলো পরপর দু'দিন। খুব জলদিই পুরো এলাকায় চাউড় হয়ে গেলো যে, মিঃ শান্তারাম একজন বদ্ধ মাতাল।

হিন্দি ছবিতে মাতালেরা সবসময়ই হাস্যকর। কেষ্ট মুখার্জিকে হাতে বোতলসহ দেখলে আপনি না হেসে পারবেন না। তবে বাস্তব জীবনে মাতালেরা হাস্যকর হয় না। তাদের জীবন খুব একটা মজার বিষয় নয়। তারা হয় মারাত্মক ভীতিকর। শান্তারাম মদ খেয়ে বাসায় ফিরলে আমাদেরকে আর কষ্ট ক'রে দেয়ালে গ্লাস লাগাতে হোতো না। তার কণ্ঠ সপ্তমে চড়ে যেতো তখন, এতোটাই ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করতো যে, সেলিম আর আমার কাছে মনে হোতো শান্তারাম বোধহয় আমাদেরকেই ধমকাচ্ছে। তবে আমরাও তার এসব কর্মকাণ্ডে অভ্যস্ত হয়ে পড়লাম।

আমরা ভাবতাম এটা হলো মধ্যবর্তী একটা অধ্যায় যা শান্তারাম খুব জলদিই কাটিয়ে উঠতে পারবে। কিন্তু কার্যত দেখা গেলো পরিস্থিতি আরো খারাপ হতে শুরু করলো। তার মদ খাওয়ার পরিমাণও গেলো বেড়ে। ছুড়তে শুরু করলো ঘরের জিনিসপত্র। প্লাস্টিক কাপ আর বই দিয়েই এটার শুরু, শেষ পর্যন্ত জিনিসপত্র ভাঙচুরে গড়ালো। আমরা জানতাম মিঃ রামকৃষ্ণার কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ করে কোনো লাভ নেই। তেরো আর এগারো বছরের কোনো বাচ্চা ছেলের অভিযোগ কেউ পাত্তা দেবে না। সুতরাং আমরা তার এই উৎপাত সহ্য ক'রে গেলাম। তবে এই অধ্যায়টিও বেশি দিন টিকে থাকলো না। অচিরেই শান্তারাম লোকজনের দিকে জিনিসপত্র মারতে আরম্ভ করলো। প্রধানত তার পরিবারের লোকজনের উপরেই। তার স্ত্রীর প্রতি বরাদ্দ ছিলো সর্বোচ্চ। "কুত্তির বাচ্চা! তুই আমার জীবনটাকে নষ্ট করেছিস। আমি ব্লাকহোল নিয়ে গবেষণা করতে পারতাম, লেখালেখি করতে পারতাম, তার বদলে কিনা এখন লোকজনকে শাড়ি-ব্লাউজ দেখিয়ে যাচ্ছি। তোরে আমি ঘৃণা করি। তুই মরছিস না কেন?" তারপর তার দিকে ছুড়ে মারা হলো এক গাদা গৃহস্থালী জিনিসপত্র। তার মেয়ে আর পোষা বেড়ালটাও এই আক্রমণ থেকে রেহাই পেলো না।

একরাতে সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করে ফেললো সে। স্ত্রীর উপর ছুড়ে মারলো গরম চা। গুড়িয়া মাকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলে কাপের গরম চা তার শরীরে গিয়ে পড়লে তার মুখের অনেকাংশ পুড়ে গেলো। যন্ত্রণায় চিৎকার ক'রে

উঠলো সে। শান্তারাম এতোটাই মাতাল যে কী করেছে সে ব্যাপারে তার কোনো ধারণাই নেই। আমি দৌড়ে গিয়ে মিসেস শান্তারামের জন্যে একটা ট্যাক্সি এনে দিলাম যাতে গুড়িয়াকে নিয়ে হাসপাতালে যেতে পারেন তিনি। দু'দিন পর তিনি আমার কাছে এসে বললেন আমি গুড়িয়াকে হাসপাতালে দেখতে যাবো কিনা। "মেয়েটা খুব একা হয়ে পড়েছে। হয়তো তুমি গেলে তোমার সাথে কথা বলতে পারবে।"

সুতরাং আমি আমার জীবনে প্রথমবারের মতো হাসপাতালে গেলাম।

হাসপাতালে ঢুকলে প্রথম যে জিনিসটা টের পাওয়া যায় সেটা হলো গন্ধ। হাসপাতালের অ্যান্টিসেপটিক ঔষুধের গন্ধে আমার বমি বমি ভাব হলো। দ্বিতীয় জিনিসটা হলো, আপনি সেখানে কোনো হাসি খুশি মুখ দেখতে পাবেন না। তবে সবচাইতে বাজে জিনিস হলো বিকারহীন ব্যাপারটা। কেউ আপনাকে নিয়ে মাথা ঘামাবে না। আমি ভেবেছিলাম গুড়িয়ার চারপাশে ডাক্তার আর নার্সেরা জড়ো হয়ে থাকবে। কিন্তু বার্ন ইউনিটের বেডে তাকে সম্পূর্ণ একা শুয়ে থাকতে দেখলাম। তার পুরো মুখ ব্যান্ডেজে ঢাকা। কেবল দু'চোখই দেখা যাচ্ছে।

"গুড়িয়া, দ্যাখো কে এসেছে তোমাকে দেখতে," মিসেস শান্তারাম বললেন।

মেয়েটার কাছে এগিয়ে যেতে আমার খুব সংকোচ হচ্ছিলো, কেননা সে আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। খুব একটা চিনিও না তাকে। তার ঠোঁট জোড়া দেখতে না পেলেও চোখ দুটো দেখে বুঝতে পারলাম সে হাসছে। এতে ক'রে আমার সমস্ত দ্বিধা চলে গেলো। দু'জনের মধ্যে যে জড়তা ছিলো সেটাও উধাও হয়ে গেলো এক নিমেষে। তার পাশে বসে তিন ঘণ্টা ধরে এই নিয়ে সেই নিয়ে কথা বললাম। গুড়িয়া আমাকে জিজ্ঞেস করলো, "এ রকম আজব নাম কোথায় পেলে তুমি?—রাম মোহাম্মদ টমাস?"

"লম্বা এক কাহিনী। তুমি সুস্থ হয়ে উঠলে সব বলবো তোমাকে।"

সে আমাকে তার কথা বললো। জানতে পারলাম সে ইন্টারমিডিয়েট পাশ ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে যাচ্ছে। তার লক্ষ্য একজন ডাক্তার হওয়া। আমার সম্পর্কে জানতে চাইলো সে। আমি ফাদার টিমোথি এবং এরপর কি হয়েছে সেসব বললাম না। তবে চাউলে আমার অভিজ্ঞতার কথা জানালাম তাকে। ভাট্টিখানায় কাজ করার ব্যাপারেও বললাম বিস্তারিত। আমার কথাগুলো সে বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনলো, এতে ক'রে আমার মনে হলো আমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। হেলাফেলার কেউ না।

ডাক্তার এসে মিসেস শান্তারামকে বললো যে, তার মেয়ের ভাগ্য খুব ভালো। তার কেবলমাত্র ফার্স্ট ডিগ্‌ বার্ন হয়েছে। ফলে মুখে কোনো স্থায়ী দাগ থাকবে না। এক সপ্তাহের মধ্যে তাকে ছেড়ে দেয়া হবে।

গুড়িয়ার সাথে তিনঘণ্টা কথা বলার পর আমি তার বাবা সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারলাম। মিসেস শান্তারাম আমাকে বললেন, "আমার স্বামী একজন বিখ্যাত মহাকাশ বিজ্ঞানী। আর্যভট্ট স্পেস রিসার্চ ইন্সটিটিউটে কাজ করতেন। বিশাল টেলিস্কোপ দিয়ে নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করতেন তিনি। ইন্সটিটিউটের বিশাল কম্পাউন্ডে আমরা থাকতাম। তিন বছর আগে তিনি নতুন একটা নক্ষত্র আবিষ্কার করেছিলেন। ওটা ছিলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার, কিন্তু তার এক সহকর্মী জ্যোর্তিবিদ সেই কৃতিত্বটা নিয়ে নেয়। এটাই আমার স্বামীকে একেবারে শেষ ক'রে দিয়েছে। মদ খেতে শুরু করেন তিনি। নিজের কলিগদের সাথে মারামারিও করতে আরম্ভ ক'রে দেন। একদিন স্বয়ং ডাইরেক্টরের সাথে বাকবিতণ্ডার এক পর্যায়ে তাকে পিটিয়ে প্রায় মেরেই ফেলতে যাচ্ছিলেন। তাকে চাকরিচ্যুত করা হয় সঙ্গে সঙ্গে। আমি ডাইরেক্টরের কাছে গিয়ে মাফটাফ চেয়ে তাকে যেনো পুলিশ দিয়ে গ্রেফতার করা না হয় অনুরোধ জানাই। ঐ চাকরির পর ভালো একটা স্কুলে পদার্থ বিজ্ঞানের শিক্ষকের চাকরি জুটিয়ে নেন আমার স্বামী। কিন্তু অতিরিক্ত মাতলামীর কারণে স্কুলের ছেলে-মেয়েদের প্রতি সামান্য কারণেই সহিংস হয়ে উঠতেন। মারধোর করতেন অমানুষিকভাবে। ছয় মাসের মাথায় তাকে সেখান থেকেও বরখাস্ত করা হয়। এরপর থেকে তিনি ছোটোখাটো কাজ করতে শুরু করেন। অফিসের ক্যান্টিন ম্যানেজার, কোনো ফ্যাক্টরির একাউন্টেন্ট আর এখন কাপড়ের দোকানে সেল্‌স সহকারী। যেহেতু আমাদের সমস্ত সঞ্চয় ফুরিয়ে গেছে তাই এই চাউলে এসে উঠেছি।"

"মিঃ শান্তারাম কি মদ খাওয়া বন্ধ করতে পারেন না?" তাকে বললাম আমি।

"আমার স্বামী কসম খেয়ে বলেন আর কখনও এলকোহল ছুঁয়েও দেখবেন না। কিন্তু আমার সমস্ত আশা ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে তিনি মদ খাওয়া শুরু করেন।"

"আমার একটা উপকার করো রাম মোহাম্মদ টমাস," গুড়িয়া বললো। "বাড়ি ফেরার আগ পর্যন্ত প্লুটোকে তুমি দেখাশোনা করবে।"

"অবশ্যই করবো," কথা দিলাম তাকে। আচম্‌কা সে তার হাত বাড়িয়ে আমার হাতটা ধরলো। "তুমি আমার ভাই। আমার তো আপন কোনো ভাই নেই। তুমি হলে আমার সেই ভাই। মা, ঠিক বলেছি না?"

মিসেস শান্তারাম সায় দিয়ে মাথা দোলালেন।

আমি বুঝতে পারলাম না কী বলবো। এটা আমার জন্যে নতুন একটা সম্পর্ক। এর আগে আমি আমার মায়ের কথা কল্পনা করতাম, কিন্তু কখনই বোনের কথা ভাবি নি। সুতরাং আমি গুড়িয়ার হাত ধরে এক ধরণের অবোধ্য আর অকথিত সম্পর্কের আঁচ টের পেলাম। সেই রাতে আমি সাদা শাড়ি পরা বাচ্চা হাতে মহিলাকে স্বপ্নে দেখলাম। একটা লন্ড্রির বিনে বাচ্চাটা রেখে তিনি চলে গেলেন। ঠিক তারপরই এক মেয়ে এলো। এই মেয়েটিও লম্বা অভিজাতপূর্ণ, তবে তার সারা মুখে ব্যান্ডেজ বাধা। বাচ্চাটাকে বিন থেকে তুলে মেয়েটি পরম আদরে চুমু খেতে লাগলো। "আমার ছোট্ট সোনা ভাই," সে বললো আদর করতে করতে। "আপা," বাচ্চাটা জবাবে বললো। "মিউ!" আচম্‌কা একটা বেড়ালের তীক্ষ্ণ শব্দ রাতের নিস্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করলো যেনো। ঘুম থেকে উঠে আমি খুঁজতে লাগলাম শব্দটা কোত্থেকে এসেছে।

পরের দিন সকালে আমি প্লুটোর দোমড়ানো মোচড়ানো দেহটা খুঁজে পেলাম যেখানে মিসেস ব্রেভ *মহারাষ্ট্র টাইম* পত্রিকা ফেলে দেন। বিড়ালটার ঘাড় মটকানো। তার লোমশ শরীর থেকে আমি হুইস্কির গন্ধ পেলাম। শান্তারাম তার বউকে বললো প্লুটো পালিয়েছে। সত্যটা আমি জানলেও সেটা বলা অর্থহীন। প্লুটো তো আসলেই পালিয়েছে। আমার ধারণা অন্য এক জগতে সে পালিয়ে গেছে, যে জগতটা এখানকার চেয়ে অনেক ভালো।

"আমি গুড়িয়াকে খুব পছন্দ করি," সেলিমকে বললাম। "শান্তারাম যেনো তার আর কোনো ক্ষতি করতে না পারে সে ব্যবস্থা আমাকে করতে হবে।"

"কিন্তু তুই করবি কি? ওটা তো তার নিজের পরিবার।"

"এটা আমাদেরও ব্যাপার। হাজার হোক আমরা কিন্তু প্রতিবেশী।"

"তুই কি ভুলে গেছিস আমাকে এক দিন কি বলেছিলি? অন্যের ব্যাপারে নাক না গলাতে, অন্যের সমস্যা নিজের কাঁধে তুলে না নিতে। মনে আছে মোহাম্মদ?"

এ কথার কোনো জবাব নেই আমার কাছে।

গুড়িয়া বাড়িতে ফিরে এলেও আমি তাকে দেখতে গেলাম না কারণ শান্তারাম কোনো ছেলেকে তার ঘরে ঢুকতে দেবে না। মিসেস শান্তারাম আমাকে জানালেন তার স্বামীর নাকি বোধোদয় ঘটেছে। নিজেকে শুধরে নেবার আপ্রাণ চেষ্টা করবে সে। যদিও তিনি মনে করেন শান্তারাম শোধরানোর অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

গুড়িয়া বাড়ি ফেরার এক সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে শান্তারাম আবারো তার সাথে উল্টাপাল্টা কিছু ক'রে বসলো। সে তার নিজের মেয়েকে স্পর্শ করার চেষ্টা করলো তবে সেটা বাবা হিসেবে নয়। প্রথমে আমি বুঝতে পারি নি। কেবল শুনলাম শান্তারাম তার মেয়েকে বলছে সে তার আকাশের চাঁদ এরপরই মিসেস শান্তারামের চিৎকার। গুড়িয়ার আর্তনাদ, "বাবা, আমাকে ছোঁবে না! বাবা, তোমার দোহাই লাগে আমাকে ছোঁবে না!" গুড়িয়ার আর্তচিৎকার শুনে আমার মাথায় কিছু একটা খেলে গেলো। ইচ্ছে করলো শান্তারামের ঘরে ছুটে গিয়ে খালি হাতেই তাকে খুন ক'রে ফেলি। কিন্তু আমি আমার সাহস সঞ্চয় করার আগেই শান্তারামের গর্জন শুনতে পেলাম। সে জ্ঞান হারিয়েছে। গুড়িয়া অবশ্য এখনও কেঁদে যাচ্ছে। তার কান্না শুনতে আমাকে আর দেয়ালে কান পাততে হলো না।

তার কান্না আমার মধ্যে এক ধরণের অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো। আমি জানি না কোনো ভাই তার বোনের কান্না শুনলে কেমন প্রতিক্রিয়া দেখাবে কারণ আমার কোনো বোন থাকার অভিজ্ঞতা নেই। তবে আমি জানি তাকে একটু সান্ত্বনা দিতে হবে। দুভার্গ্যজনকভাবে মাঝখানে একটা দেয়াল আছে এমন কাউকে সান্ত্বনা দেয়াটা খুব একটা সহজ কাজ নয়, সেই দেয়ালটা যতো পাতলাই হোক না কেন। ঠিক তখনই আমি খেয়াল করলাম দেয়ালের যেখানটা দিয়ে পানির পাইপ চলে গেছে সেখানে একটা ফুটো আছে। হাত ঢোকানোর মতো আকার হবে সেটার। আমি সাথে সাথে ফুটোটা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ফেললাম। "বোন, কেঁদো না। এই যে, আমার হাতটা ধরো," আমি চিৎকার ক'রে বললাম। কেউ আমার হাতটা ধরলো। মনে হলো কোনো অন্ধ আমার হাতটা হাতরে হাতরে দেখছে সেটা কার। তারপর শক্ত ক'রে আমার হাতটা ধরে রাখলে আমার মধ্যে ভালোবাসা আর স্নেহ মমতার অদ্ভুত এক শক্তি টের পেলাম। গুড়িয়ার কষ্ট যন্ত্রণাগুলো যেনো আমার নিজের, এমনই একটা অনুভূতি হলো আমার।

সেলিম ঘুম থেকে উঠে বিছানায় বসে দৃশ্যটি দেখে হতবিহ্বল হয়ে চেয়ে রইলো। "মোহাম্মদ, তুই কি পাগল হয়ে গেলি? বুঝতে পারছিস কি করছিস তুই?" আমাকে তিরস্কার ক'রে বললো সে। "যে ফুটোটা দিয়ে তুই হাত ঢুকিয়ে রেখেছিস সেটা দিয়ে তেলাপোকা আর ইঁদুর যাওয়া আসা করে।"

কিন্তু সেলিমের কথায় কোনো কর্ণপাত করলাম না। আমি জানি না গুড়িয়ার হাত কতোক্ষণ ধরে রেখেছিলাম, তবে পরদিন সকালে উঠে দেখি মেঝেতে শুয়ে আছি, কিন্তু হাতটা ফুটো দিয়ে ঠিকই ঢোকানো আছে।

আমাদের পারিবারিক সদস্য এক তেলাপোকা আমার শার্টের পকেটে সুখনিদ্রা যাচ্ছে।

পরদিন রাতে শান্তারাম আবারো মদ খেয়ে এসে নিজের মেয়ে গুড়িয়ার গায়ে হাত দিলো। "সমস্ত নক্ষত্র আর তারার চেয়ে তুমি বেশি সুন্দর। তুমি আমার চাঁদ। তুমি আমার গুড়িয়া, আমার পুতুল। গতকাল তুমি আমার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছো, কিন্তু আজ আর পাবে না," বললো সে।

"এসব বন্ধ করো!" মিসেস শান্তারাম চিৎকার ক'রে কেঁদে কেঁদে বললেও তার স্বামী কথাটা খেয়ালই করলো না।

"চিন্তা কোরো না, গুড়িয়া। তোমার প্রতি আমার ভালোবাসায় কোনো পাপ নেই। এমন কি মহান সম্রাট শাহজাহানও তার নিজ মেয়ে জাহান আরার প্রেমে পড়েছিলেন। যে লোক বীজ বপন ক'রে গাছ বানিয়েছে তাকে কে সেই গাছ থেকে ফল আরোহন করতে বাঁধা দেবে!"

"তুমি একটা অসূর," মিসেস শান্তারাম চিৎকার ক'রে বললেন। সঙ্গে সঙ্গে শান্তারাম তাকে আঘাত করলো। বোতল ভাঙার শব্দ শুনতে পেলাম আমি।

"না!" শুনতে পেলাম গুড়িয়ার আর্তচিৎকার।

মনে হলো অক্সিএসিটিলিনের আগুনের শিখা আমার মস্তিষ্ক ভেদ ক'রে ফেলেছে, আর গলিত লোহা ঢেলে দেয়া হচ্ছে আমার মাথার ভেতর। আর সহ্য করতে পারলাম না। দৌড়ে চলে গেলাম মিঃ রামকৃষ্ণার ঘরে। তাকে বললাম মিঃ শান্তারাম তার নিজের স্ত্রী আর মেয়ের সাথে ভয়ংকর খারাপ কাজ করছে। কিন্তু আমার কথা শুনে রামকৃষ্ণা এমন আচরণ করলেন যেনো আমি আবহাওয়া সংক্রান্ত কিছু বলছি।

"দ্যাখো," বললো সে, "কোনো পরিবারের চার দেয়ালের ভেতর যাই ঘটুক না কেন, সেটা তাদের নিজেদের ব্যাপার, এখানে আমরা নাক গলাতে পারি না। তুমি হলে এতিম বাচ্চা ছেলে। জীবনের অনেক কিছুই তুমি দ্যাখো নি। কিন্তু আমি নিত্যদিন স্ত্রীকে পেটানো, শ্লীলতাহানি ঘটানো আর ধর্ষণ করার কথা জানি। এই চাউলে কেন, পুরো মুম্বাই শহরেই এমন ঘটনা ঘটে। তারপরও কেউ কিছু করে না। আমরা ভারতীয়রা চারপাশে এরকম ঘটনা দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এসব দেখে ভেঙে না পড়ে নির্বিকার থাকার সক্ষমতা আমাদের তৈরি হয়ে গেছে। তো, একজন মুম্বাইবাসী হিসেবে তুমি তোমার দু'চোখ, দু'কান আর মুখ বন্ধ রেখে আমার মতো সুখী জীবন যাপন করার চেষ্টা করো। এবার যাও, আমার ঘুমের সময় হয়েছে।"

আমি আমার ঘরে ফিরে এলাম। শুনতে পেলাম শান্তারাম ঘোৎ ঘোৎ করছে আর গুড়িয়া চিৎকার ক'রে বলছে, "আমাকে ছোঁবে না! কেউ আমাকে ছোঁবে না! যে-ই আমার কাছে আসবে সে-ই অপবিত্র হয়ে যাবে!" গুড়িয়া নিজেকে অপবিত্র বলছে!

আমার মনে হলো তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমারও মাথা খারাপ

হয়ে গেলো সেই সঙ্গে। "আমাকে অপবিত্র করো," দেয়ালের ফুটো দিয়ে হাত ঢুকিয়ে বললাম আমি।

গুড়িয়া আমার হাতটা ধরলো। "আমি বেশি দিন বাঁচবো না, রাম মোহাম্মদ টমাস," সে কেঁদে কেঁদে বললো। "আমার বাবার কাছে ধরা দেবার চেয়ে বরং আমি আত্মহত্যাই করবো।" তার সব দুঃখ যন্ত্রণা হাত দিয়ে আমার শরীরে প্রবেশ করলো যেনো।

কাঁদতে শুরু করলাম আমি। "এটা আমি কখনই হতে দেবো না," তাকে বললাম। "একজন ভাই এই কথা দিচ্ছে তোমাকে।"

সেলিম আমার দিকে এমন নোংরা দৃষ্টিতে তাকালো যেনো আমি কোনো অপরাধ ক'রে ফেলেছি। কিন্তু তখন কোন্‌টা ভুল আর কোন্‌টা সঠিক সেই হিসেবের মধ্যে আমি নেই। আমার কাছে মনে হলো গুড়িয়াকে কোনো জানোয়ার ছিঁড়ে খুবলে খেতে চাচ্ছে। এটাও জানতাম আমি একজন এতিম। অন্য লোকের সমস্যা নিজের কাঁধে নেয়াটা আমার পক্ষে দুঃসাহসিক কাজ। কিন্তু গুড়িয়ার অপরাধটা কি? সে একজন মেয়ে হিসেবে জন্মেছে, আর শান্তারাম তার পিতা?

পরের দিন রাতে যখন শান্তারাম বাড়ি ফিরে এসে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে যাচ্ছিলো তখন আমি আমার প্রতীজ্ঞা পালন করলাম। ধীরে ধীরে সে উঠছে। তার জামাকাপড় থেকেও হুইস্কির গন্ধ আসছে। রেলিংয়ের যে অংশটা ভাঙা সেটা অতিক্রম করার সময় আমি পেছন থেকে তাকে ধাক্কা মেরে বসলাম। শান্তারাম হুড়মুর ক'রে নিচে পড়ে গেলো। ছবিতে দেখা যায় ভিলেন এরকম উপর থেকে নিচে পড়ার সময় হাত পা ছুড়তে ছুড়তে আ-আ-আ করে পড়ে যায়, কিন্তু বাস্তবে তেমনটি হলো না। শান্তারাম ভারি কোনো পাথরের মতোই ধপ্ ক'রে পড়ে গেলো। তার মুখটা প্রথমে মাটিতে পড়লে থেতলে গেলো সেটা। দেখলাম হাত-পা ছড়িয়ে নিথরভাবে পড়ে আছে সে।

তার দেহটা দেখেই বুঝতে পেলাম কি করেছি আমি। তারপর এর পরিণাম কি হবে সেটাও ভাবতে শুরু করলাম।

ক্রাইম সিন অফিসার লাল বাতি জ্বালাতে জ্বালাতে জিপে ক'রে আসবে। ঘটনাস্থলের ছবি তুলে বলবে, "এখানেই বডিটা পড়েছিলো।" তারপর উপরে তাকিয়ে দোতলায় আমাকে দেখবে তারা। ইন্সপেক্টর আমার দিকে নির্দেশ করবে। "এই ছেলেটাই তাকে ধাক্কা দিয়েছে। তাকে গ্রেফতার করো!" আমাকে জেলে নেয়া হবে। সেখানে আমাকে ন্যাংটা ক'রে পেটাবে তারা।

তারপর আদালতের কাঠ গড়ায় দাঁড় করাবে। বিচারক সব শুনে গম্ভীর মুখে বলবেন, "রাম মোহাম্মদ টমাস, মিঃ শান্তারামকে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী হত্যা করার জন্যে আমি তোমাকে দোষী সাব্যস্ত করছি। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা মতে আমি তোমাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যু দণ্ডাদেশ দিলাম।"

"না!" চিৎকার ক'রে বলে আমি দৌড়ানোর চেষ্টা করলাম কিন্তু আমার পা বাধা। হাতে হাতকড়া। আমাকে চোখ বেঁধে ফাঁসি কাষ্ঠে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। গলায় ফাঁস লাগানো হলো, তারপর লিভার টেনে দিলো জল্লাদ। দড়িতে ঝুলে পড়লাম আমি। দম বন্ধ হয়ে আসছে আমার। কোটর থেকে দু'চোখ বের হয়ে আসছে যেনো। তারপর নিজেকে আবিষ্কার করলাম স্বর্গে। কিন্তু স্বর্গটা আমাদের চাউলের মতোই। নিচে চেয়ে দেখি হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে শান্তারাম। লোকজন চারপাশে জড়ো হচ্ছে। কেউ চিৎকার ক'রে বললো, "পুলিশকে ডাকো!"

আর দেরি করলাম না। সিঁড়ি দিয়ে নেমে দৌড়াতে লাগলাম। গেট দিয়ে বের হয়ে লোকাল স্টেশনের দিকে ছুটলাম রুদ্ধশ্বাসে। একটা বিশেষ ট্রেনের খোঁজ করলাম আমি। অবশেষে সেটা খুঁজে ফেলে লাফিয়ে উঠে পড়লাম তাতে।

মুম্বাই ছাড়লাম আমি। ছাড়লাম গুড়িয়া আর সেলিমকে। পালিয়ে গেলাম সেই শহরে, যে শহরটাকে আমি ভালো মতো চিনি। দিল্লি।

পুড়ো গল্পটা শোনার সময় স্মিতা চুপ ক'রে থাকলো। গল্পটা যে তাকে দারুণভাবে আন্দোলিত করেছে সেটা দেখতে পেলাম। তার চোখের কোণে অশ্রব বিন্দুরও আভাস দেখলাম ব'লে মনে হচ্ছে। একজন নারী হিসেবে বোধহয় সে গুড়িয়ার অবস্থাটা সবচাইতে ভালোভাবে বুঝতে পেরেছে।

আমি রিমোটটা তুলে নিলাম। "চলুন, প্রশ্ন নাম্বার তিন দেখি," রিমোটের 'প্লে' বাটনে চাপ দিয়ে বললাম আমি।

প্রেম কুমার চেয়ারে দুলতে দুলতে বললো, "মিঃ টমাস, তুমি এ পর্যন্ত দুটো সঠিক জবাব দিয়ে দু'হাজার রুপি জিতে নিয়েছো। দেখি তিন নাম্বার প্রশ্নের জবাব দিয়ে তুমি পাঁচ হাজার রুপি জিততে পারো কিনা। তুমি প্রস্তুত?"

"প্রস্তুত," জবাবে বললাম আমি।

"ঠিক আছে, প্রশ্ন নাম্বার তিন। এটা এসেছে—"

তক্ষুণি মাঝখানের স্পটলাইটটা নিভে গেলো। আমি আর প্রেম কুমার ডুবে গেলাম অন্ধকারে।

"উফ্! হিউস্টন, আমাদের এখানে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে," প্রেম কুমার বললো। দর্শক হেসে ফেললো কথাটা শুনে। তবে আমি হাসির কারণটা ধরতে পারলাম না।

"আপনি কি বললেন?" প্রেম কুমারকে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"ওহ্ এটা? এটা বিখ্যাত সিনেমা *অ্যাপোলো থার্টিন্থ*-এর জনপ্রিয় একটি ডায়লগ। আমি নিশ্চিত তুমি ইংরেজি ছবি দেখো না। যখন কোনো বড় ধরনের সমস্যায় পড়বে এই লাইনটা ব্যবহার করবে। আমাদের এখানেও বড় একটা সমস্যা হয়েছে। স্পটলাইটটা ঠিক করার আগ পর্যন্ত আমরা অনুষ্ঠানটি চালিয়ে নিতে পারছি না।"

টেকনিশিয়ানরা স্পটলাইট ঠিক করার সময় প্রেম কুমার হেডফোনে কার সাথে যেনো কথা বলতে লাগলো। তারপর আমার দিকে ঝুঁকে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললো, "ঠিক আছে, ছোকরা। তোমার দৌড় দুটো প্রশ্ন পর্যন্তই। এখন তোমার খেল খতম হবে মনে হচ্ছে। পরের প্রশ্নটি খুবই কঠিন। বিশেষ ক'রে একজন ওয়েটারের জন্যে। আমি তোমাকে সাহায্য ক'রে আরো বেশি দূর নিয়ে যেতে চাইছিলাম, কিন্তু প্রডিউসার জানালেন তিনি এরপরের প্রতিযোগীকে চাচ্ছেন। গণিতের একজন প্রফেসর সে। তোমার জন্যে দুঃখিত!" এক গ্লাস লেমনেডে চুমুক দিলো সে।

স্পটলাইট ঠিক হয়ে গেলো। স্টুডিওর সাইনে 'হাত তালি' দেবার বাতিটা জ্বলে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে।

দর্শকদের হাত তালি শেষ হতেই প্রেম কুমার আমার দিকে তাকালো। "মিঃ টমাস, তুমি দুটো প্রশ্নের জবাব দিয়ে দু'হাজার রুপি জিতে গেছো। এবার দেখা যাক তুমি তিন নাম্বার প্রশ্নের জবাব দিয়ে পাঁচ হাজার রুপি জিততে পারো কিনা। প্রস্তুত?"

"প্রস্তুত," জবাবে বললাম আমি।

"ঠিক আছে, তোমার পরের প্রশ্নটি এসেছে জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে। আমাকে বলো তো, মিঃ টমাস, তুমি কি জানো সৌরজগতে কতোগুলো গ্রহ আছে?"

"আমার চয়েজগুলো কি?"

"এটা প্রশ্ন নয়, মিঃ টমাস। আমি কেবল জানতে চাচ্ছি তুমি জানো কিনা সৌর জগতে কতোগুলো গ্রহ আছে।"

"না।"

"না? আশা করি আমরা যে গ্রহে বাস করি অন্তত সেটার নাম তুমি

জানো?" দর্শক সারিতে হাসির রোল উঠলো।

"পৃথিবী," আমি চট ক'রে বললাম।

"বেশ ভালো। তাহলে তুমি একটা গ্রহের নাম অন্তত জানো। তিন নাম্বার প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত তো?"

"প্রস্তুত," আমি আবারো বললাম।

"ঠিক আছে। এই হলো তিন নাম্বার প্রশ্ন। আমাদের সৌরজগতের সবচাইতে ক্ষুদ্রতম গ্রহ কোন্‌টি? এ) প্লুটো, বি) মঙ্গল, সি) নেপচুন নাকি ডি) শুক্র?"

আমার অগোচরেই মুখ দিয়ে একটা শব্দ বের হয়ে গেলো। আর সেটা হলো, "মিউ!"

"কি বললে?" বিস্মিত হয়ে প্রেম কুমার জানতে চাইলো। "মনে হলো তুমি 'মিউ' বলেছো।"

"আমি বলেছি, 'এ'।"

"এ?"

"হ্যা, জবাবটা হলো প্লুটো।"

"তুমি কি একশত ভাগ নিশ্চিত যে সঠিক জবাব এ?"

"হ্যা!"

ড্রামের শব্দ বেজে উঠলো স্টুডিওতে। সঠিক জবাবের সাইনটা জ্বলে উঠলো সেই সঙ্গে।

"একদম সঠিক! আমাদের সৌরজগতে প্লুটোই সবচাইতে ক্ষুদ্রতম গ্রহ। মিঃ টমাস, তুমি পাঁচ হাজার রুপি জিতে গেছো!"

দর্শকেরা আমার সাধারণ জ্ঞানের বহর দেখে মুগ্ধ। কেউ কেউ দাঁড়িয়েও গেলো অভিবাদন জানাতে।

কিন্তু স্মিতা এখনও চুপ ক'রে আছে।

পঙ্গু হবার ভাবনা

মনে হচ্ছে সূর্যটা ম্রিয়মান হয়ে গেছে, পাখিরাও কম কিচির মিচির করছে। বাতাস অনেক বেশি দূষিত, আকাশে পড়েছে কালো ছায়া।

আমার মনে হয় আপনাকে যখন বড়সড় সুন্দর একটা বাঙলো থেকে তুলে নিয়ে পুরনো স্যাঁতস্যাঁতে একটা ঘরে রাখা হবে তখন জীবনকে কিছুটা জন্ডিসের মতো হলুদ দৃষ্টিতেই দেখবেন।

আর আপনার যদি সত্যি সত্যিই জন্ডিস থেকে থাকে তবে এটা কোনো সাহায্যে আসবে না। জন্ডিস খুবই অস্বস্তিকর একটি রোগ। তবে এর একটা ভালো পরিণামও রয়েছে। আপনাকে গাদাগাদি ক'রে থাকা ডরমিটরি থেকে তুলে নিয়ে নির্জন একটা ঘরে রাখা হবে। আমাকে যে ঘরে রাখা হলো সেটা বেশ বড়, একটা লোহার বিছানা আর ভারি ভারি পর্দাওয়ালা জানালা রয়েছে সেখানে। এটাকে বলা হয় আইসোলেশন ওয়ার্ড।

গত দু'সপ্তাহ ধরে আমি বিছানায় পড়ে আছি। কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে তারা আমাকে ফাদার টিমোথির খুন হবার পর থেকেই এখানে তুলে এনে রেখেছে। তারা অবশ্য জিপ গাড়িতে ক'রে লাল বাতি জ্বালাতে জ্বালাতে আসে নি। তারা এসেছিলো নীল রঙের একটা ভ্যানে করে, যার জানালাগুলো লোহার জালি দিয়ে আঁটকানো। যেরকম ভ্যানে ক'রে তারা পথঘাটের ভাসমান কুকুর ধরে নিয়ে যায়, ঠিক সেরকম। ব্যতিক্রম হলো এই ভ্যানটা পথঘাটে ভাসমান শিশুদের তুলে নেয়। আমি যদি কম বয়সী হতাম তাহলে তারা আমাকে এডাপশন হোমে নিয়ে যেতো, আর সঙ্গে সঙ্গে বেচেও দিতো। কিন্তু আমার বয়স যেহেতু আট বছর, তারা আমাকে দিল্লির জুভেনাইল হোমে পাঠিয়ে দেয়। সেটা টার্কম্যান গেটে অবস্থিত।

জুভেনাইল হোমের আসন সংখ্যা পঁচাত্তর হলেও আমরা মোট দেড়শ জন ওখানে ঠাঁই পেলাম। গাদাগাদি আর নোংরা পরিবেশ। নোংরা আর অস্বাস্থ্যকর। দুটো মাত্র টয়লেট আছে সেখানে। হলওয়ে আর রান্নাঘরে ইঁদুরের নিত্য আনাগোনা। ওখানে একটা ক্লাশরুম আছে, ভাঙাচোরা ডেস্ক আর সেই

ক্লাশরুমে অসংখ্য ফাঁটলযুক্ত একটা ব্লাকবোর্ড রয়েছে। ক্লাশরুমে অনেক বছর ধরেই শিক্ষকেরা ক্লাশ নেয় না। এটার একটা খেলার মাঠ থাকলেও সেটা ঘাসে আর অসংখ্য ইট পাথরে পরিপূর্ণ। একজন স্পোর্টস ইন্সট্রাক্টর আছে যে কিনা ক্রিকেট এবং ব্যাডমিন্টনের সমস্ত ক্রীড়া সামগ্রী সুন্দর কাঁচের আলমারিতে তালা মেরে রেখে দিয়েছে। আমাদেরকে সেগুলো কখনও স্পর্শও করতে দেয়া হতো না। মেস্ হলটা বিশাল একটা ঘর, যেটা কিনা যথারীতি নোংরা। ময়লা আর শক্ত রুটি, সাথে ঘাসতুল্য সব্জি। এই হলো আমাদের খাদ্য। কেউ বেশি চাইলেই তার দিকে বাবুর্চি রেগে মেগে তাকতো। ওয়ার্ডেন মিঃ অগ্নিহোত্রী খুবই দয়ালু বয়োজ্যেষ্ঠ এক লোক। ঢোলা কুর্তা পায়জামা পরে থাকেন তিনি। তবে আমরা জানি আসল ক্ষমতা কুক্ষিগত ক'রে রেখেছে তার ডেপুটি মিঃ গুপ্তা। যার ডাকনাম 'টার্কম্যান গেটের আতঙ্ক'। সবদিক থেকেই লোকটা নিকৃষ্টমানের। বেটে খাটো, লোমশ শরীর তার। শরীর থেকে চামড়ার দুর্গন্ধ বের হয়, আর সারাক্ষণ মুখে থাকে পান। লোকটা গলায় দু'টো সোনার চেইন পরে থাকে। তার হাতে থাকে বেত, চলার পথে যখন খুশি আমাদের উপর সেটা প্রয়োগ করে সে। গুজব আছে, রাতের বেলায় সে ছেলেদের ডেকে পাঠায়। তবে এ নিয়ে কেউ আলোচনা করে না। আমরা ভালো কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই। যেমন প্রতি রাতে কমনরুমে বসে দু'ঘণ্টা টিভি দেখতে পাওয়া। আমরা সবাই একুশ ইঞ্চির ডায়নোরা টিভির সামনে হুমরি খেয়ে পড়তাম। দেখতাম চ্যানেল ভি-তে হিন্দী সিনেমার গান আর দূরদর্শনে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সোপ অপেরা। আমরা রোববার সিনেমা দেখতে খুবই পছন্দ করতাম।

ঐসব ছবি কল্পিত এক জগত নিয়ে। এমন একটি জগত যেখানে বাচ্চাদের বাবা-মা আছে, আছে তাদের জন্মদিন। বিশাল বিশাল বাড়িতে তারা থাকে, বড় বড় আর দামি গাড়িতে চড়ে তারা। মাঝে মাঝেই উপহার পায় সেসব বাচ্চারা। এসব দেখলেও আমরা এগুলোর ধারে কাছেও বাস করি না। আমরা জানি অমিতাভ বচ্চন এবং শাহ্রুখ খানের মতো জীবন আমরা কখনই পাবো না। বড়জোর আমাদের উপরে যারা ছড়ি ঘোরায় তাদের মতো হতে পারি আমরা। সুতরাং শিক্ষক যখনই আমাদের জিজ্ঞেস করতো আমরা বড় হয়ে কি হতে চাই, আমরা পাইলট, প্রাইম মিনিস্টার, ব্যাংকার বা অভিনেতা হতে চাই বলতাম না। আমরা বলতাম বাবুর্চি, ক্লিনার, অথবা স্পোর্ট টিচার। খুব বেশি হলে ওয়ার্ডেন। জুভেনাইল হোম আমাদেরকে নিজেদের কাছেই ক্ষুদ্র ক'রে ফেলেছিলো।

ওখানকার অনেক ছেলের সাথেই আমার ঘনিষ্ঠতা হয়ে যায়। বেশির

ভাগই আমার চেয়ে বড়, কিছু ছিলো ছোটো। মুন্না, কাল্লু, পেয়ারে, পবন, জসিম এবং ইরফানের সাথে পরিচিত হই আমি। ফাদার টিমোথির কাছ থেকে জুভেনাইল হোমে পাঠানোটা আমার কাছে মনে হলো স্বর্গ থেকে নরকে প্রেরণের মতো। কিন্তু যখন আমি অন্য অনেক ছেলের সাথে ঘনিষ্ঠ হলাম, বুঝতে পারলাম এটা তাদের কাছে স্বর্গতুল্য। তারা দিল্লি, বিহার, শান্তি টাউন, উত্তর প্রদেশ এমনকি বহু দূরের নেপালের বস্তি থেকে এসেছে। তাদের কাছ থেকে আমি মাদকাসক্ত বাবা আর পতিতা মা'র গল্প শুনেছি। লোভি চাচা আর বদরাগি চাচির হাতে খাওয়া মারের দাগও তাদের শরীরে দেখেছি আমি। চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক আর দাসের মতো জীবনযাপন করার কাহিনীও জানতে পেরেছি তাদের কাছ থেকে। আর পুলিশ যে ভয়ঙ্কর সেটাও তাদের কাহিনী থেকে বুঝতে পেরেছি। ফলে পুলিশকে আমি ভয় পেতে শুরু করি। বেশির ভাগ ছেলেকে জুভেনাইল হোমে পুলিশই ধরে এনেছে। রুটি চুরি করা, সিনেমা হলের টিকেট ব্ল্যাক করা, কিংবা কনস্টেবলকে ঘুষ দিতে না পারার কারণে তাদের ধরে আনা হয়েছে।

এইসব ছেলেদের মধ্যে অনেকেই 'বহুবার' এখানে আসার অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। তার মানে তারা একাধিকবার জুভেনাইল হোমে এসেছে, এমনকি কেউ তাদেরকে কাস্টডিতে নেবার পরও। সৎ মায়ের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মুন্না এসেছে এখানে। জসিম তার নৃশংস ভাইয়ের তাড়া খেয়ে। পবন একটা মোটেলে কাজ করতো, রেইড দিয়ে পতিতাসহ অনেকের সাথে তাকেও ধরে আনে পুলিশ।

কোনো রকম চেষ্টা ছাড়াই আমি এইসব ছেলেদের নেতা হয়ে গেলাম। এজন্যে নয় যে, আমি বয়সে বড় কিংবা খুব আগ্রাসী মনোভাবের। এর কারণ আমি ইংরেজিতে কথা বলতে পারি। আমি হলাম সেই এতিম ছেলে যে কিনা জাদুতুল্য এই ভাষাটিতে পড়তে ও বলতে পারে। আর এটার প্রভাব কর্মকর্তাদের উপরেও দারুণ প্রভাব ফেললো। আমি কেমন আছি, কোনো সমস্যা আছে কিনা, হেড ওয়ার্ডেন আমার কাছে মাঝে মধ্যেই জানতে চাইতেন। স্পোর্ট টিচার আমাকে খেলার মাঠে একটা ক্রিকেট পিচ তৈরি করার অনুমতি দিলেন। কিন্তু চার পাঁচটা ম্যাচ খেলার পর মুন্না যখন স্পোর্ট টিচারের জানালার কাঁচ ভেঙে ফেললো খেলাধূলা বন্ধ ক'রে দেয়া হলো। ঝগড়াটে বাবুর্চি আমাকে বাড়তি খাবার দিতো। আর রাতের বেলায় গুণ্ডা কখনই আমাকে ডাকতো না। জন্ডিস ধরা পড়ার পর পরই ডাক্তার আমাকে আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করিয়ে দেন কোনো রকম দেরি না করেই। সেজন্যে পুরো ডরমিটরিতে এই ভাইরাস আর ছড়াতে পারে নি।

আইসোলেশন ওয়ার্ডে আমি সম্পূর্ণ একা উপভোগ করলাম দু'সপ্তাহেরও বেশি সময়। এরপরই আরেকজনকে নিয়ে আসা হলো সেখানে। আমাকে বলা হলো এই ছেলের অবস্থা খুবই খারাপ। একটা স্ট্রেচারে ক'রে তাকে নিয়ে আসা হলো, তার গলায় হলুদ রঙের একটা তাবিজ। এভাবেই আমার সাথে পরিচয় হলো সেলিম ইলিয়াসির।

সেলিমের সব আছে যা আমার নেই। তার গায়ের রঙ বেশ ফর্সা আর চেহারাও বেশ সুন্দর। তার কোকড়ানো চুল, হাসলে গালে টোল পড়ে। তার বয়স মাত্র সাত হলেও সে বেশ চটপটে আর অনুসন্ধানী মনের অধিকারী। সংক্ষেপে সে আমাকে তার জীবন কাহিনী শোনালো।

বিহারের এক হতদরিদ্র গ্রাম্য পরিবার থেকে সে এসেছে। তাদের গ্রামের বেশির ভাগই দরিদ্র কৃষক। তবে সেখানে হাতে গোনা ধনী জমিদারও রয়েছে। হিন্দু অধ্যুষিত হলেও বেশ কয়েকটি মুসলিম পরিবারের বাস রয়েছে ওখানে। সেলিমের বাবা একজন শ্রমিক, মা সাধারণ গৃহিনী। তার বড় ভাই একটা চায়ের স্টলে কাজ করতো। সেলিম নিজেও গ্রামের স্কুলে যেতো নিয়মিত। জমিদারের বাড়ির প্রাঙ্গনে তারা ছোট্ট একটা কুটিরে বাস করতো সপরিবারে।

গত সপ্তাহে, জানুয়ারির প্রচণ্ড শীতে গ্রামের হনুমানজির মন্দিরে একটা ঘটনা ঘটে যায়। কেউ রাতের বেলায় মন্দিরে ঢুকে হনুমানজির মূর্তি ভেঙে ফেলে। মন্দিরের পুরোহিত দাবি করে বসে আশেপাশে কিছু মুসলিম যুবককে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে। ব্যস, হয়ে গেলো! হিন্দুরা এ কথা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। দা-চাপাতি আর বল্লম নিয়ে মুসলিমদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা। সেলিম তখন বাড়ির বাইরে খেলছিলো, ঘরে বসে চা পান করছিলো তার মা-বাবা আর বড় ভাই, সে সময়েই দুষ্কৃতিকারীরা আক্রমণ করে বসে তাদের ঘর। তারা তার চোখের সামনেই তাদের ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। তার মার আর্তনাদ, বাবার গোঙানী আর ভায়ের চিৎকার শুনেছে সে। কিন্তু হামলাকারীরা কাউকে ঘর থেকে বের হতে দেয় নি। তার পুরো পরিবারটিই তার চোখের সামনে আগুনে পুড়ে মারা যায়। সেলিম সেখান থেকে দৌড়ে রেলস্টেশনে গিয়ে ট্রেনে চেপে দিল্লিতে চলে আসে। খাবার নেই, জামাকাপড় নেই, নেই কোনো পরিচিতজন। তীব্র শীতে সে দু'দিন অভূক্ত অবস্থায় প্লাটফর্মে শুয়ে কাটিয়ে দেয়। জ্বরে আক্রান্ত সেলিমকে এক কনস্টেবল তুলে নিয়ে আসে এই জুভেনাইল হোমে।

সেলিম বলেছে রাতে সে দুঃস্বপ্ন দেখে, আক্রমণকারীদের গর্জন শোনে। তার মায়ের আর্তচিৎকার প্রতিধ্বনিত হয় তার কানে। তার ভায়ের সারা শরীর আগুনে পুড়ছে এরকম একটি দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠলে সে কেঁপে

ওঠে। আমাকে বললো, সব হিন্দুকে নাকি সে ঘৃণা করতে শুরু করেছে। আমার নাম জানতে চাইলো সেলিম।

আমি তাকে বললাম, "মোহাম্মদ।"

খুব অল্প দিনেই আমি আর সেলিম ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেলাম। আমাদের মধ্যে অনেক মিল। আমরা দু'জনেই এতিম, কেউ আমাদের দত্তক নেবে না সেটা আমরা জেনে গেছি। সে আশা বৃথা। আমরা দু'জনেই মার্বেল খেলতে পছন্দ করি। আর দু'জনেই সিনেমার ভীষণ ভক্ত। ডরমিটরিতে ফিরে আসার পর আমি তাকে আমার পাশের বিছানায় চলে আসার জন্যে রাজি করাতে সক্ষম হই।

পরে একরাতে সেলিমকে গুপ্তার ঘরে ডেকে পাঠানো হয়। গুপ্তা একজন বিপত্তীক। কম্পাউন্ডে একাই থাকে। সেলিম চিন্তায় পড়ে গেলো। "সে আমাকে ডাকছে কেন?" আমাকে সে বললো।

"আমি জানি না," জবাবে বললাম। "আমি কখনই তার ঘরে যাই নি, তবে আজকে দেখবো কি কারণে সে ছেলেদের নিজের ঘরে ডাকে।"

তো সেলিম গুপ্তার ঘরে গেলে আমিও তার পেছন পেছন পা টিপে টিপে চলে গেলাম।

সেলিম যখন দরজায় নক্ করলো গুপ্তা তখন কুর্তা আর পায়জামা পরা অবস্থায় নিজের ঘরে বসে আছে। "আসো, আসো সেলিম," খুব আমুদে কণ্ঠে বললো সে। তার হাতে মদের গ্লাস। এক ঢোক খেয়ে মুখ মুছে নিলো গুপ্তা। তার চোখ দুটো বোতামের মতো গোল হয়ে আছে। দরজার পর্দার আড়াল থেকে আমি সব দেখছি। সেলিমের মুখে আল্‌তো ক'রে টোকা মারলো সে। তার শুকনো আঙুল সেলিমের গাল আর ঠোঁটে বিচরণ করলো। তারপর বাজখাই গলায় আচম্‌কা সে আদেশ করলো, "প্যান্ট খুলে ফেলো।"

একথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেলো সেলিম।

"যা বললাম তাই কর্, বানচোত। তা না হলে কষে একটা চড় লাগাবো," গুপ্তা ফোঁস ফোঁস ক'রে বললো।

সেলিম কথা মতো কাজ করলো। ইতস্তত করলেও খুলে ফেললো পরনের প্যান্টটা। আমি আমার চোখ সরিয়ে ফেললাম সঙ্গে সঙ্গে।

সেলিমের পেছন থেকে গুপ্তা এগিয়ে আসছে। "ভালো," বিড়বিড় ক'রে বললো সে। তাকে দেখলাম নিজের পায়জামা খুলে ফেলতে। আমি তার লোমশ পাছা দেখতে পেলাম। এখনও সেলিম বুঝতে পারছে না কী ঘটতে

যাচ্ছে। কিন্তু ফাদার জনের ঘরে দেখা সেই ঘটনা মনে পড়ে যেতেই আমি সব বুঝে ফেললাম।

প্রাণপণে চিৎকার দিলাম আমি। আমার চিৎকারে বিদীর্ণ হলো রাতের নিস্তব্ধতা। ডরমিটরির ঘুমন্ত ছেলেরা জেগে উঠলো; জেগে উঠলো রান্নাঘরে নাক ডেকে ঘুমিয়ে থাকা বাবুর্চিও। নিজ ঘরে ঘুমিয়ে থাকা ওয়ার্ডেনও জেগে গেলো, এমনকি রাস্তার কুকুরগুলো পর্যন্ত নড়েচড়ে বসলো আমার চিৎকারে। ঘেউ ঘেউ করতে শুরু করলো তারা।

গুপ্তা বুঝতে পারলো না কী হয়েছে। তড়িঘড়ি পায়জামা পরে সেলিমকে তাড়িয়ে দিলো ঘর থেকে। কিন্তু তার আগেই বাবুর্চি, রক্ষীরা আর ওয়ার্ডেন গুপ্তার ঘরের দিকে রওনা হয়ে গেছে। সেই রাতে তারা সবাই গুপ্তার নোংরা কাজের কথা জানতে পারলো (যদিও তারা এ ব্যাপারে কিছুই করলো না)। তবে গুপ্তাও জেনে গেলো পর্দার আড়াল থেকে চিৎকারটা আমিই দিয়েছি। সেই থেকে সে হয়ে গেলো আমার চিরশত্রু। সেলিম ভয়ে কাঁপতে থাকলেও তার কোনো ক্ষতি হয় নি। আগে থেকেই সে হিন্দুদের বিরুদ্ধে ঘৃণা করতে শুরু করেছিলো, কিন্তু এখন বাকি জীবনে তাদের ব্যাপারে সুতীব্র এক ভয়ও জেঁকে বসলো তার মনের গভীরে।

চমৎকার বসন্তের দিন। আর দিনটা তার চেয়েও বেশি সুন্দর হয়ে উঠলো কারণ আমরা জুভেনাইল হোমের বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে বাইরে এসেছি। আমাদেরকে এক এনজিও ভ্রমণ করার সুবিধা দিয়েছে। এয়ারকন্ডিশন বাসে করে দিল্লির বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে আমাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। চিড়িয়াখানায় গিয়ে আমরা লাঞ্চ করলাম, জন্তু জানোয়ার দেখলাম। এই প্রথমবার আমরা জলহস্তী, ক্যাঙ্গারু, জিরাফ আর বিশালাকৃতির স্লথ দেখলাম চোখের সামনে। পেলিকান ফ্লেমিঙ্গো, হাঁসের পা-সদৃশ্য প্লাটিপাসও দেখলাম। এরপর আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো কুতুব মিনারে। ইন্ডিয়ার সর্বোচ্চ টাওয়ার এটি। হাসতে খেলতে আমরা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে নিচে তাকিয়ে দেখি মানুষগুলোকে পিপঁড়ার মতো দেখাচ্ছে। চিৎকার ক'রে আমরা 'হুউউউ!' ধ্বনি করলাম। শেষে আমাদেরকে ইন্ডিয়া গেটে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে উৎসব চলছে। আমাদের সবাইকে দশ টাকা ক'রে দিয়ে বলা হলো নিজের পছন্দসই কিছু কিনে খেতে। আমি বিশাল নাগরদোলায় চড়তে চাইলাম। কিন্তু সেলিম আমাকে জোর ক'রে পণ্ডিত রামশংকর নামক জ্যোতিষীর কাছে নিয়ে গেলো। তার কাছে হাত দেখালে দশ রুপি লাগবে। জ্যোতিষী লোকটা বয়স্ক। কুর্তা

আর ধূতি পরে আছে।

"আমি আমার হাত দেখাতে চাই," সেলিম বললো।

"মাত্র দশ রুপি লাগবে," জ্যোতিষ বললো।

"বোকামি করিস না," বললাম তাকে। "এইসব জ্যোতিষী ভূয়া। তারা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু জানে না। তোর ভবিষ্যতের কথা এ লোক বলতে পারবে না। আর আমাদের যদি ভবিষ্যৎ থেকেও থাকে সেটা টাকা খরচ ক'রে জানার মতো কিছু না।"

"তারপরেও আমি হাত দেখাবোই," সেলিম নাছোর বান্দা।

"বেশ," আমি রাজি না হয়ে পারলাম না। "তুই দেখা, কিন্তু আমি আমার দশ রুপি এভাবে ফালতু জিনিসের পেছনে খরচ করবো না।"

টাকা দিয়ে সেলিম সাগ্রহে তার হাতটা বাড়িয়ে দিলো। পণ্ডিত মাথা নেড়ে বললো, "না, বাম হাত না। মেয়েরা বাম হাত দেখাবে, ছেলেরা দেখাবে ডান হাত।"

সেলিম তার ডান হাতের তালুটা মেলে ধরলে জ্যোতিষী ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে তার হাতের রেখা দেখতে লাগলো মনোযোগ দিয়ে। কিছুক্ষণ পর সন্তুষ্টির হাসি দিয়ে সেলিমের দিকে তাকালো সে।

"তোমার হাতটা অসাধারণ, বাবা। আমি এরকম ভালো হাতের রেখা দেখি নি। কী সৌভাগ্য রে বাবা! তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি আমি।"

"সত্যি?" সেলিম আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে বললো। "আমি বড় হয়ে কি হবো?"

"তোমার চেহারা খুব সুন্দর। তুমি খুব বিখ্যাত নায়ক হবে," জ্যোতিষী রায় দিয়ে দিলো।

"আরমান আলীর মতো?" সেলিম উৎসাহে জানতে চাইলো।

"তার চেয়েও বড়," পণ্ডিত বললো। আমার দিকে তাকালো সে। "তুমিও কি হাত দেখাতে চাও? মাত্র দশ রুপি লাগবে।"

"না, আমি দেখাবো না," কথাটা বলেই আমি চলে যেতে উদ্যত হলাম। কিন্তু সেলিম আমাকে টেনে ধরে রাখলো।

"না, মোহাম্মদ, তোকে হাত দেখাতেই হবে। আমার কসম লাগে।"

হতাশ হয়ে আমি দশ রুপির নোটটা বের ক'রে জ্যোতিষকে দিলাম।

হাত দেখে পণ্ডিতের চেহারায় গুরুগম্ভীর একটা ভাব চলে এলো। পাঁচ মিনিট ধরে উল্টেপাল্টে দেখলো সে। কিছু লেখালেখিও করলো কাগজে।

"কি হয়েছে?" সেলিম ভয়ার্ত কণ্ঠে জানতে চাইলো।

জ্যোতিষ মাথা দে। া। "হৃদয় রেখাটা দুর্বল, যদিও শিরোরেখা খুব শক্ত। তবে আসল কথা হলো আয়ুরেখা খুবই ছোটো। নক্ষত্রের অবস্থান খুব একটা ভালো জায়গাতে নেই। শনির প্রভাবই বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবে আমি এই কুপ্রভাব কিছুটা কমিয়ে দিতে পারি। তাতে একটু খরচাপাতি করতে হবে।"

"কতো লাগবে?"

"প্রায় দুশ রুপি। তুমি তোমার বাবাকে বলছো না কেন, ঐ যে বড় বাসটা ক'রে এসেছে, সেটাই তো তোমার বাবার, নাকি?"

আমি হেসে ফেললাম। "হা! পণ্ডিতজি, আমাদের ভবিষ্যৎ বলার আগে আপনার আগে খোঁজ নেয়া উচিত ছিলো আমরা কারা। আমরা কোনো বড় লোকের ছেলে না। দিল্লির এক এতিমখানার এতিম ছেলে আমরা। ঐ বাসটা আমাদের নয়। তারপরও আপনি আমাদের কাছ থেকে বিশ রুপি হাতিয়ে নিয়েছেন।" আমি সেলিমকে টেনে নিয়ে যেতে চাইলাম। "এখানে আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। যথেষ্ট টাকা নষ্ট ক'রে ফেলেছি।"

চলে যাবার সময় জ্যোতিষ আমাকে ডাকালো। "শোনো! আমি তোমাকে একটা জিনিস দিতে চাই।"

আমরা দু'জনেই তার কাছে গেলাম। পণ্ডিত আমাকে পুরনো এক রুপির একটা কয়েন দিলো।

"এটা কি, পণ্ডিতজি?"

"এটা সৌভাগ্যের কয়েন। রাখো। এটা তোমার দরকার হবে।"

কয়েনটা আমি আমার হাতে নিলাম।

সেলিম আইসক্রিম খেতে চাইলো কিন্তু আমাদের কাছে আইসক্রিম খাওয়ার মতো কোনো টাকাপয়সা নেই। পকেট থেকে কয়েনটা বের ক'রে শূন্যে ছুড়ে মারলাম আমি। মাটিতে পড়ে সেটা একটা বেঞ্চের নিচে গড়িয়ে ঢুকে পড়লো। উপুড় হয়ে সেটা নিতে গিয়ে দেখতে পেলাম বেঞ্চের নিচে কয়েনটার পাশে দশ রুপির একটা নোট পড়ে আছে। কেউ হয়তো ভুলে ফেলে গেছে। জাদুর মতো ঘটনা। সেলিম আর আমি আইসক্রিম কিনলাম। যত্ন ক'রে পকেটে ঢুকিয়ে রাখলাম কয়েনটা। আসলেই এটা আমার সৌভাগ্যের কয়েন।

আমার ভাগ্য খুব একটা ভালো নয় বলে সেলিমের মন খারাপ কিন্তু একই সাথে ফিল্মস্টার হবে বলে খুব উত্তেজিত সে। আমাদের সামনে বিশাল একটা সিনেমার বিলবোর্ড। তাতে দেখা যাচ্ছে হিরোর হাতে বন্দুক, বুকে রক্ত, মাথায় কালো পট্টি বাঁধা। ভিলেনের মুখে কুটিল হাসি; নায়িকার বিশাল বক্ষ। সেলিম

মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে আছে সেটার দিকে।

"কি দেখছিস, সেলিম?" জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

"দেখছি, কালো পট্টি আমার মাথায় বাঁধলে মানাবে কিনা," জবাবে বললো সে।

আমরা আমাদের ক্লাশে বসে আছি। কিন্তু আমাদের নিয়মিত শিক্ষক মিঃ জোশি পড়াচ্ছেন না। তিনি একটা উপন্যাস টেক্সবুকের মাঝখানে লুকিয়ে রেখে পড়ছেন। আমরা কাগজের এরোপ্লেন বানিয়ে একে অন্যের দিকে ছুড়ে মেরে আর ডেস্কে কাটাকুটি ক'রে সময় পার করছি। আচম্‌কা করিডোরে নজরদারী কাজে থাকা মুন্না দৌড়ে এসে ক্লাশ রুমে ঢুকলো। "মাস্টারজি, মাস্টারজি!" হাপাতে হাপাতে বললো সে। "ওয়ার্ডেন সাহেব আসছেন।"

আৎকে উঠে মিঃ জোশি তার উপন্যাসটি লুকিয়ে ফেললেন। আমাদের দিকে ফিরে আঙুল তুলে বললেন, "ঠিক আছে, আমরা কী নিয়ে যেনো আলোচনা করছিলাম? হ্যা। তোমরা আমাকে বলছিলে বড় হয়ে কি হতে চাও? এরপর কে বলবে?"

সেলিম হাত তুললো। এই প্রথম ক্লাশে এরকমটি করলো সে।

"হ্যা, সেলিম। তুমি কি হতে চাও?"

"আমি একজন বিখ্যাত অভিনেতা হবো, মাস্টারজি। এক জ্যোতিষ আমাকে বলেছে," বিজয়ীর ভঙ্গিতে বললো সে।

পুরো ক্লাশে হাসির রোল পড়ে গেলো।

লোকটা ধনী কিনা সে ব্যাপারে দুটো মতামত ছিলো। কেউ কেউ বলতো সে একজন হীরার ব্যবসায়ী, তার নিজের কোনো উত্তরাধিকার নেই। সুতরাং বারবার সে জুভেনাইল হোমে আসে বাচ্চা দত্তক নিতে। তাদেরকে তার মুম্বাইর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। অন্যেরা বলে, আসলে মুম্বাইয়ে তার একটা স্কুল আছে। সেখানে যথাযথ ট্রেনিং দেবার জন্যে বাচ্চাদের নিয়ে যাওয়া হয়। যেভাবেই হোক, একটা ব্যাপার পরিস্কার, শেঠজি যদি তোমাকে নির্বাচন করে তাহলে তোমার জীবনটাই পাল্টে যাবে।

শেঠজি কোনো হীরা ব্যবসায়ী নাকি একটা স্কুলের মালিক এ নিয়ে সেলিমের কোনো মাথা ব্যথা নেই। তার আগ্রহের বিষয় একটাই, লোকটা বিশাল শহর মুম্বাইয়ের—যাকে গণ্য করা হয় চলচ্চিত্র শিল্পের পীঠস্থান

হিসেবে। তার বিশ্বাস শেঠজি তাকে মুম্বাই নিয়ে গিয়ে আলো ঝলমলে বলিউডে আশ্রয় দেবে। এটাই তো তার নিয়তি। তার গন্তব্য। জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎবাণী সত্য হতে চলেছে।

আমাদের সবাইকে লাইন ক'রে দাঁড় করানো হলো শেঠজি আমাদের বাছাই করবেন বলে। সেলিম গোসল করে এলো। সত্যি বলতে কি, সে মোট তিন বার গোসল করেছে। বারবার নিজেকে ধুয়ে মুছে সাফ সুতরো করেছে যাতে তার শরীরে কোনো ময়লা না থাকে। নিজের সেরা জামাটি পরেছে সে। চুলগুলো আঁচড়িয়েছে পরিপাটী করে। সে এখন হোমের সবচাইতে ফিটফাট ছেলে। কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি সে যদি নির্বাচিত না হয় তবে খুবই ভেঙে পড়বে।

দু'জন লোক নিয়ে শেঠজি অবশেষে পৌছালো। তাকে দেখে মনে হচ্ছে না হীরার ব্যবসায়ী। বরং একজন গ্যাংস্টারের মতোই লাগছে তাকে। তবে এটাও তো ঠিক, আমরা এ জীবনে কোনো হীরক ব্যবসায়ী দেখি নি। হয়তো তারা দেখতে একদম গ্যাংস্টারদের মতোই হয়। বীরাপ্পন ডাকাতের মতোই হাড্ডিসার লম্বা আর পুরু গোঁফ তার। সাদা ব্যান্ডগালা সুট পরে আছে সে। তার শার্টের বোতামে লম্বা সোনার চেইন ঝোলানো। হাতের দশ আঙুলেই মনে হয় পাথর বসানো আংটি রয়েছে। তার সঙ্গে থাকা দু'জন লোক দেখতে একেবারে গুণ্ডাদের মতো। পরে তাদের নাম আমি জেনেছি—মুস্তাফা আর পান্নুজ। তাদের সাথে গুপ্তাও আছে।

"শেঠজি, মনে হয় আপনি আমাদের ভুলেই গেছেন। অনেক দিন পর এলেন। শেষবার যখন এসেছিলেন তারপর তো অনেক নতুন ছেলে এসেছে হোমে," গুপ্তা তাদেরকে বললো।

শুরু হলো ইন্সপেকশন। আমরা সবাই আমাদের সেরা হাসিটি মুখে এঁটে দাঁড়িয়ে রইলাম। প্রত্যেক ছেলের সামনে গিয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো শেঠজি। আমি জানি না লোকটা কী খুঁজছে। কী দেখতে চাইছে, কারণ কাউকে সে কোনো প্রশ্নই করছে না। তার ইন্সপেকশন শেষ হলো। আমার দিকে তাকিয়েও দেখলো না সে। তারপর আবারো ইন্সপেকশন শুরু করলো। কিন্তু সেলিমের কাছে আসতেই থেমে গেলো লোকটা।

"তোমার নাম কি?" দক্ষিণ ভারতীয় উচ্চারণে জিজ্ঞেস করলো শেঠজি।

"সে-সে...সেলিম ইলিয়াসি," উত্তেজনার চোটে সেলিম তোতলাতে শুরু করলো।

"সে কবে এসেছে এখানে?" গুপ্তাকে জিজ্ঞেস করলো শেঠজি।

"এগারো মাস আগে বিহার থেকে এসেছে।"

"তার বয়স কতো?"

"আট।"

"তার কি কেউ আছে?"

"না, শেঠজি। তার পুরো পরিবার দাঙ্গায় নিহত হয়েছে।"

"কী দুঃখজনক ঘটনা!" শেঠজি বললো। "তার মতো ছেলেই তো আমার দরকার। আপনি কি কাগজপত্র তৈরি ক'রে দিতে পারবেন?"

"খালি বলেই দেখেন না, শেঠজি। যাকে আপনার পছন্দ হবে সঙ্গে সঙ্গে আপনার হাতে তুলে দেবো। এই ছেলেটার বেলায় মুস্তফাকে তার চাচা হিসেবে দেখাবো। ওয়েল ফেয়ার বোর্ড কোনো সমস্যাই সৃষ্টি করতে পারবে না। সত্যি বলতে কি, তারাও চায় যতো বেশি বাচ্চা এখান থেকে চলে যাবে ততোই ভালো।"

"ভালো! এবার একটা বাচ্চাই নেবো।"

গুপ্তা সেলিমের দিকে তাকিয়ে আমার দিকে ফিরলো। আমি সেলিমের পাশেই দাঁড়িয়ে আছি। "এর ব্যাপারটা কি হবে?" আমাকে দেখিয়ে সে বললো।

শেঠজি আমার দিকে ফিরে মাথা দোলালো। "তার বয়স বেশি।"

"না, শেঠজি। তার বয়স তো মাত্র দশ। তার নাম টমাস। বেশ ভালো ইংরেজি বলতে পারে।"

"তাতে কিছুই যায় আসে না। তাকে আমার দরকার নেই। আমি ওটাকেই চাই।"

"তারা দু'জন হলো হরিহর আত্মা। সেলিমকে নিয়ে যেতে চাইলে টমাসকেও আপনার নিতে হবে।"

শেঠজি একটু বিরক্ত হলো। "বললাম না গুপ্তা, কোনো টমাস-ফমাসকে আমার দরকার নেই। আমি একটা ছেলেকেই নেবো, আর সেটা হলো সেলিম।"

"আমি দুঃখিত, শেঠজি, বলতে বাধ্য হচ্ছি। সেলিমকে নিলে টমাসকেও নিতে হবে। এটা হলো প্যাকেজ ডিল।"

"প্যাকেজ ডিল?"

"হ্যা। একটা কিনলে আরেকটা ফৃ। টমাসের জন্যে আপনার কাছ থেকে কোনো টাকা নেয়া হবে না।" গুপ্তা দাঁত বের ক'রে হাসলে তার পান খাওয়া দাঁতগুলো দেখা গেলো।

তার সঙ্গে আসা লোকজনের সঙ্গে একটু কথা বলে নিলো শেঠজি।

"ঠিক আছে," গুপ্তাকে বললো সে। "এ দু'জনের জন্যে কাগজপত্র তৈরি করুন। সোমবার এসে তাদেরকে আমি নিয়ে যাবো।"

সেলিম আমার হাত দুটো শক্ত ক'রে ধরলো। তার আনন্দের সীমা নেই।

ঐ রাতে উত্তেজনার চোটে সে ঘুমাতেই পারলো না। মুম্বাই ফিল্মের স্বপ্ন দেখলো সে। অমিতাভ আর শাহ্‌রুখের সাথে কথা বলছে মুম্বাইর কোনো অভিজাত এলাকায় বসে। আমিও ঐরাতে ঘুমাতে পারলাম না। তবে চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকলাম। আমি কোনো ফিল্মি জগতে আর স্বর্গ নিয়ে স্বপ্ন দেখলাম না। স্বপ্ন দেখলাম রাস্তার একজন হকার আমি, ফলমূল বিক্রি করছি। কালো মতো এক লোক আমার কাছে এলো আম কিনতে। তার স্বর্নের চেইনটা দেখলাম। তার ব্যাগে আমি কিছু আম ভরে দিয়ে তার অলক্ষ্যে একটা পঁচা কলাও ঢুকিয়ে দিলাম। একেবারে মাগনা।

মুম্বাইর উদ্দেশ্য আমরা ট্রেনে ক'রে রওনা হলাম। সেলিম এবং আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর কম্পার্টমেন্টে মুস্তফা আর পান্নুজের সাথে যাচ্ছি। আমাদেরকে বলা হয়েছে শেঠজি প্লেনে ক'রে আমাদের আগেই চলে গেছে। মুস্তফা আর পান্নুজ লুঙ্গি পরে আছে, তারা বিড়ি ফুঁকে আর ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিলো সময়টা। শেঠজি সম্পর্কে তারা আমাদেরকে খুব কম কথাই জানালো। বললো, তার আসল নাম হলো বাবু পিল্লাই। তবে সবাই তাকে মামান নামে ডাকে। মালায়াম ভাষায় এর অর্থ মামা। তবে তার আদি নিবাস কেরালার কোল্লামে। কিন্তু দীর্ঘ দিন ধরে সে মুম্বাইতে আছে। খুবই দয়ালু লোক সে। প্রতিবন্ধীদের জন্যে একটা স্কুল চালায়। তাদেরকে নিজেদের জীবন পূণর্গঠনে সাহায্য করে। মামান বিশ্বাস করে প্রতিবন্ধী শিশুরা ঈশ্বরের খুব প্রিয়। সে জুভেনাইল হোম থেকে শিশুদের উদ্ধার করে, কারণ তার মতে ওগুলো জেলখানা ছাড়া আর কিছু না। মামান যদি আমাদেরকে রক্ষা না করতো তবে আমাদের পরিণতি হোতো রাস্তায় রাস্তায় কাজ করে আর মানুষের বাড়িতে ঘরদোড় সাফ করে। এখন আমাদেরকে জীবনে সফল হবার জন্যে কিছু বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। মুস্তফা আর পান্নুজ খুবই ভালো পটিয়ে ফেললো। ভ্রমণের শেষ পর্যায়ে আমিও বিশ্বাস করতে শুরু করলাম মামান আমাদেরকে তুলে নেয়াতে আমাদের দু'জনের জীবনটাই বদলে গেলো। ভালো একটা জীবন শুরু হলো আমাদের।

ট্রেনটা অসংখ্য বস্তি আর ডেরা অতিক্রম ক'রে চলতে লাগলো। অর্ধনগ্ন শিশু যাদের পেট বেশ ফোলা ফোলা, তারা রেললাইনের পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়লো। তাদের মায়েরা নোংরা নর্দমায় জামাকাপড় ধুচ্ছে। আমরাও তাদের উদ্দেশ্যে নাত নাড়ালাম।

মুম্বাইর দৃশ্য আর শব্দ আমাদেরকে যারপরনাই মুগ্ধ করলো। চার্চ গেট

স্টেশনটা *লাভ ইন বম্বে* সিনেমাতে যেমন দেখা গেছে ঠিক সেরকমই। সেলিম হয়তো মনে মনে একটু দুরাশাও ক'রে ছিলো যে, চার্চের সামনে গোবিন্দকে নাচতে গাইতে দেখবে। মুস্তাফা আমাদেরকে সমুদ্র সৈকত কোথায় দেখিয়ে দিলো। আমি প্রথমবার সমুদ্র দেখে বিমুগ্ধ হলাম। কিন্তু সেলিমের সেদিকে কোনো মনোযোগই নেই। সফট ড্রিংক বিক্রি করা স্টলের দিকে তার যতো আগ্রহ। "ঐ তো, ওখানেই গোবিন্দ আর রাভিনা ট্যান্ডন 'ভেলপুরি' গানটা গেয়েছিলো।" আমরা হাজি আলী দরগাহ্‌টা অতিক্রম করলাম। দরগাহ্‌টা দেখেই সেলিম দু'হাত তুলে আল্লাহর কাছে সংক্ষিপ্ত একটা মোনাজাত সেরে নিলো। ঠিক যেমনটি সে *কুলি* ছবিতে অমিতাভ বচ্চনকে করতে দেখেছিলো। ওরলি ডিস্ট্রিক্ট, দাদার, মাহিম অতিক্রম ক'রে গেলাম আমরা। মুস্তফা আমাদেরকে দর্শনীয় সব জায়গাগুলো চিনিয়ে দিলো। মাহিম ফোর্টে আসতেই সেলিম ট্যাক্সি ড্রাইভারকে থামতে বললো চিৎকার করে।

"কি হয়েছে?" মুস্তফা জানতে চাইলো।

"কিছু না! আমি দেখতে চাইছিলাম *মাফিয়া* ছবিতে ঠিক কোথায় চোরা কারবারিরা মালামাল নামিয়ে ছিলো!"

বান্দ্রা, জুহু আর আন্ধেরি দিয়ে যাবার সময় সেলিম চিত্র তারকাদের সারি সারি বাড়ি দেখে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লো। ট্যাক্সির জানালা দিয়ে মাথা বের ক'রে বিস্ময়ে সব দেখছে সে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে গ্রাম থেকে আসা কোনো ছেলে যেকিনা জীবনে প্রথম শহর দেখছে।

আমরা আমাদের গন্তব্য গুরুগাঁওয়ে পৌছে গেলাম। মামানের বাড়িটা যেরকম আশা করেছিলাম দেখতে ঠিক সে রকম নয়। বিশাল একটা বাড়ি, সামনে বাগান আর চারপাশে পাম গাছ। উঁচু দেয়াল দিয়ে পুরো বাড়িটা সুরক্ষিত করা হয়েছে, সেই দেয়ালের উপরের অংশে রয়েছে কাঁটা তারের বেড়া। বাড়ির সামনে কালো আর পেটানো শরীরের দু'জন লোক বিড়ি ফুঁকছে। তাদের পরনে পাতলা লুঙ্গি। হাতে বাঁশের লাঠি। লুঙ্গিগুলোর মাঝে সেলাই না থাকায় মাঝখানের ফাঁক দিয়ে তাদের আন্ডারওয়্যার দেখতে পেলাম আমরা। তাদের শরীর থেকে অদ্ভুত এক গন্ধ আসছে। পান্নুজ তাদের সঙ্গে বেশ দ্রুত মালায়াম ভাষায় কথা বললো। কেবলমাত্র 'মামান' শব্দটাই ধরতে পারলাম আমি। তারা নিঃসন্দেহে বাবু পিল্লাইর রক্ষী।

বাড়ির ভেতর ঢুকতেই মুস্তফা আঙিনার ওপাশে টিনের শেড দেয়া একসারি ভবন দেখিয়ে বললো, "এটা হলো সেই স্কুল, মামান প্রতিবন্ধীদের

জন্যে চালায়। ছেলেমেয়েরা ওখানে শুধু পড়াশোনা করে না, থাকেও।"

"আমি কোনো ছেলেমেয়ে দেখতে পাচ্ছি না কেন?" জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

"তারা সবাই ভোকেশনাল ট্রেনিংয়ে গেছে। চিন্তা কোরো না, রাতের বেলায় তাদের সাথে তোমাদের দেখা হবে। আসো, তোমাদের ঘর দেখিয়ে দিচ্ছি।"

আমাদের ঘরটা খুবই ছোটো। দুটো সরু দোতলা বিছানা আর একটা লম্বা আয়না আছে তাতে। সেলিম উপরের বিছানাটা বেছে নিলো। নিচে একটা বাথরুম আছে আমাদের ব্যবহারের জন্যে। ওটাতে বাথটাব আর শাওয়ার কার্টেনও রয়েছে। ফিল্মস্টারদের মতো লাক্সারি না হলেও এতে আমাদের বেশ চলে যাবে। দেখে মনে হচ্ছে আমরাই এই বাড়ির একমাত্র ছেলেপেলে।

আমাদের সঙ্গে দেখা করতে রাতের বেলায় মামান এলো। সেলিম তাকে জানালো মুম্বাই দেখে সে কতোটা খুশি হয়েছে, এও বললো, সে একজন অভিনেতা হতে চায়। কথাটা শুনে মামান হেসে ফেললো। "অভিনেতা হলে সবার আগে যে জিনিসটার দরকার সেটা হলো নাচ এবং গান গাইতে পারা। তুমি কি গান গাইতে পারো?"

"না," সেলিম মুখ কালো ক'রে বললো।

"এ নিয়ে চিন্তা কোরো না। আমি তোমার জন্যে বেশ ভালো একজন গানের শিক্ষক রেখে দেবো। কয়েক দিনের মধ্যেই তুমি কিশোর কুমার হয়ে যাবে।"

সেলিমকে দেখে মনে হলো সে বুঝি মামানকে জড়িয়েই ধরবে। কিন্তু নিজেকে সংযত রাখতে পারলো কোনো মতে।

রাতের বেলায় আমরা ডিনার করতে স্কুলে গেলাম। জুভেনাইল হোমের মতোই এটার একটা মেস্ হল আছে। সস্তা কাঠের টেবিল আর বেঞ্চ। বাবুর্চি লোকটা যেনো জুভেনাইল হোমের সেই বাবুর্চিরই কার্বন কপি। সেলিম আর আমাকে মুস্তফার পাশে ছোট্ট একটা টেবিলে বসতে বলা হলো। অন্য ছেলেমেয়েরা আসার আগেই খাবার দেয়া হলো আমাদেরকে। গরম গরম খাবারগুলো বেশ সুস্বাদু। নিঃসন্দেহে উন্নত জীবনের ইঙ্গিত বহন করছে সেটা।

একে একে সব শিশু আসতে লাগলে আমাদের কাছে স্বর্গের সংজ্ঞাটি ভয়াবহ এক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলো। আমি দেখলাম কিছু কিছু ছেলের চোখ নেই, হাতে ছড়ি নিয়ে চলাফেরা করছে; কিছু হামাগুড়ি দিয়ে চলাফেরা করছে পঙ্গু বলে। ক্রাচে ভর দেয়াও কিছু ছেলে আছে। মুখবিকৃত, দোমড়ানো মোচড়ানো আঙুলের কয়েকটা ছেলে। তাদের মধ্যে কিছু ছেলে আবার

ক্লাউনের মতো। ব্যতিক্রম হলো তাদের দেখে আমরা না হেসে বরং কাঁদবো। সেলিম আর আমি যে আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ করেছি সেটা একদিক থেকে ভালোই হয়েছে।

দেখতে পেলাম তিনটি ছেলে এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু তাদেরকে খাবার দেয়া হচ্ছে না। "এই ছেলেগুলো কারা?" মুস্তফাকে জিজ্ঞেস করলাম। "তাদেরকে খাবার দেয়া হচ্ছে না কেন?"

"তাদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে" বললো মুস্তফা। "ভালো কাজ করতে পারে নি বলে। তাদের নিয়ে ভেবো না, পরে তাদেরকেও খাবার দেয়া হবে।"

পরের দিন এলো গানের শিক্ষক। তার বয়স খুব বেশি হবে না। সঙ্গে একটা হারমোনিয়াম নিয়ে এসেছে। "আমাকে মাস্টারজি বলেই ডেকো," আমাদেরকে বললো সে। "এবার ভালো ক'রে শোনো আমি কি গান গাইছি।" আমরা মেঝেতে বসে শুনলাম, *'সা রে গা মা, পা, ধা, নি, সা।'* তারপর সে আমাদেরকে বোঝালো, "এ হলো সারগাম, সব গানে, সব সুরেই এই স্বরগুলো থাকে। এবার তোমরা এই স্বরগুলো আমার সাথে সাথে উচ্চারণ করবে। শব্দগুলো যেনো তোমাদের ঠোঁট দিয়ে না বের হয়, ওগুলো নাক দিয়েও যেনো বের না হয়, বুকের ভেতর থেকে বের করবে।"

সেলিম গলা খাকারি দিয়ে শুরু করলো। "সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি-সা।" একেবারে দরাজ গলায়। পুরো ঘরে তার কণ্ঠটা গমগম ক'রে উঠলো।

"খুব ভালো," হাত তালি দিয়ে শিক্ষক বললো, "তোমার কণ্ঠটা একেবারে প্রকৃতি প্রদত্ত। চমৎকার। আমার কোনো সন্দেহ নেই একটু চর্চা করলেই তুমি তিন অক্টেভ পর্যন্ত যেতে পারবে।" তারপর আমার দিকে ফিরলো শিক্ষক। "তুমি গাও তো এবার।"

"সা-রে-গা-মা-পা-ধা..." ফাঁটা বাঁশের মতো বাজখাই গলায় গেয়ে উঠলাম আমি।

শিক্ষক দু'কানে আঙুল ঢুকিয়ে বললো, "হরে রাম...হরে রাম...তুমি তো ষাড়ের মতো গাইছো! তোমাকে নিয়ে অনেক খাটতে হবে।"

আমাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এলো সেলিম। "না, মাস্টারজি, মোহাম্মদের গলাও ভালো। সে খুব ভালো চিৎকার করতে পারে।"

পরবর্তী দু'সপ্তাহ ধরে মাস্টারজি আমাদেরকে বিখ্যাত সাধুদের জনপ্রিয় সব ভক্তিমূলক গান শেখালো। কিভাবে হারমানিয়াম বাজাতে হয় তাও দেখালো

সে। আমরা কবিরের দোহা, তুলসী দাস আর মিরা বাইয়ের ভজন শিখলাম। মাস্টারজি খুব ভালো শিক্ষক। কেবল গানই শেখালো না, গানের বাণীগুলোও বুঝিয়ে দিলো। মর্মার্থগুলো গেঁথে দিলো আমাদের মনে। আমি কবিরের গানের ভক্ত হয়ে গেলাম। যিনি তার এক গানে বলেছেন

যুগ যুগ ধরে গুনে যাচ্ছো জপমালা
তবুও মেটে না মনের ধন্দ,
হাতের ঐ জপমালা ফেলে
মনের জপমালা গুনে দেখরে অন্ধ!

সত্যি বলতে কি, সেলিম মুসলিম হলেও তাকে ভজন শেখাতে সংকোচ বোধ করলো না মাস্টারজি। সেলিম নিজেও এ নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামালো না। অমিতাভ বচ্চন যদি *কুলি* ছবিতে মুসলিম চরিত্রে অভিনয় করতে পারে, সালমান খান যদি হিন্দু সেনাপতির চরিত্রে অভিনয় করতে পারে তবে সেলিম ইলিয়াসি কেন *ঠুমাকি চালাত রাম চন্দ্র বাজাত পে জানিয়া* গাইতে পারবে না মন্দিরের পুরোহিতের মতো সমান ভক্তি সহকারে!

মুস্তফা আর পান্নুজের নিষেধ সত্ত্বেও আমরা দু'জন পঙ্গু স্কুলের ছেলেদের সাথে মিশে তাদের জীবনের অনেক হৃদয়বিদারক ঘটনা জানতে পারলাম। নির্মম নির্যাতনকারী পুলিশ আর আত্মীয়-স্বজনের ক্ষেত্রে দিল্লি আর মুম্বাইয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এইসব ছেলেদের সম্পর্কে যতোই জানতে লাগলাম মামানের সত্যিকারের পরিচয়টাও আমাদের সামনে ততো বেশি উদ্ভাসিত হতে লাগলো।

অশোক নামের তেরো বছরের এক হাত বিকলাঙ্গ ছেলের কাছ থেকে শোনা ঘটনা প্রথম ভড়কে দিলো আমাদেরকে।

"আমরা স্কুলের ছেলে না," বললো সে, "আমরা ভিক্ষুক। লোকাল ট্রেনে আমরা ভিক্ষা করি। আমাদের কেউ কেউ পকেটও মারে।"

"তোমার আয় করা টাকা যায় কোথায়?"

"মামানের লোকদের হাতে তুলে দিতে হয়, বিনিময়ে তারা আমাদের খেতে দেয়, থাকতে দেয়।"

"মানে, মামান একজন গ্যাংস্টার?"

"তুমি কি ভেবেছো? সে কোনো ফেরেস্তা নয়। তবে অন্ততপক্ষে সে আমাদের দু'বেলা খেতে তো দেয়!"

মামানের উপর আমার সমস্ত বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেলেও সেলিমের আস্থা অটুট রইলো। তার ধারণা লোকটার মধ্যে কিছু ভালো গুণও আছে।

দশ বছরের অন্ধ ছেলে রাজুর সাথে আমাদের কথা হলো।

"তোমাকে আজ শাস্তি দেয়া হলো কেন?"

"আজ খুব বেশি ইনকাম করতে পারি নি।"

"প্রতিদিন তোমাকে কতো দিতে হয়?"

"যা আয় করি তার সবটাই। তবে তুমি যদি একশ রুপির কম দাও তোমাকে শাস্তি পেতে হবে।"

"শাস্তিটা কি?"

"তোমাকে খেতে দেয়া হবে না। খিদে পেটে তোমাকে ঘুমাতে হবে।"

"নাও, আমার চাপাতিটা নাও। তোমার জন্যে আমরা এটা রেখে দিয়েছি।"

এক পা-বিহীন এগারো বছরের রাধের সঙ্গে কথা বললাম আমরা।

"তুমি কখনও শাস্তি পাও না কেন? তুমি সব সময় ভালো কামাই করো।"

"চুপ...এটা একেবারে গোপন কথা।"

"ভেবো না। আমরা কাউকে বলবো না।"

"ঠিক আছে, কিন্তু অন্য ছেলেদের এটা জানতে দিও না। জুহুতে এক নায়িকা আছে। ভিলে পারলে'তে থাকে সে। আমার আয় যেদিন কম হয় আমি তার কাছে চলে যাই। সে আমাকে শুধু টাকাই দেয় না, খেতেও দেয়।"

"তার নাম কি?"

"নিলীমা কুমারি। লোকে বলে এক সময় নাকি সে খুব বিখ্যাত ছিলো।"

"সে দেখতে কেমন?"

"যৌবনে মনে হয় বেশ সুন্দরীই ছিলো। তবে এখন তো বুড়ি হয়ে গেছে। সে আমাকে বলেছে তার ঘরের কাজ করার জন্যে লোক দরকার। আমার যদি দুটো পা থাকতো এখান থেকে পালিয়ে তার ওখানে গিয়ে কাজ জুটিয়ে নিতাম।"

সে রাতে আমি স্বপ্ন দেখলাম জুহুর ভিলে পারলে'তে গিয়ে দরজার বেল বাজিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। সাদা শাড়ি পরা লম্বা এক মহিলা দরজা খুললো। বাতাসে তার চুল উড়ছে। মুখটা ভালো মতো দেখা যাচ্ছে না। আমি তাকে কিছু একটা বলার জন্যে মুখ খুলতে যাবো, দেখি মহিলা আমার পায়ের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি তার দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে চেয়ে দেখলাম আমার এক পা নেই।

ঘুম ভেঙে গেলে উঠে দেখি ঘেমে সারা শরীর ভিজে গেছে আমার।

টুণ্ডা হাতের তেরো বছর বয়সী মুলের সাথে আমাদের পরিচয় হলো।

"আমি আমার এই জীবনটাকে ঘেন্না করি," বললো সে।

"তুমি পালিয়ে যাচ্ছো না কেন?"

"কোথায় যাবো? এটা মুম্বাই, আমার গ্রাম নয়। এই বিশাল শহরে মাথা গুঁজে লুকিয়ে থাকার মতো কোনো জায়গা নেই। আরে, সুয়ারেজ পাইপে ঘুমাতে গেলেও তোমার সাথে কারো না কারোর পরিচয় থাকতে হবে। কানেকশান লাগবে। অন্য গ্যাংদের প্রটেকশনও লাগবে তোমার।"

"অন্য গ্যাং?"

"হ্যা। গত মাসে দুটো ছেলে পালালো। কিন্তু তিন দিন পরেই ফিরে এলো তারা। কোনো কাজ খুঁজে পায় নি। ভিকুর গ্যাং তাদের এলাকায় তাকে কাজ করতে দেয় নি। এখানে অন্তত আমরা দু'বেলা খেতে পাই, আশ্রয় পাই। আর মামানের হয়ে কাজ করলে অন্য গ্যাং আমাদের ডিস্টার্বও করে না।"

"আমরা কোনো গ্যাংয়ের সাথে জড়াতে চাই না," বললাম আমি। তারপর কবিরের একটা দোহা আওড়ালাম। *"কবির দাঁড়িয়ে আছে বাজারে, সবার মঙ্গল চায় সে, কারো সাথে নয় দোস্তি কারো সাথে নয় কুস্তি।"*

পাকিস্তান থেকে ইম্পোর্ট করা সিকান্দারের সাথে আমাদের পরিচয় হলো।

মেস্ হলে একটা ফিস্‌ফাস্ চলছে। নতুন একটা ছেলে এসেছে। মুস্তফা তাকে নিয়ে এলে আমরা তার চারপাশে জড়ো হলাম। মুস্তফা খুবই উত্তেজিত। "শাকিল রানার কনসাইনমেন্ট থেকে আজ সকালে তাকে আমরা পেয়েছি," আনন্দে নিজের উরুতে চাপড় মেরে মেরে বললো সে।

ছেলেটার বয়স বারো বছরের বেশি হবে না। তাকে আমরা এমনভাবে স্পর্শ করলাম যেনো সে কোনো খাঁচাবদ্ধ প্রাণী। তাকে দেখে টিভিতে দেখা

বৃটানিয়া বিস্কিটের কিম্ভুতকিমাকার ছেলেটার মতোই মনে হলো। মনে হলো সে কোনো ভিনগ্রহের প্রাণী। চ্যাপ্টা আর থ্যাবড়ানো মাথা, চায়নিজদের মতো চোখ, পাতলা নাক, পাতলা ঠোঁট। মুস্তফা পান্নুজকে বললো, "সে পাকিস্তানের পাঞ্জাবে অবস্থিত শাহ্ দোলার মাজার থেকে এসেছে। এইসব ছেলেদেরকে বলা হয় 'ইঁদুরের বাচ্চা'।"

"তাদের মাথা এরকম হলো কিভাবে?"

"শুনেছি শিশুকালে লোহার রিং পরিয়ে তাদের মাথার স্বাভাবিক বৃদ্ধি থামিয়ে দেয়া হয়। এভাবেই নাকি এইরকম মাথার ডিজাইন করা হয়েছে।"

"মনে হচ্ছে তার সম্ভাবনা খুব ভালো! মামান খুব খুশি হবে," পান্নুজ বললো।

"হ্যা, তা হবে," মুস্তফা বললো সঙ্গে সঙ্গে। "খুবই মূল্যবান জিনিস।"

ইঁদুরের বাচ্চাটাকে দেখে আমার কেন জানি ভাল্লুকের কথা মনে পড়ে গেলো। ফাদার টিমোথির সাথে কনৌট প্লেসে সেরকম একটা জিনিস দেখেছিলাম আমি। তার মালিক গলায় দড়ি বেঁধে বেত দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে খেলা দেখাতে বাধ্য করছিলো। চারপাশে গোল হয়ে খেলা দেখছিলো লোকজন। খুশি হয়ে পয়সাও ছুড়ে মারছিলো তারা। মালিক পয়সাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে আরেকটা খেলা দেখানোর জন্যে ভাল্লুকটাকে বেত দিয়ে পেটালো। ভাল্লুকটার বিষন্ন চোখ দেখে আমি ফাদার টিমোথিকে বলেছিলাম, "ভাল্লুকেরা কি কাঁদে, ফাদার?"

জিতুকে আমি আবিষ্কার করলাম ক্লোজেটে লুকিয়ে থাকা অবস্থায়।

তার হাতে একটা প্লাস্টিক ব্যাগ, যার ভেতরে হলুদ রঙের আঠালো পদার্থ। ব্যাগের মুখ খুলে নাক দিয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিলো সে। তার শরীর থেকে এনামেল পেইন্ট আর আঠার গন্ধ আসছে। সেটা জুতা তৈরির সলিউশন। নিঃশ্বাস টেনে নেবার পরপরই তার চোখ মুখ বদলে গেলো। চোখ দুটো কেমন জানি ঢুলু ঢুলু। তার হাত দুটো কাঁপছে।

"জিতু!...জিতু!" আমি তাকে ঝাঁকালাম। "তুমি কি করছো?"

"বিরক্ত কোরো না তো," নেশাগ্রস্তের মতো কণ্ঠে বললো সে। "আমি বাতাসে ভাসছি। মেঘের উপর ঘুমাচ্ছি।"

তাকে সজোরে থাপ্পর মারলাম। কাশির সাথে কালো রঙের শ্লেষ্মা বের হলো তার।

"আমি এই আঠার নেশায় আসক্ত হয়ে পড়েছি।" আমাকে পরে কোনো এক সময়ে জানালো সে। "আমি মুচির কাছ থেকে এগুলো কিনে নিয়ে আসি।

এতে ক'রে আমার ক্ষুধা চলে যায়। যন্ত্রণা-ব্যথা সব চলে যায়। চোখের সামনে রঙ বেরঙের কতো কিছু দেখি তখন। মাঝে মধ্যে আমার মাকেও দেখি।"

আমি তার কাছ থেকে কিছু আঠা চেয়ে নিলাম। নিঃশ্বাসের সাথে টেনে নেবার পর আমার মাথা ঝিমঝিম করতে শুরু করলো। চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো অনেক ছবি। লম্বা, শাড়ি পরা এক মহিলাকে দেখলাম আমি। তার কোলে একটা বাচ্চা। বাতাসে তার চুলগুলো উড়ছে। বাচ্চাটা হাত দিয়ে মহিলার চুলগুলো সরিয়ে দিলে মুখটা এবার দেখা গেলো। দুটো গুহা সদৃশ ভয়ংকর চোখ দেখতে পেলো সে। বাকাঁনো নাক আর ধারালো দাঁত। সেই দাঁতে লেগে আছে রক্ত। তার চোয়ালের চারপাশের চামড়া ভেদ ক'রে সাদা সাদা পোকা বের হচ্ছে। বাচ্চাটা ভয়ে কেঁপে উঠলে মহিলার কোল থেকে পড়ে গেলো।

এরপর আমি আর কখনও আঠা ব্যবহার করার চেষ্টা করি নি।

এরই মধ্যে আমাদের সঙ্গীত শেখার পরিসমাপ্তি ঘটলো। সেলিমের উন্নতি দেখে মাস্টারজি ভীষণ খুশি। "এখন তুমি গান গাইবার বেলায় নিজেই মাস্টার হয়ে গেছো। একটা মাত্রই শিক্ষা বাকি আছে।"

"সেটা কি?"

"সুরদাসের ভজন।"

"সুরদাস কে?"

"সব ধরণের ভক্তিমূলক গায়কদের মধ্যে তিনি সবচাইতে বেশি বিখ্যাত। প্রভু কৃষ্ণের প্রশংসায় তিনি হাজার হাজার গান বানিয়েছেন। একদিন এক পরিত্যাক্ত কুয়ায় পড়ে গেলে তিনি আর উঠতে পারলেন না। ছয় দিন থাকলেন সেখানে। প্রার্থনা করলেন তিনি। সাত দিনের মাথায় শুনতে পেলেন এক বাচ্চা ছেলে তাকে তার হাত ধরতে বলছে যাতে ক'রে কুয়া থেকে উপরে ওঠা যায়। ছেলেটার সাহায্যে সুরদাস কুয়া থেকে উঠতে পারলেও দেখতে পেলেন ছেলেটা উধাও হয়ে গেছে। বাচ্চা ছেলেটি আর কেউ ছিলেন না, ছিলেন স্বয়ং কৃষ্ণ। এর পর থেকে সুরদাস তার সমগ্র জীবন কৃষ্ণের প্রশংসায় সঙ্গীত রচনায় নিবেদন করলেন। হাতে একতারা নিয়ে তিনি কৃষ্ণের ছেলেবেলার কাহিনী বয়ান ক'রে গান করতে শুরু করলেন।" মাস্টারজি গাইতে শুরু করলো, *"আঁখিয়া হরি দর্শন কি পিয়াসী*—হে প্রভু কৃষ্ণ, তোমাকে দেখার জন্যে আমার দু'চোখ তৃষ্ণার্ত!"

"তার চোখ তৃর্ষ্ণাত কেন?" আমি জানতে চাইলাম।

"তোমাদেরকে কি আমি বলি নি সুরদাস জন্মান্ধ ছিলেন।"

সঙ্গীত শিক্ষার শেষ দিনে মাস্টারজি সেলিমকে দিয়ে সুরদাসের একটি ভজন নিখুঁতভাবে গাওয়ালো। আমার ভালো লাগলো না। মামানের ছেলেদের সাথে কথাবার্তা বলে দারুণ ক্ষেপে আছি আমি। যদিও আমরা শিশুরা হলাম ক্ষুদ্র ঈশ্বর, কিন্তু মামানের ছেলেগুলো মনে হলো বিশেষভাবেই বঞ্চিত আর তাদের রয়েছে অনেক অনেক প্রতিবন্ধকতা।

পান্নুজ ঘরে এসে মাস্টারজির সাথে নীচু স্বরে কথাবার্তা বলে পকেট থেকে কিছু টাকা বের ক'রে মাস্টারজির হাতে তুলে দিলো। তারপর তারা দু'জন কথা বলতে বলতে ঘরের বাইরে চলে গেলো। আমরা দু'জন রয়ে গেলাম ঘরে।

"দিল্লি ছাড়াটা আমার উচিত হয় নি," সেলিমকে আমি বললাম। "তোর তো তবু ভালো একজন গায়ক হবার সম্ভাবনা আছে কিন্তু আমার কিছু হবে না।"

ঠিক তখনই আমার চোখ গেলো মেঝেতে পড়ে থাকা একশ রুপির একটা নোটের দিকে। পান্নুজের পকেট থেকে পড়েছে নিশ্চয়। আমার ইচ্ছে হলো ওটা তুলে পকেটে রেখে দেই, কিন্তু সেলিম আমার হাত থেকে ওটা কেড়ে নিয়ে জানালো নোটটা পান্নুজকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। সুতরাং আমরা করিডোরের শেষ মাথায় অবস্থিত মামানের যে অফিসঘর আছে সেখানে গেলাম। পান্নুজ আর মুস্তফা ওখানেই আছে এখন।

দরজার কাছে আসতেই শুনতে পেলাম ভেতর থেকে মামান আর পান্নুজের কথাবার্তা।

"তো মাস্টারজি তার শিক্ষা দেয়া শেষ ক'রে কী বললো?"

"সে বলেছে বড়টা একেবারে অকাল কুষ্মাণ্ড। তবে ছোটোটার সম্ভাবনা বেশ ভালো। সে নাকি জীবনেও এতো ভালো ছাত্র পায় নি।"

"তাহলে তুমি মনে করছো তাকে দিয়ে আমাদের দিনে তিনশ রুপি আয় হবে?"

"আরে তিনশ কিসের? সে যখন গান গায় জাদুর মতো মনে হয়, আর তার চেহারাটা দেখেছেন? কে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে? আমি তো বলবো খুব সহজেই তাকে দিয়ে চারশ রুপি কামানো যাবে। আমরা ভালো দান মেরেছি, মামান।"

"আর অন্য ছেলেটা? লম্বাটার কথা বলছি।"

"কে জানে? বানচোতটা হয় প্রতিরাতে একশ রুপি আয় ক'রে এনে দেবে নয়তো খালি পেটে থাকবে।"

"ঠিক আছে। তাদেরকে তাহলে সামনের সপ্তাহে ট্রেনিংয়ের জন্যে পাঠিয়ে দাও। আজ রাতেই তাদের কাজটা সারতে হবে। রাতের খাওয়ার পর।"

এইসব কথা শুনে ভয়ে আমার রক্ত হিম হয়ে গেলো। সেলিমের হাত ধরে দৌড়ে আমাদের ঘরে চলে এলাম আমরা। তবে যে কথা আমরা শুনেছি সেটা শুনেও সেলিম কিছুটা দ্বিধান্বিত। কিন্তু আমি ঠিকই বুঝতে পেরেছি ব্যাপারটা।

"সেলিম, আমাদেরকে এক্ষুণি এ জায়গা থেকে পালাতে হবে।"

"কিন্তু কেন?"

"কারণ আজ রাতে আমাদের সাথে অনেক খারাপ একটা কিছু করা হবে। রাতের খাওয়ার পরই।"

"আমি বুঝতে পারছি না।"

"কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি। তুই কি জানিস আমাদেরকে সুরদাসের ভজন কেন শেখানো হয়েছে?"

"কারণ সে একজন বিখ্যাত কবি?"

"না। কারণ সে অন্ধ। আজরাতে আমাদেরকেও অন্ধ ক'রে ফেলা হবে যাতে ক'রে লোকাল ট্রেনে গান গেয়ে ভিক্ষা করতে পারি আমরা। আমি এখন নিশ্চিত, এখানকার সব ছেলেদের মামান আর তার লোকেরাই পঙ্গু আর অন্ধ করেছে।"

কিন্তু এ ধরনের ক্রুড়তা সেলিমের কাছে একেবারেই দুর্বোধ্য। সে থেকে যেতে চাইলো।

"তুই একা পালিয়ে যা তাহলে?" আমাকে বললো সে।

"তোকে ছাড়া আমি যাবো না।"

"কেন?"

"কারণ আমি তোকে এখানে রেখে কোনোভাবেই যাবো না।"

সেলিম আমাকে জড়িয়ে ধরলো। পকেট থেকে আমার এক রুপির কয়েনটা বের করলাম। "শোন সেলিম," বললাম তাকে। "তুই তো ভাগ্যে বিশ্বাস করিস, তাই না? তাহলে টস্ ক'রে দেখি কি হয়। হেড পড়লে আমরা পালাবো। টেইল হলে থেকে যাবো, ঠিক আছে?"

সেলিম সায় দিলো। টস্ করলাম কয়েনটা। হেড পড়লো।

অবশেষে সেলিম রাজি হলো মামানের ডেরা থেকে পালাতে। যদিও তার মনে ঘোরতর সন্দেহ। "আমরা কোথায় যাবো? করবো কি? এ শহরের কাউকে তো আমরা চিনি না।"

"আমি জানি কোথায় আমাদের যেতে হবে। মনে আছে রাধে বলেছিলো ঐ অভিনেত্রী নিলীমা কুমারির কথা? তার একজন কাজের ছেলের দরকার। তার বাড়ির ঠিকানা আছে আমার কাছে। কোন্ ট্রেনে ক'রে সেখানে যেতে হয় সেটাও আমি জানি।"

"পুলিশের কাছে গেলে কেমন হয়?"

"তোর মাথা খারাপ হলো নাকি? আরে দিল্লি থেকে কি কোনো শিক্ষা তুই পাস নি? যেখানেই যা, যা খুশি কর, পুলিশের ধারে কাছেও যাবি না। কখনও না।"

আমরা নিচের তলার বাথরুমে আছি। আমার কাঁধের উপর দাঁড়িয়ে আছে সেলিম, তার হাতে একটা ছুরি। হৈ চৈ আর শব্দ শুনতে পাচ্ছি আমরা। জানালার গৃল খোলার চেষ্টা করছি।

"তাড়াতাড়ি কর," দাঁতে দাঁত চেপে বললাম আমি।

উপর তলায় মামানের লোকজন আমাদেরকে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজছে। তাদের ধুপধাপ শব্দে সেলিম আরো বেশি ভড়কে গেলো। আরো জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে সে। আমারও একই অবস্থা। তাদের পায়ের আওয়াজ ক্রমশ আমাদের কাছে চলে আসছে।

"একটা মাত্র স্ক্রু বাকি আছে," বললো সেলিম। "কিন্তু জ্যাম হয়ে আছে। মনে হয় আমি এটা খুলতে পারবো না।"

"প্লিজ...আরেকবার চেষ্টা কর!" আমি তাকে তাড়া দিলাম। "আমাদের জীবন মরণ সমস্যা।"

আমার কথা শুনে সেলিম পুর্ণোদ্যমে খুলতে শুরু করলো। শেষে খুলেও গেলো বোল্টটা। আমাদের শরীর ঢোকার জন্যে জায়গাটা যথেষ্ট। হামাগুঁড়ি দিয়ে বের হলাম দু'জনে। মামানের লোকেরা নিচের তলায় চলে এসেছে। আকাশে পূর্ণ চাঁদ, রাতটা বেশ শান্ত। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলাম আমরা। বাতাসে নারকেলের গন্ধ।

আমরা বসে আছি একটা লোকাল ট্রেনে। ট্রেনটা গুরুগাঁও ছেড়ে চলে যাচ্ছে। রাতের এই সময়টাতে ট্রেনে খুব একটা ভীড় নেই। হাতে গোনা কয়েকজন যাত্রী আছে আমাদের কম্পার্টমেন্টে। পত্রিকা পড়ছে, কার্ড খেলছে কিংবা সরকারের গুষ্টি উদ্ধার করছে তারা। কেউ কেউ পাদও দিচ্ছে সবার অগোচরে।

একজন ভেন্ডার কোক, সেভেনআপ ইত্যাদি নিয়ে সেলিমের সামনে দিয়ে যাবার সময় সেলিম তার তৃষ্ণার্ত ঠোঁট দুটো জিভ দিয়ে চাটতেই ভেন্ডার আশা নিয়ে তার কাছে চলে এলো। মাথা নেড়ে সেলিম নিরাশ ক'রে দিলো ছেলেটাকে।

কিছুক্ষণ পর সাত আট বছরের এক রোগাপটকা ছেলের উদয় ঘটলো আমাদের কম্পার্টমেন্টে। তার হাতে ছড়ি, অন্যহাতে একতারা। তাকে আমরা চিনতে পারলাম না। সে মামানের কোনো ছেলে নয়।

আমাদের থেকে পনেরো ফুট দূরে থাকতেই সে হেরে গলায় সুরদাসের একটা ভজন গাইতে শুরু করলো। *"শুনেছি কৃষ্ণ দুর্বলকে সাহায্য করতে আসে।"*

আমরা দু'জনেই ভুরু কুচকালাম। ছেলেটা যোনো রাডারের মতো অনুসরণ ক'রে আমাদের দিকে আসতে লাগলো। মনে হচ্ছে সে দৃষ্টিহীন চোখ দিয়ে আমাদের দিকে অভিযোগের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। পাঁচ মিনিট ধরে আমরা তার গানে জর্জরিত হলাম। গান শেষে একটা ভিক্ষার পাত্র বের ক'রে সে বাড়িয়ে ধরলো, কিন্তু হাতে গোনা কয়েকজন যাত্রীর কেউই কিছু দিলো না।

আমাদেরকে অতিক্রম করার সময় সেলিম তার পকেটে হাত ঢোকালো। মুঠো করে হাতটা বের করে আমার দিকে অপরাধী দৃষ্টিতে তাকালো সে। নীরবে সায় দিলাম আমি। বিষন্ন মুখে সেলিম দোমড়ানো মোচড়ানো একশ রুপির নোটটা অন্ধ ভিক্ষুক ছেলেটাকে দিয়ে দিলো।

স্মিতা নিজের অজান্তেই কেঁপে উঠলো। "ভাবতেও পারছি না, আজকের যুগে আমাদের দেশে এমন সব নিষ্ঠুর লোকজনও আছে যারা বাচ্চাদের সাথে এরকম আচরণ করে!"

"দুঃখজনক হলেও সত্যি। আমি আর সেলিম যদি ঐ রাতে না পালাতাম তবে আজ আমরা অন্ধ ছেলেটার মতো ট্রেনে ট্রেনে গান গেয়ে ভিক্ষা ক'রে বেড়াতাম," বললাম আমি।

"তাহলে তুমি শেষ পর্যন্ত নিলীমা কুমারির ওখানে কাজ জুটিয়ে নিলে?"

"হ্যা।"

"সেলিমের কি হলো?"

"নিলীমা কুমারি তার জন্যে ঘাটকোপারের চাউলে একটা ঘরের ব্যবস্থা করে দেন।"

"শেষবার না তুমি বললে তুমি একটা ভাট্টিখানায় কাজ করতে? চাউলে

থাকতে তুমি?"

"সেটা নিলীমা কুমারিকে ছেড়ে আসার পর—অথবা বলতে পারেন তিনি আমাদেরকে ছেড়ে চলে যাবার পর।"

"মানে?"

"খুব জলদিই জানতে পারবেন সেটা।"

স্মিতা মাথা দুলিয়ে ডিভিডির রিমোটে 'প্লে' বাটনটা চেপে দিলো।

প্রেম কুমার ক্যামেরার মুখোমুখি। "এখন আমরা চার নাম্বার প্রশ্নে যাবো, যার জবাব দিতে পারলে দশ হাজার রুপি জিতে যাবে আমাদের প্রতিযোগী। এটাও খুব সহজ একটা প্রশ্ন যদি তুমি ভক্তিমূলক গান সম্পর্কে জ্ঞান রাখো তো। মিঃ টমাস আমাদেরকে বলেছিলো সে সব ধর্মেই বিশ্বাস করে। আন্দাজ করা যায় সে তার ভজন ভালো করেই জানে।" আমার দিকে ফিরলো সে। "রেডি?"

"রেডি," জবাবে বললাম আমি।

"ঠিক আছে, চার নাম্বার প্রশ্ন। অন্ধ কবি সুরদাস কোন্ দেবতার ভক্ত ছিলেন? এ) রাম, বি) কৃষ্ণ, সি) শিব নাকি ডি) ব্রহ্মা?"

সঙ্গীত বেজে উঠলো।

"বি! কৃষ্ণ।"

"তুমি কি একশ ভাগ নিশ্চিত?"

"হ্যা।"

চারদিকে ড্রাম বেজে উঠলো। সঠিক জবাবের লেখাটা ভেসে উঠলো পর্দায়।

"একদম ঠিক, একশত ভাগ সঠিক! দশ হাজার রুপি জিতে গেছো তুমি!" প্রেম কুমার চিৎকার ক'রে বললে উপস্থিত দর্শকেরা হাত তালি দিলো। দাঁত বের ক'রে হাসলো প্রেম কুমার। কিন্তু আমি হাসলাম না।

যেভাবে অস্ট্রেলিয়ান ভাষায় কথা বলতে হয়

"নাম, লিঙ্গ আর বয়স, স্যার," ভারি চশমা আর ভীত চোখের আদমশুমারির লোকটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললো। তার হাতে একগাদা ফর্ম।

কর্নেল টেলরের চোখে মুখে বিব্রত হওয়ার ভাব ফুঁটে উঠলো। তার পরনে ক্রিম রঙের লিনেন সুট। গ্রীষ্ম হোক শীত হোক সবসময় তিনি সুট পরে থাকেন। তার দীর্ঘ শরীরে সুটগুলো বেশ মানায়ও। গোলগাল মুখে ভারি গোঁফ আছে তার। চুলগুলো ব্যাক ব্রাশ ক'রে রাখেন তিনি। কর্নেলের পুরো পরিবার এবং চাকরবাকরেরা দরজার বারান্দায় এমনভাবে জমায়েত হয়েছে যেনো গ্রুপ ছবি তুলবে তারা। "আমি কর্নেল চার্লস টেলর, পুরুষ, বয়স ছেচল্লিশ। এ আমার বউ রেবেকা টেলর, বয়স চৌচোল্লিশ।" সোনালী চুলের লম্বা স্কার্ট পরা মিসেস টেলরকে ইঙ্গিত ক'রে বললেন কর্নেল সাহেব। "এ হলো আমাদের ছেলে রনি, পনেরো বছর বয়স।" রনি তার মোবাইল ফোন নিয়ে ব্যস্ত। খুবই লম্বা সে, পরে আছে তার সবসময়কার পোশাক ফেডেড জিন্স আর টি-শার্ট। "আর এ হচ্ছে আমাদের মেয়ে ম্যাগি। সতেরো বছর বয়স।" ম্যাগি খুব লম্বা না হলেও দেখতে বেশ সুন্দর। নীল চোখ আর সোনালী চুল তার। একটা শর্ট স্কার্ট পরে আছে।

কর্নেল টেলর বুক টান ক'রে দম নিয়ে গমগম কণ্ঠে বললেন, "আমি অস্ট্রেলিয়ান ডিফেন্স অ্যাটাশি। আমরা কূটনীতিক, সুতরাং আমার মনে হয় না তোমার এই আদমশুমারিতে আমাদের নাম অন্তর্ভূক্ত করাটা ঠিক হবে। আমাদের বাড়িতে যেসব লোক কাজ করে তাদেরকে তুমি তোমার রিপোর্টে রাখতে পারো। গেটের সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে সে ভাগওয়াতি। আমাদের ড্রাইভার কাম মালি। বায়ান্ন বছর বয়স। শান্তি নামের আমাদের এক ঝি আছে, তার বয়স আঠারোর মতো হবে। মনে হয় এখন সে বাড়িতে নেই। আমাদের বাবুর্চি রামু, পঁচিশ বছর। আর এ হলো টমাস, চৌদ্দ বছর। ঠিক আছে?"

"না, স্যার, আপনার চাকরবাকরদের কিছু প্রশ্ন করতে হবে। নতুন

আদমশুমারিতে অনেক তথ্য নিতে বলা হয়েছে। আজব আজব সব প্রশ্ন! তারা টিভিতে কোন্ প্রোগ্রাম দেখে, কি খায়, কোন্ শহরে ভ্রমন করেছে এমন কি...” একটু নাক সিঁটকিয়ে বললো সে, “কতোদিন পর পর সেক্স করেন তাও জানতে হবে।”

মিসেস টেলর তার স্বামীর কানে কানে কিছু বললেন। “চার্লস, এইসব আজে বাজে কাজে রামু আর টমাস সময় নষ্ট করুক তা আমি চাই না। তুমি কি এই ঝামেলাটা বিদায় করতে পারো?”

কর্নেল সাহেব পকেট থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন। “দেখা মিস্টার, তোমার নাম যাই হোক না কেন, তোমার এইসব প্রশ্নের জবাব দেবার মতো সময় আমার কাজের লোকদের নেই। তো, এই প্যাকেটটা নিয়ে তুমি কেটে পড়ছো না কেন, পরের বাড়িতে চলে যাও, নাকি? আমি নিশ্চিত তুমি তোমার আদমশুমারি থেকে এই চারজনকে খুব সহজেই বাদ দিতে পারবে।”

প্যাকেটটার দিকে তাকিয়ে জরিপকারী লোকটার চোখ চকচক ক'রে উঠলো। “তো...স্যার, আপনি খুব দয়ালু কিন্তু তো আমি ধূমপান করি না। অবশ্য আপনার কাছে যদি *ব্ল্যাক লেবেল* থাকে তো...*রেড লেবেল* হুইস্কি হলেও চলবে, তাহলে আমি চলে যাবো। ঠিকই তো বলেছেন, একশ কোটি লোক থেকে চারজন বাদ পড়লে কি আর এমন ক্ষতি হবে!” বোকার মতো হেসে ফেললো লোকটা।

কর্নেল টেলর নোংরা দৃষ্টিতে তাকালেন লোকটার দিকে। তারপর ড্রইংরুম থেকে জনি ওয়াকারের *রেড লেবেল*-এর একটা বোতল নিয়ে ফিরে এলেন তিনি। “এই নাও, এবার বিদায় হও। আমাদের আর বিরক্ত কোরো না।”

জরিপকারী লোকটা কর্নেলকে স্যালুট দিলো। “চিন্তা করবেন না, স্যার। আগামী দশ বছর আপনার ত্রিসীমানায়ও আসবো না।” খুশি মনে চলে গেলো সে।

মিসেস টেলর খুশি হলেন। হেসে বললেন, “এইসব হারামজাদা ইন্ডিয়ানগুলোকে হুইস্কির বোতল দিলে সব কিছু করতে রাজি হয়ে যায় তারা।”

ভাগওয়াতি গেটের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁত বের ক'রে হাসছে। কী হচ্ছে তার বিন্দুবিসর্গও সে জানে না। কিন্তু সাহেব আর মেম সাহেব যখনই হাসবে সেও হাসবে। রামুও হাসছে। তবে যখনই ম্যাগিকে শর্টস্কার্ট পরতে দেখে তখনই কেবল হাসে।

শুধু আমিই হাসছি না। জানি, আমরা চাকর-বাকরেরা অদৃশ্য সব

লোকজন। পার্টি এবং পারিবারিক অনুষ্ঠানে আমাদের মুখ বন্ধ থাকবে। একটু আড়ালে আবডালে থাকতে হবে। দরকার পড়লেই কেবল উদয় হতে হবে সার্ভ করার জন্যে। কিন্তু নিজ দেশের মাথা গোণার জরিপ থেকে বাদ পড়াটা খুব বেশি পীড়াদায়ক। আর মনেপ্রাণে আমি চাই টেলর পরিবারের লোকজন যেনো নাক সিঁটকিয়ে 'হারামজাদা ইন্ডিয়ান' কথাটি কখনও না বলে। তাদের এখানে কাজ করতে আসার পর এ নিয়ে কথাটা পঞ্চাশবারের মতো শুনলাম। যখনই এই শব্দটা শুনি আমার রক্ত বলক দিয়ে ওঠে। ঠিক আছে, পোস্টম্যান, ইলেক্ট্রিশিয়ান, টেলিফোনের লাইনম্যান এবং এখন জরিপকারী লোকটার হুইস্কির প্রতি দূর্বলতা আছে মানছি, কিন্তু তার মানে তো এই নয় যে, সব ইন্ডিয়ানই মাতাল। একদিন হয়তো এ কথাটা তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে পারবো। কিন্তু আমি এও জানি, এটা আমি করতে পারবো না।

তুমি যখন দিল্লির সবচাইতে অভিজাত এলাকায় থাকবে, তিন বেলা ভালো খাবার খেতে পাবে আর মাস শেষ হলে পাবে দেড় হাজার রুপি, হ্যা, পুরো দেড় হাজার রুপি, তখন তোমাকে এইসব গালি বিনাবাক্য ব্যয়ে হজম করতেই হবে। আর সাহেব-মেম সাহেব যখনই হাসবে সঙ্গে সঙ্গে হাসতে হবে তোমাকেও। বোঝো আর নাই বোঝো তাতে কিছু যায় আসে না!

অবশ্য সত্যি বলতে কি, টেলর পরিবার বেশ দয়ালু। বিশেষ ক'রে আমার সাথে তারা বেশ দয়া দেখিয়েছে। মুম্বাই থেকে এসে কারো দরজার সামনে গিয়ে কাজের কথা বলতেই তোমাকে কাজে নিয়ে নেবে, এমন পরিবার খুব বেশি নেই এই ভূভারতে। তার চেয়েও বড় কথা হলো, আমি তাদেরকে ভুল রেফারেন্স দিয়েছি। কর্নেল ওয়াহ্ কর্নেল টেলরের পূর্বসূরী ছিলেন। আর টেলররা অ্যাংলিকান হওয়ায় ফাদার টিমোথির রোমান ক্যাথলিক চার্চের সাথে তাদের কোনো সম্পর্কও নেই। আমার ভাগ্য বেশ ভালো ছিলো, কারণ ঠিক ঐ সময় কাজের লোকের খুব দরকার ছিলো টেলরদের।

এই পরিবারের সাথে পনেরো মাস থাকাকালীন সময় পাঁচ পাঁচজন কাজের লোককে বরখাস্ত হতে দেখেছি। সবগুলোই করেছেন কর্নেল টেলর নিজে। তিনিই এই বাড়ির কর্তা। যেমন আকাশের উপর একজনই ঈশ্বর থাকেন। কর্নেল সাহেব সব জেনে যান। জগদীশ নামের বাগানের মালি সার চুরি করেছে সে খবর অবশ্যই কর্নেল জেনে যাবেন। ফলাফল পরের দিনই বরখাস্ত। শিলা নামের গৃহপরিচারিকা মিসেস টেলরের ঘর থেকে একটা ব্রেসলেট চুরি করেছে, কর্নেল টেলর সেটাও জানেন। ফলাফল পরের দিনই বরখাস্ত। রাজু নামের বাবুর্চি চুরি ক'রে কর্নেলের হুইস্কি খেয়েছে, কর্নেল সাহেব ঠিকই জেনে গেলেন। পিটিয়ে তাকে চাকরিচ্যুত করা হলো। নতুন

বাবুর্চি অজয় টাকা চুরি করার পরিকল্পনা আঁটলো, এ কথা সে ফোনে আলাপ করলো তার এক বন্ধুর সাথে। ফলাফল পরের দিনই তাকে বরখাস্ত করা হলো, আর তার বন্ধুসহ তাকে গ্রেফতার ক'রে থানায় নিয়ে গেলো পুলিশ। নতুন কাজের মেয়ে বাসন্তি ম্যাগির একটা পোশাক পরেছিলো, ফলাফল, পরের দিনই চাকরিচ্যুতি। কিভাবে কর্নেল সাহেবের আড়ালে এসব ঘটনা ঘটে গেলেও তিনি ঠিকই জেনে যান সেটা একটা রহস্যই বটে।

আমিই একমাত্র টিকে যাওয়া লোক। মানছি, আমিও মাঝে মাঝে মিসেস টেলরের পড়ে থাকা জামা-কাপড়ের পকেটে খুচরা পয়সা সরানোর লোভে পড়তাম, কিংবা ফ্রিজে রাখা সুইস চোকোলেটের দিকে বাড়াতাম লোভি হাত কিন্তু সেই লোভ সংবরণ ক'রে ফেলতাম। কারণ আমি জানি কর্নেল টেলর জেনে যাবেন। তাদের পরিবার আমাকে বিশ্বাস করতো। আমার নামে একটা খৃস্টান অংশ আছে, আর আমি ভালো ইংরেজি বলতে পারি, সেটাও হয়তো একটা কারণ। দু'মাস আগে চাকরিতে যোগ দেয়া শান্তি ছাড়া আমিই হলাম একমাত্র কাজের লোক যে কিনা পরিবারের অন্দরমহলে ঢোকার সুযোগ পায়। শোবার ঘরে ঢোকার অনুমতিও আমার ছিলো। আর একমাত্র আমিই ড্রইংরুমে বসে টিভি দেখতে পারতাম। রয়ের সাথে বসে লিভিংরুমে *নিনেভো* খেলতেও পারতাম মাঝে মধ্যে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি কর্নেলের অফিসে ঢোকার অনুমতি পেতাম না। মাস্টার বেডরুমের পাশেই সেটা ছিলো। বাড়ির সবাই ওটাকে ডেন নামে ডাকতো। একটা বাদামী কাঠের দরজা ছিলো সেই ঘরের, তার সামনে আবার ছিলো লোহার গ্রিল। তিনটি তালা ছিলো তাতে। একটা ইকেক্ট্রিক প্যাড ছিলো দরজার পাশেই। সেটা দিয়ে পাসওয়ার্ড টিপে দরজা খোলা হোতো। কিন্তু পাসওয়ার্ড ছাড়া জোর ক'রে খুলতে গেলে ৪৪০ ভোল্টের বিদ্যুতের শক খেয়ে মারা যেতে হবে। তার পাশে ছোট্ট একটা বাতি। লাল হয়ে জ্বলতে থাকলে বুঝতে হবে ঘরটা বন্ধ আছে। কর্নেল টেলর ঘরে ঢুকলে বাতিটা বদলে নীল হয়ে যেতো। বাড়ির কোনো সদস্যকেই সেই ঘরে ঢুকতে দেয়া হোতো না। মিসেস টেলর, ম্যাগি কিংবা রয়কেও না।

টেলরদের সাথে থাকার কারণে আমার মনে মুম্বাইর যে ভীতিকর অভিজ্ঞতা হয়েছিলো সেটার ট্রমা থেকে আস্তে আস্তে আমি সেরে উঠি। শান্তারাম এবং নিলীমা কুমারি যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠলেও খুব দূরের কোনো স্মৃতি হয়ে উঠলো। প্রথম কয়েক মাস আমি একাই ছিলাম। বাড়ির সামনে কোনো জিপ এলেই মনে করতাম পুলিশের গাড়ি এসেছে বুঝি। ধীরে ধীরে আমার এই ধরা পড়ার

ভয়টা কেটে গেলো। গুড়িয়ার কথাও আমি মাঝে মধ্যে ভাবতাম। ভাবতাম তার কী হয়েছে, কিন্তু মুখ না দেখে দীর্ঘদিন স্মৃতি ধরে রাখাটা খুবই কঠিন কাজ। ধীরে ধীরে সেও আমার অতীতের ডাস্টবিনে হারিয়ে গেলো। কিন্তু সেলিমকে আমি ভুলতে পারলাম না। তাকে ছেড়ে আসার অপরাধবোধে প্রায়শই আক্রান্ত হতাম আমি। সে কেমন আছে ভাবতাম। এখনও কি সে ডাব্বাওয়ালার কাজ করে? তবে তার সাথে যোগাযোগ করা থেকে বিরত থাকতাম। ভয় পেতাম, এতে ক'রে হয়তো পুলিশের কাছে আমার অবস্থানটা জানাজানি হয়ে যাবে।

টেলরদের সাথে থাকার সময় আমি বারবি করা এবং ফন্ডিউ বানানো শিখে গেলাম। হুইস্কি মেশানো, ড্রিংক বানানো, পেগের হিসাব, সব শিখে গেলাম তাদের কাছ থেকে। ক্যানাবেরা থেকে আমদানী করা ক্যাঙ্গারু স্টিক আর কুমিরের মাংসও খেয়েছি আমি। রাগবি, টেনিস আর *অসি রুল্‌স* নামে পরিচিত খেলার ভক্ত হয়ে গেলাম। রয়ের সাথে বসে দেখতাম এসব। এতো কিছুর পরও অস্ট্রেলিয়ান বাচনভঙ্গী নিয়ে আমাকে সমস্যা পড়তে হোতো। প্রতি রাতে নিজ ঘরে বসে অস্ট্রেলিয়ানদের মতো কথা বলার চর্চা করতাম। "গুডে মেইটে, সি ইউ এট এইটে, এট ইন্ডিয়া গেইটে," বলতাম আমি, তারপর হেসে গড়াগড়ি খেতাম।

মিসেস টেলরের সাথে শপিংয়ে যেতে খুব পছন্দ করতাম। নিজের বেশিরভাগ জিনিসই আগে তিনি অস্ট্রেলিয়া থেকে নিয়ে আসতেন। কিন্তু পরবর্তীতে স্থানীয় মার্কেট থেকে কেনাকাটা করতে শুরু করেন তিনি। সবচাইতে ভালো লাগতো যেদিন তিনি সঙ্গে ক'রে রয় আর ম্যাগিকেও নিতেন কিংস মার্টে যাওয়ার জন্যে। এটা হলো বাচ্চাকাচ্চাদের জন্যে পৃথিবীর সবচাইতে বড় স্টোর। জামাকাপড়, খেলনা, বাইক আর ক্যাসেট সবই আছে ওখানে। ম্যাগি এবং রয় জিন্স আর টিশার্ট কিনতো আর আমি বিনে পয়সায় *মেরি গো-রাউন্ড* উপভোগ করতাম মনের আনন্দে।

রয় আর ম্যাগি প্রতি মাসে একটা ম্যাগাজিন পেতো। ওটার নাম ছিলো *অস্ট্রেলিয়ান জিওগ্রাফিক।* আমার মতে এটা দুনিয়ার সেরা পত্রিকা। সুন্দর সুন্দর জায়গায় ছবিতে ভরা থাকতো পত্রিকাটি। অস্ট্রেলিয়ার সব স্থানের উপরেই লেখা আর ছবি থাকতো সেই ম্যাগাজিনে। সেই চৌদ্দ বছর বয়সেই আমার জীবনের লক্ষ্য হয়ে উঠলো মৃত্যুর আগে যে করেই হোক কুইন্সল্যান্ড, তাসমানিয়া আর গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ দেখতে যাওয়া।

টেলরদের সাথে আমার জীবনটা বেশ আরামেই কেটেছে, কারণ আমাকে

খুব একটা কাজ করতে হোতো না। নিলীমা কুমারির বাড়িতে আমি ছিলাম একমাত্র কাজের লোক, কিন্তু টেলরদের আরো তিনজন লোক ছিলো। আবার কাজে কর্মে অন্য তিনজন লোকও অংশ নিতো। রামু ছিলো বাবুর্চি। রান্নাঘরের সব দায়িত্ব তার। শান্তি বিছানাপত্র গোছানো এবং কাপড় ধোয়ার কাজ দেখাশোনা করতো। আমি কেবল ভ্যাকুম করা আর ক্লিনারের কাজ করতাম। মাঝে মধ্যে কর্নেল সাহেবের লাইব্রেরির বইপত্রও মুছতাম। ভাগওয়াতিকে আগাছা সাফ করার কাজে কখনও কখনও সাহায্য করতাম স্বেচ্ছায়। মেইন বাড়ির পাশেই সার্ভেন্ট কোয়ার্টারে থাকতাম আমরা সবাই। একটা বড় আর দুটো ছেটো ঘর ছিলো সেখানে। বড়টাতে ভাগওয়াতি তার বউ নিয়ে থাকতো। দ্বিতীয়টাতে একাই থাকতো শান্তি। আমি আর রামু থাকতাম তৃতীয় ঘরটাতে। আমাদের ঘরের খাট ছিলো দোতলা। আমি ব্যবহার করতাম উপরেরটা।

রামু খুব চমৎকার ছেলে ছিলো। চারমাস আগে জয়েন করেছিলো সে, বেশ ভালো রান্না করতো। তার প্রধান লক্ষ্য ছিলো ফ্রেঞ্চ কুফিংয়ে বিখ্যাত হওয়া। এর আগে সে একটা ফরাসি পরিবারের সাথে কাজ করতো। রামুর শরীর স্বাস্থ্য বেশ ভালো, মুখের গুটি বসন্তের দাগগুলো বাদ দিলে দেখতেও সে বেশ হ্যান্ডসাম। হিন্দী ছবির দারুণ ভক্ত সে। ধনীর মেয়ে গরীবের ছেলের সাথে পালিয়ে যায় এরকম গল্পের ছবি তার বেশি প্রিয়। আমার সন্দেহ হোতো, শান্তি রামুকে নিয়ে ঘোরের মধ্যে আছে। যেভাবে সে রামুর দিকে তাকাতো, চোখ নাচাতো, তাতে ক'রে আমার মনে হোতো রামুকে সে কোনো ইঙ্গিত করছে। রামু অবশ্য শান্তিকে পাত্তা দিতো না, সে ভালোবাসতো অন্য কাউকে। আমাকে দিয়ে সে কসম খাইয়ে বলেছে আমি যেনো সেই নামটা কাউকে না বলি। তাই নামটা আমি বলতে পারছি না। তবে আমি এটা বলতে পারি, মেয়েটা খুব সুন্দর নীল চোখ আর সোনালী চুলের।

আমি সার্ভেন্ট কোয়ার্টারে থাকলেও টেলররা আমাকে তাদের পরিবারের একজন বলেই মনে করতো। যখনই তারা ম্যাগডোনালেল্ড যেতো আমার জন্যে খাবার কিনে আনতো। রয় আর ম্যাগি স্ক্র্যাবল খেলতে গেলে আমাকেও নিয়ে বসতো। রয় টিভিতে ক্রিকেট খেলা দেখার সময় আমাকে আমন্ত্রণ জানাতো তার সঙ্গে বসে খেলা দেখার জন্যে (যদিও অস্ট্রেলিয়া হারলে সে খুব বকাঝকা করতো)। টেলররা যতোবারই হলিডে কাটাতে অস্ট্রেলিয়ায় যেতো আমার জন্যে একটা উপহার নিয়ে আসতো। *আই লাভ সিডনি* লেখা সংবলিত টি-শার্ট কিংবা মজার ডায়লগে লেখা কোনো গেঞ্জি। কখনও কখনও এইসব দয়ামায়া আমাকে কাঁদিয়ে দিতো। যখনই আমি দামি কোনো খাবার কিংবা কোমল পানীয় খেতাম আমার পক্ষে এই হিসেব মেলানোটা খুব কষ্ট হোতো

যে, আমিই কি সেই এতিম ছেলে যে পাঁচ বছর আগে জুভেনাইল হোমে বাসি পচা রুটি খেতো! এক সময় আমি নিজেকে একটি অস্ট্রেলিয়ান পরিবারের সদস্য বলেই ভাবতে শুরু ক'রে দিলাম। রাম মোহাম্মদ টেলর। কিন্তু যখনই কোনো কাজের লোককে বকাঝকা করার সময় কর্নেল টেলর বলতেন, "হারাম জাদা ইন্ডিয়ান," আমার স্বপ্নটা তখন ভেঙে খান খান হয়ে যেতো। নিজেকে তখন মনে হোতো বোকাসোকা এক ছেলে যে কিনা জানালা দিয়ে উঁকি মেরে এমন একটা জগতকে দেখছে যেটা মোটেও তার নিজের নয়।

কিন্তু একটা জিনিস আছে যা আমার। আমার বেতনের টাকা। কিছু বাজে অভিজ্ঞতার কারণে কর্নেল টেলর একজন নাবালক হওয়ার জন্যে আমাকে আমার বেতনের সব টাকা না দিয়ে মাসে মাত্র পঞ্চাশ রুপি ক'রে দিতেন পকেট খরচ বাবদ। আমার চাকরি শেষ হলে বাকি জমানো টাকা আমি পাবো। সেটাও এই শর্তে, আমি যদি ব্যবহার ভালো করি তো। তা না হলে রাজু এবং অজয়ের মতো টাকা পয়সা না দিয়েই পত্রপাঠ বিদায় ক'রে দেয়া হবে। রামু অবশ্য প্রতিমাসে বেতনের টাকা হাতে পায়। তার জমানো আট হাজার রুপি সে তার ঘরের ম্যাট্রেসের নিচে লুকিয়ে রেখেছে। আমার পকেটে মাত্র একশ রুপি। তবে আমার কাছে ছোট্ট একটা লাল রঙের ডায়েরি আছে, তাতে প্রতিমাসে আমার বেতনের টাকার হিসেব রাখা হয়। আজকের দিন পর্যন্ত টেলরের কাছে আমার পাওনা ২২৫০০ রুপি। এই পরিমাণ পাওনা টাকার জন্যে আমি লোভি হয়ে পড়লাম। প্রতি রাতে আমি *অস্ট্রেলিয়ান জিওগ্রাফিক*-এ দেখা দর্শনীয় স্থানগুলো ভ্রমণ করার স্বপ্ন দেখি। রামুর লক্ষ্য অবশ্য আমার চেয়ে অনেক বড়। তার স্বপ্ন শ্বেতাঙ্গ এক মেয়েকে বিয়ে করে সিডনিতে হানিমুন করা। তারপর ফরাসি খাবারের একটা চেইন রেস্টুরেন্ট চালু করবে সে।

ভাঙ্গারি জিনিস কেনার লোক, মানে কাবারিওয়ালা এসেছে। ছয় মাসের জমানো সমস্ত ম্যাগাজিন আর সংবাদপত্র বিক্রি ক'রে দিচ্ছেন মিসেস টেলর। ওগুলোর মোট বিক্রয়মূল্য হবে দশ হাজার রুপির মতো। তবে আমরা প্রতি কিলো পনেরো রুপি ক'রে বিক্রি করছি। রামু এবং আমি বান্ডিলে করে সব পত্রিকা নিয়ে এলাম। কাবারিওয়ালা ওগুলো মাপতে শুরু করলে রয় এসে হাজির হলো। "কি হয়েছে?" তার মাকে জিজ্ঞেস করলো।

"কিছু না। আমরা সব পুরনো পত্রিকা বিক্রি ক'রে দিচ্ছি," মহিলা জবাবে বললেন।

"তাই নাকি?" বলেই সে বাড়ির ভেতর চলে গেলো। ফিরে এলো *অস্ট্রেলিয়ান জিওগ্রাফিক* ম্যাগাজিনের ত্রিশটি কপি হাতে নিয়ে। আমি তো যারপরনাই হতবাক। এইসব ম্যাগাজিন বিক্রি ক'রে দেবার কথা রয় কি ক'রে ভাবতে পারলো? কিন্তু আমি কিছু বলার আগেই কাবারিওয়ালা ওগুলো মেপে জানালো, "মোট ছয় কেজি। এগুলোর জন্যে আমি নব্বই রুপি দেবো," রয়কে সে বললো। বিনিময় হয়ে গেলো। আমি ফিরে এলাম আমার ঘরে।

কাবারিওয়াল কাজ শেষে বাড়ির বাইরে যেতেই আমি পথে থামালাম তাকে। "আমি ক্ষমা চাইছি, কিন্তু মেম সাহেব এসব ম্যাগাজিন ফেরত চাইছেন," তাকে বললাম।

"খুব খারাপ কথা," সে কাঁধ ঝাঁকালো। "আমি তো ওগুলো কিনে ফেলেছি। ঐসব ম্যাগাজিন খুবই ভালো মানের। ভালো দাম পাবো বলেই কিনেছি।" শেষ পর্যন্ত তাকে পুরো একশ রুপি দিয়ে সবগুলো *অস্ট্রেলিয়ান জিওগ্রাফিক* ম্যাগাজিন কিনে নিলাম। ওগুলো এখন আমার। ঐ দিন রাতে ঘরে বসে আমি পত্রিকাগুলো বার বার পড়লাম, দেখলাম চমৎকার সব দৃশ্যের ছবি।

এই মাসে আরেকটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটলো। স্টার টিভিতে *স্পাইক্যাচার* নামে নতুন একটা সিরিয়ালের সম্প্রচার শুরু হলো। এই সিরিয়ালটি অস্ট্রেলিয়ায় ঝড় তুললো ভীষণ। ৮০'র দশকের ঘটনা এটি। এক অস্ট্রেলিয়ান পুলিশ অফিসারের জীবন কাহিনী, যে কিনা স্পাই ধরে। তার নাম স্টিভ নোলান। কর্নেল টেলর এই অনুষ্ঠানে আসক্ত হয়ে পড়লেন। প্রতি বুধবার রাতে তিনি তার ডেনে চলে যেতেন অনুষ্ঠানটি দেখার জন্যে। কেবল ডিনার করতেই বের হতেন। টিভি রুমে বসে ফস্টার বিয়ার পান করতে করতে স্টিভ নোলানের হাতে ধরা পড়া নোংরা বিদেশীদের অপদস্থ হতে দেখতেন, যারা কিনা রাশিয়ান কেজিবি'র কাছে গোপন তথ্য বিক্রি করে থাকে। আমি সিরিয়ালটা পছন্দ করতাম গাড়ি দিয়ে পশ্চাদধাবন করা আর মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ স্টান্ট এবং অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির জন্যে। আমি স্টিভ নোলানের গাড়িটা খুব পছন্দ করতাম। লাল টকটকে একটা ফেরারি গাড়ি ছিলো সেটা, রকেটের মতো পথঘাট দাবড়িয়ে বেড়ায় গাড়িটা।

গ্রীষ্মে টেলরের গার্ডেন পার্টি একটা সাধারণ নিয়ম ছিলো। তবে আজকের পার্টিটা একটু বিশেষ ধরণের। অস্ট্রেলিয়া থেকে একজন জেনারেলের আগমনে তারই সম্মানার্থে এই পার্টি। হাইকমিশনার স্বয়ং উপস্থিত থাকবেন। রামু এবং আমি, আর একবার এমন কি ভাগওয়াতিকেও ডেকে পাঠানো হলো—সাদা এবং সোনালী বোতামের ইউনিফর্ম পরানো হলো আমাদের সবাইকে।

আমাদের হাতে সাদা দস্তানা, পায়ে কালো জুতা, মাথায় সুন্দর পাগড়িও পরানো হলো। এরকম পাগড়ি সাধারণত বিয়ের দিন জামাইরা পরে থাকে। ব্যতিক্রম হলো, আমরা কোনো জামাই নই, আমরা হলাম নিতান্তই জমকালো কয়েকজন ওয়েটার।

অতিথিরা আসতে শুরু করলো। চমৎকার লনে কর্নেল টেলর তাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন হাসিমুখে। বারবিকিউ পটে রামু চিকেন, মাটন আর শূকরের মাংস গৃল করতে ব্যস্ত। সিলভার ট্রে'তে ক'রে ভাগওয়াতি সবাইকে ককটেল পরিবেশন করছে আর আমি বারের দায়িত্বে আছি। রান্নাঘরে ভীষণ ব্যস্ত শান্তি। এমনকি সেও তার নিয়মিত পোশাক শাড়ি খুলে স্মার্ট স্কার্ট পরে আছে আজ।

অতিথিদের বেশির ভাগই শ্বেতাঙ্গ আর তারা এসেছে অন্যান্য অ্যাম্বাসি থেকে। হাতে গোনা কয়েকজন ইন্ডিয়ানও আছে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কয়েকজন পদস্থ কর্মকর্তা আর সাংবাদিক। শ্বেতাঙ্গরা কিংফিশার বিয়ার এবং ককটেল পান করছে। কিন্তু ভারতীয়রা যথারীতি কেবল *ব্লাক লেবেল* গলাধকরণ ক'রে যাচ্ছে।

গার্ডেন পার্টির কথাবার্তা দুটো ক্যাটাগরিতে বিভক্ত হয়ে পড়লো। ভারতীয়রা ক্রিকেট আর রাজনীতি নিয়ে মশগুল। কূটনীতিক আর বিদেশীরা তাদের চাকর বাকর, সহকর্মী এবং তীব্র গরম নিয়ে গল্পগুজব করছে। "অনেক গরম। আমি তো মনে মনে চাইছি তারা যেনো ছুটি ঘোষণা দিয়ে দেয়।" "আমার গৃহপরিচারিকা বাগানের মালির সাথে ভেগে গেছে।" "আজকাল ভালো কাজের লোক পাওয়া কঠিন। এইসব হারামজাদা চাকরবাকরদের বেশিরভাগই চোরবাটপার।"

হাইকমিশনার এলেন প্রধান অতিথি জেনারেলকে সঙ্গে নিয়ে। ফিস্‌ফাস্ শুরু হয়ে গেলো উপস্থিত সবার মাঝে। মিসেস টেলর তো পারলে একেবারে হাই কমিশনারের গায়ের উপর ঢলেই পড়েন। সবার সাথে অতিথিরা হাত মেলালো। চুম্বন বিনিময় হলো। কর্নেল টেলরকে খুব তৃপ্ত দেখাচ্ছে। ভালোমতোই চলছে পার্টিটা।

এগারোটার মধ্যে সব অতিথি চলে গেলো! কেবলমাত্র দু'জন ভারতীয় সাংবাদিক আর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন পদস্থ কর্মকর্তা জীবন কুমার বসে বসে নিজেদের দশ নাম্বার পেগ হুইস্কি গিলে যাচ্ছে। মিসেস টেলর তাদের দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকালেন। "চালর্স, তুমি এইসব হারামজাদাদের কেন যে আমন্ত্রণ জানাও বুঝি না," স্বামীকে বললেন তিনি। "তারা সব সময়ই সবার শেষে যায়।"

কর্নেল টেলর সহমর্মিতা জানিয়ে শব্দ করলেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের লোকটা বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলো। "মিঃ টেলর, আমি কি আপনার সাথে

একটু কথা বলতে পারি?" চিৎকার ক'রে সে বললে কর্নেল টেলর তার কাছে ছুটে এলেন।

মাঝরাত পেরিয়ে গেলেও আমি এবং রামু ঘুমাই নি। আমি শুনতে পাচ্ছি সে তার বিছানায় উল্টে পাল্টে এ পাশ ওপাশ করছে। "কি হয়েছে, রামু? ঘুমাতে পারছো না?"

"কিভাবে ঘুমাবো, টমাস? আমার ডার্লিং আমাকে পাগল করে তুরেছে।"

"তুমি একটা বোকা। কতোবার বলেছি, এসব আজব চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে? কর্নেল টেলর যদি জানতে পারেন, তবে তোমাকে জবাই করবেন।"

"আরে প্রেমিক-প্রেমিকাদের এতো ভয় থাকতে নেই। যেকোনো ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকতে হয় তাদেরকে। তবে এখন, অন্তত আমার কাছে এক টুকরো ভালোবাসা রয়েছে।"

"কি? তোমার কাছে কি আছে?" আমি আমার বিছানা থেকে নিচে নেমে এলাম।

"হিসসস...তুমি যদি কসম খাও কাউকে বলবে না তাহলেই কেবল তোমাকে সেটা আমি দেখাবো।"

"ঠিক আছে। কসম খেয়ে বলছি। এবার আমাকে দেখাও।"

রামু তার বালিশের নীচ থেকে লাল রঙের একটা কাপড় বের করলো। নাকের কাছে নিয়ে সেটার গন্ধ নিলো সে। আমিও ওটা থেকে পারফিউমের গন্ধ পেলাম।

"এটা কি? আমাকে দেখাও।"

রামু কাপড়টার ভাঁজ খুললো। লাল রঙের একটা ব্রা। আৎকে উঠে আমি লাফ দিতেই খাটের সাথে মাথায় আঘাত পেলাম।

"হায় ঈশ্বর! এটা তুমি কোত্থেকে পেলে? আমাকে বোলো না জিনিসটা ঐ মেয়ের?"

"আরে তুমি নিজেই দ্যাখো না," আমার হাতে তুলে দিলো ব্রাটি।

ব্রা'টা উল্টেপাল্টে দেখলাম আমি। মনে হলো খুব দামি। লেশের তৈরি। ছোট্ট একটা ট্যাগ আছে, তাতে লেখা আছে *ভিক্টোরিয়া সিক্রেট*।

"ভিক্টোরিয়া কে?" তাকে জিজ্ঞেস করলাম।

"ভিক্টোরিয়া? আমি কোনো ভিক্টোরিয়া ফিক্টোরিয়াকে চিনি না।"

"এই ব্রা'টা তো ভিক্টোরিয়ার। এটাতে তার নামও লেখা আছে। কোত্থেকে

এটা পেয়েছো?"

রামু হতভম্ব। "কিন্তু...আমি তো এটা ম্যাগির ঘর থেকে চুরি করেছি।"

"হায় ঈশ্বর! রামু! তুমি তো জানোই বাচ্চাদের ঘরে যাবার অনুমতি তোমার নেই। এবার তুমি ভালো সমস্যায় পড়বে।"

"টমাস, তুমি কিন্তু কসম খেয়েছো, কাউকে কিছু বলবে না প্লিজ।"

চুপচাপ আমি আমার বিছানায় উঠে শুয়ে পড়লাম। রামুও নাক ডাকতে শুরু করলো কিছুক্ষণ পর। আমি জানি রামু ঐ সোনালী চুলের মেয়েটাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু আমি দেখছি পুলিশের জিপ এসে থেমেছে আমার ঘরের সামনে। আমি নিশ্চিত, রামু সমস্যায় পড়তে যাচ্ছে, কারণ কর্নেল টেলর সবই জানেন। সবই জেনে যাবেন।

দু'দিন পর ঠিকই একটা জিপ লালবাতি জ্বালাতে জ্বালাতে কম্পাউন্ডে প্রবেশ করলো। জিপ থেকে গগল্‌স পরা এক ইন্সপেক্টর নেমে ড্রইংরুমের দিকে পা বাড়ালো বেশ উদ্ধত ভঙ্গীতে। এই লোকটা ত্যাগী নামে পরিচিত। এর আগে সে অজয়কে তুলে নিয়ে গিয়েছিলো। সে রামুর খোঁজ করলে কনস্টেবলররা রান্নাঘর থেকে তাকে ধরে নিয়ে এলো। তাকে সঙ্গে ক'রে রামুর ঘরে ঢুকলো পুলিশ। ঘরটা আমারও, সুতরাং তাদের পেছন পেছন আমিও ঢুকলাম। তারা বালিশ আর বিছানার নিচ থেকে রামুর জমানো টাকা আর দামি একটা নেকলেস খুঁজে পেলো। এই জিনিসটা এখানে কিভাবে এলো, কোনো ধারণাই নেই আমার। তবে আমি জানি রামু চোর নয়। এরপর কনস্টেবল আমার বিছানা তল্লাশী করতে শুরু করলো। তারা *অস্ট্রেলিয়ান জিওগ্রাফিক* ম্যাগাজিনের কপি, টি-শার্ট আর চাবির রিং খুঁজে পেলো, সেই সঙ্গে খুঁজে পেলো দোমড়ানো মোচড়ানো লাল টকটকে একটি ব্রা। এটা আমার এখানে কিভাবে এলো জানি না।

আমাকে কর্নেল টেলরের সামনে একজন আসামীর মতো দাঁড় করানো হলো। "কর্নেল সাহেব, আপনি একজনের কথা বলেছিলেন, আমরা হীরার নেকলেসসহ সবই খুঁজে পেয়েছি, তবে দেখুন, এই পিচ্চি হারামজাদার কাছ থেকে আমরা কি পেয়েছি! এইসব ম্যাগাজিন নিশ্চয় আপনার ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে চুরি করা হয়েছে—" মেঝেতে ম্যাগাজিনগুলো ফেলে বললো সে। "আর দেখুন কি পেয়েছি তার কাছ থেকে," ইন্সপেক্টর লাল রঙের ব্রা'টি পতাকার মতো নাড়াতে লাগলো।

ম্যাগি কাঁদতে শুরু করেছে। আর রামুকে দেখে মনে হচ্ছে সে বুঝি মূর্ছা যাবে। কর্নেল টেলরের চোখে খুন চেপে গেলো।

"আহ্! তুমিও টমাস?" মিসেস টেলর বললেন। একেবারে ভড়কে গেছেন তিনি। তারপর রেগেমেগে আমার গালে চার পাঁচটা চর-থাপড় মারলেন।

"ব্লাডি ইন্ডিয়ান। তোমরা সবাই একরকম। অকৃতজ্ঞ কোথাকার। আমরা তোমাদেরকে খাওয়াই পরাই আর এই হলো তোমাদের প্রতিদান!"

কর্নেল টেলর আমাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এলেন। "না, রেবেকা!" বউকে বললেন তিনি। "টমাস ভালো ছেলে। এই জিনিসটা ঐ হারামজাদা রামু তার বিছানায় লুকিয়ে রেখেছিলো, আমার কথা বিশ্বাস করো। আমি সব জানি।"

কর্নেল টেলর আবারো প্রমাণ করলেন তিনি এমন একজন মানুষ যিনি সব জানেন। আমাকে তিনি বাঁচিয়ে দিলেন। আমি আমার ম্যাগাজিনগুলোও ফিরে পেলাম। রামু কেঁদে কেঁটে স্বীকার করলো ব্রা চুরির কথা, কিন্তু নেকলেস চুরি করে নি বলে বার বার অনুনয় বিনয় করলো। শান্তিকে এ ব্যাপারে অভিযুক্ত করলো সে। কিন্তু এসবে কোনো ফল হলো না। ইন্সপেক্টর রামুকে জিপে তুলে নিয়ে গেলো সেই সঙ্গে কর্নেল টেলরের দেয়া একটা *ব্লাক লেবেল* হুইস্কির বোতলও। দাঁত বের ক'রে হেসে ইন্সপেক্টর বললো, "থ্যাংক ইউ, কর্নেল। যখনই দরকার পড়বে আমাকে জানাবেন। আপনার সেবা করতে পারলে আমার ভালোই লাগবে। এই যে আমার কার্ডটা রাখুন।"

কর্নেল টেলর কার্ডটা তাচ্ছিল্যভরে হাতে নিয়ে ড্রইংরুমের সাইড টেবিলে রেখে দিলেন।

বাড়িতে তুমুল উত্তেজনা। ম্যাগির জন্যে একটা পোষা কুকুর আনা হয়েছে। খুবই ছোটো আর লোমশ একটা কুকুর। দেখতে একেবারে পুতুলের মতো। তার ডাক শুনে ঘেউ ঘেউ না বলে মিউ মিউ বলেই বেশি মনে হবে। ম্যাগি ঠিক করলো তাকে রোভার নামে ডাকবে।

বাড়িতে আবারো তুমুল উত্তেজনা। নতুন এক বাবুর্চি এসেছে। তার নাম জয়। রামুর অর্ধেক রান্নাও সে জানে না। ফ্রেঞ্চ কুকিংয়ের নামও সে শোনে নি। তারপরও চাকরিটা সে পেয়েছে কারণ তার বয়স বেশি, বউ বাচ্চা আছে। আশেপাশের এক গ্রামেই তারা থাকে। আমি আমার ঘরটা আবারো একজনের সাথে শেয়ার করবো বলে মোটেও খুশি নই। দোতলা খাটে ঘুমানোটা আমি বেশ উপভোগ করছিলাম। একদিন উপরে ঘুমাই তো অন্যদিন নিচে।

দেখা মাত্রই জয়কে আমার দারুণ অপছন্দ হলো। তার চোখ দুটো কুতকুতে। গোপনে সে সিগারেট খায় কারণ টেলর হাউজে সিগারেট নিষিদ্ধ। আমার সাথে সে এমন ব্যবহার করতে লাগালো যেনো আমি তার চাকর। "এই, তোর জীবনের লক্ষ্য কি?" জুভেনাইল হোমের শিক্ষকদের মতো জানতে

চাইলো সে।

"নিজের একটা ফেরারি গাড়ি থাকা," মিথ্যে বললাম। "আপনারটা কি?"

একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোয়ার রিং ছেড়ে বললো, "একটা গ্যারাজ খুলতে চাই। তবে অনেক টাকা দরকার হবে। আমার ধনী এক বন্ধু আছে। অমর বলেছে দেড় লাখ রুপি জোগার করতে পারলে বাকিটা সে নিজেই দেবে। আচ্ছা, এইসব ফিরিঙ্গির কাছে কতো টাকা আছে বলে মনে করিস তুই?"

আমি কিছুই বললাম না। সুতরাং সেই প্রথম সপ্তাহ থেকেই মিঃ জয় ডাকাতি করার পরিকল্পনা আঁটতে শুরু করে। ভালো যে সে জানে না এই বাড়ির কর্তা হলেন সব জানা এক লোক। তবে খুব জলদিই এটা বুঝতে পারবে সে।

কর্নেল টেলর ভোর বেলায় পার্শ্ববর্তী লোধি গার্ডেনে মর্নিংওয়াকের সময় রোভারকে নিয়ে বের হতে শুরু করলেন। কিন্তু দিল্লির সরকার পোষা প্রাণীর মূলসূত্রের জন্যে জরিমানা প্রথা চালু করলে সঙ্গে ক'রে আমাকেও নিয়ে যেতে শুরু করলেন তিনি। আমার কাজ হলো কুত্তার বাচ্চাটার সুইপারগিরি করা। কাজটা খুবই জঘন্য লাগলো আমার। ভাবুন, সেই ভোর সাড়ে পাঁচটায় উঠে কুত্তাটাকে হাগামুতা করিয়ে কর্নেলের সাথে লোধি গার্ডেনে যাওয়া। আর জানোয়ারটা এমন যে, এক দুই মিনিট পরপরই হাগামুতা করে। লোধি গার্ডেনে পুরনো অনেক স্থাপত্য আছে। একটা মনুমেন্টের রাম বারা গুমবার। ঠিক গার্ডেনের মাঝখানে সেটা। সকাল বেলা পুরো গার্ডেন জগারদের দখলে থাকে। লক্ষ্য করলাম কর্নেল টেলর মাঝে মধ্যেই আমার চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে যেতেন। আমি তখন রোভারকে নিয়ে বসে থাকতাম তার জন্যে। আমি কৌতুহলী হয়ে উঠলাম। এক সকালে রোভারকে বেঞ্চের সাথে বেঁধে কর্নেলকে অনুসরণ করলাম তার পিছু পিছু। দেখতে পেলাম কর্নেল সাহেব বারা গুমবার পেরিয়ে বায়ে মোড় নিলেন। ঘন ঝোঁপের আড়াল থেকে দেখলাম তিনি ইন্ডিয়ান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সেই লোকটার সাথে সাক্ষাত করছেন। এই লোকটাই গার্ডেন পার্টিতে এসেছিলো।

"মিঃ কুমার, আপনি কি জানেন গত রাতে আপনাকে আমি আপনার বাড়ি থেকে সাউথ এক্স হল পর্যন্ত অনুসরণ করেছি, আর আপনি সেটা ঘুণাক্ষরেও ধরতে পারেন নি?" বললেন কর্নেল টেলর।

জীবন কুমার ঘেমে উঠলো। তাকে একটু নার্ভাসও মনে হলো আমার। "ওহ্, আমি খুবই দুঃখিত, কর্নেল সাহেব। ভবিষ্যতে আমি আরো বেশি সতর্ক থাকবো। আমি জানি লোকজন আমাদেরকে দেখছে না।"

"অবশ্যই, মিঃ কুমার। কিন্তু আপনি যদি এভাবে ঢিলেঢালা আর অসতর্ক থাকেন তবে সামনাসামনি সাক্ষাতগুলো করা সম্ভব হবে না। একটা সহজ নিয়ম মনে রাখবেন আপনার পেছনে যে লেগে আছে তাকে দ্বিধায় ফেলে দিন, দেখবেন সে আর আপনার টিকিটাও খুঁজে পাবে না। এর মানে হলো সরাসরি নিজের গন্তব্যে যাবেন না। পথ, গাড়ি বদলাবেন। খামোখাই কোনো দোকানে ঢুকে পড়বেন। বের হবেন অন্য পথ দিয়ে। আপনার পেছনে লেগে থাকা টিকটিকি বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে। এভাবে করলে আপনাকে অনুসরণ করা কঠিন হয়ে যাবে।"

"ঠিক আছে, কর্নেল সাহেব। মনে থাকবে। এখন আমাকে ভালো খবরটা বলতে দিন। মনে হচ্ছে এতোদিন ধরে আপনি যা চাচ্ছিলেন সেটা আপনাকে দিতে পারবো। চৌদ্দ তারিখ শুক্রবার বালসন এক্স-এর পেছনে কারপার্কে দেখা করুন। জায়গাটা খুব নিরিবিলি থাকে। রাত আটটা বাজে, ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে।"

মিটিং শেষ হয়ে গেলে আমি দ্রুত রোভারের কাছে ফিরে এলাম।

চৌদ্দ তারিখ শুক্রবার আমার চোখ কান খোলা রাখলাম। কর্নেল টেলর সকাল বেলা তার স্ত্রীকে বললেন ম্যাকগিল নামের নতুন কমার্শিয়াল অ্যাটাশিকে সন্ধ্যার পর কয়েকটি জায়গায় নিয়ে যেতে হবে। সুতরাং বাড়ি ফিরতে তার বেশ দেরি হবে। "তুমি রাতের খাবার খেয়ে নিও, রেবেকা।"

"ভালোই হলো। হাইকমিশনারের বউ আমাকে বৃজপার্টির জন্যে বলেছিলো। তাহলে আমিও আজ বাইরে যাচ্ছি," মিসেস টেলর বললেন।

দুইয়ে দুইয়ে চার ক'রে নিলাম আমি। মিটিংয়ের ব্যাপারে কর্নেল কেন তার বউকে মিথ্যে বললেন? আমার সন্দেহ বেড়ে গেলো। মিসেস টেলরের জন্যে খুব দুঃখ হলো আমার।

রামুর পরে এলো রয়ের পালা। কর্নেল টেলর তাকে বিছানায় জড়িয়ে ধরে শান্তিকে চুমু খাওয়া অবস্থায় ধরে ফেললেন। শান্তি তার মৃত মায়ের নামে কসম খেয়ে বললো যে, তার আর রয় *বাবার* সাথে উল্টাপাল্টা কিছু হয় নি। এই প্রথমবার তাকে চুমু খেয়েছে সে। আর সেটাও ভুলক্রমে। সবই অরণ্যে রোদন। শান্তিকে বরখাস্ত করা হলো। তবে তার প্রাপ্য বেতন সহকারে। রয়কে আচ্ছা মতো পেটানো হলো ব্লাডি ইন্ডিয়ানদের সাথে ফষ্টিনষ্টি করার জন্যে। রয়ের বেলায়ও কিডস মার্টের কেনাকাটা বন্ধ হলো। আমি ঠিক করলাম

পরবর্তী দশ দিন ম্যাগির ঘরে ঢুকে ঘরদোড় সাফ করবো না। বাড়তি সতর্কতা হিসেবে আর কি!

যদি করতাম তাহলে হয়তো ম্যাগিকে রক্ষা করতে পারতাম। কারণ রয়ের ঘটনার দু'সপ্তাহ পরেই ম্যাগি নিজের ঘরে সিগারেট খাওয়ার অপরাধে কর্নেল সাহেবের হাতে ধরা পড়লো। ম্যাগি জোর দিয়ে অস্বীকার করলেও টেলর সাহেব মেয়ের আলমিরার ভেতর থেকে এক কার্টন সিগারেট বের ক'রে আনলেন। ওগুলো ছিলো খালি প্যাকেট। কিডস মার্টে ম্যাগিরও শপিং বন্ধ হয়ে গেলো।

বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, দু'মাস পরে কর্নেল সাহেব অন্য আরেকজনকে হাতেনাতে ধরলেন। তার স্ত্রী। মিসেস রেবেকা টেলর অ্যাম্বাসির কারো সাথে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন। "কুত্তির বাচ্চা!" শোবার ঘরে চিৎকার ক'রে বউকে বললেন কর্নেল। "তুই আর তোর ঐ প্রেমিককে আমি বুঝিয়ে দেবো।" চর থাপ্পড় আর জিনিসপত্র ভাঙচুরের শব্দ পেলাম। সেই রাতে মিসেস টেলর ডিনার করতে নিচে এলেন না। ম্যাগি আর রয়ও তাদের বাবার সাথে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখলো। মিসেস টেলরের প্রতি সহমর্মিতা না দেখিয়ে আমি পারলাম না। তার স্বামী তার অবৈধ প্রণয়ের ঘটনা আবিষ্কার করেছেন কিন্তু তিনি নিজের স্বামীর নোংরা সব গোমড় সম্পর্কে কিছুই জানেন না। আমি চাইলাম কর্নেল টেলর সম্পর্কে সব বলে দিতে। কিভাবে তিনি নিরিবিলি পার্ক এলাকায় জীবন কুমারের সাথে দেখা করেন, কিন্তু যে নিজে কাঁচের ঘরে বসবাস করে সে তো আর অন্যকে ঢিল ছুঁড়তে পারে না। আমি এও ভয় পেতে শুরু করলাম, এই সবজান্তা লোকটা হয়তো এটাও জেনে যাবে আমি শান্তারামকে রেলিং থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছি। এমন কি তিনি হয়তো এমন কিছুও জেনে যাবেন আমার সম্পর্কে যা আমি নিজেও জানি না।

টেলর পরিবারে যখন এইসব ঘটছে তখন জয়কে নিয়ে আমার এাহি এাহি অবস্থা। তার রান্নাবান্না খারাপ থেকে জঘন্য অবস্থায় উপনীত হয়েছে। এমনকি বাড়ির কুকুরটা পর্যন্ত তার খাবার খেতে অনীহা প্রকাশ করতে শুরু ক'রে দিলো। তার গ্যারাজ সম্পর্কিত প্যাচাল শুনে শুনে আমার কান ঝালাপালা হবার জোগার। আমি তার ব্যাপারে কর্নেল টেলরের কাছে নালিশ করতে যখন মনস্থির করেছি ঠিক সে সময় খবর এলো কর্নেল সাহেবের বৃদ্ধ মা মারা গেছেন। সবাই বিষন্ন। এই প্রথম আমরা জাঁদরেল মিলিটারি অফিসারের নরম একটা হৃদয়ের পরিচয় পেলাম। "আমরা সবাই এক সপ্তাহের জন্যে দেশে

যাচ্ছি," জয়কে তিনি বিষন্ন কণ্ঠে বললেন। "বাড়িতে তালা মারা থাকবে। তুমি আর টমাস বাইরে খেয়ে নিও।" ম্যাগি আর রয়ও কাঁদলো। মিসেস টেলরের দু'চোখ লাল হয়ে গেলো শোকে। স্বাভাবিকভাবেই ভাগওয়াতিও কাঁদছে। এমন কি আমারও দু'চোখ ছলছল ক'রে উঠলো। একমাত্র সবার অলক্ষ্যে একজনই মুচকি হাসি হাসলো। আর সে হলো জয়।

সেই রাতেই জয় টেলর হাউজে তালা ভেঙে ঢুকে পড়লো। অন্য কোনো ঘরে না গিয়ে সোজা ঢুকলো কর্নেলের অফিসে। প্রথমে সে মেইন সুইচ বন্ধ করে তালা কেটে ফেললো। কাঠের দরজাটা লাথি মেরেই খুলতে সক্ষম হলো সে।

একটা তীব্র আর্তনাদ শুনে আমি ঘুম থেকে জেগে উঠে রাত তিনটা বাজে জয়ের কীর্তিকলাপ আবিষ্কার করলাম। অফিসের ভেতরেই পেলাম তাকে। দেয়ালে মাথা ঠুকছে সে। "এই বানচোতগুলো রাজার হালে থাকলেও ঘরে এক পয়সাও রাখে না," দাঁত খিচিয়ে বললো জয়।

"জয়, তুমি একটা বোকা, কি করেছো জানো?" চিৎকার ক'রে বললাম।

"যা করতে এসেছিলাম তাই করেছি। আমি একজন পেশাদার চোর। তিহার জেলে আট বছর কাটিয়েছি। ভেবেছিলাম এতো সিকিউরিটি, ঘরে না জানি কতো টাকা-পয়সা রেখে দিয়েছে। এখন তো দেখছি ফুটা পয়সাও নেই। ছয় মাসের পরিশ্রম একেবারে জলে গেলো। ঠিক আছে, আমি ইলেক্ট্রিক লাইন চালু ক'রে কেটে পড়ছি। এই ভিসিডি প্লেয়ার আর টিভিরুম থেকে থ্রি-ইন-ওয়ানটা নিয়ে যাচ্ছি। ফালতু জিনিস। কিন্তু আমার পেশাকে তো আর অমর্যাদা করতে পারি না। আমি চলে যাবার পর তুই পরিষ্কার করিস। যদি পুলিশে খবর দেবার চেষ্টা করিস, তোর হাড্ডি মাংস আমি এক ক'রে দেবো।"

জয় চলে যাবার পর ঘরটার চারপাশে তাকালাম। আজব আজব সব যন্ত্র পাতিতে ঠাঁসা ছোট্ট সানফ্লাওয়ার ফুলের মতো দেখতে মাইক্রোফোন। চোখের মতো দেখতে মিনি ক্যামেরা। প্যাডে লেখা আছে 'সিফার'। কতোগুলো অর্থহীন সংখ্যা আর অক্ষর। কিছু বইও আছে *দি আর্ট অব এসপিওনেজ, অ্যাসেনশিয়াল অব এ গুড কাউন্টার এজেন্ট, স্পাই ফর ডামিস*। কিছু ফাইল আছে, যার উপর লেখা 'টপ সিক্রেট' এবং 'ইওর আইজ অনলি।' বিভিন্ন ধরনের ড্রইং। একটাতে লেখা আছে, 'অ্যাডভান্স টেকনোলজি ভেসেল নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর ডিজাইন।' আরো আছে কতোগুলো মিনি ভিএইচএস টেপ। লেবেলগুলোর দিকে খেয়াল করলাম। বর্ণানুক্রমভাবে সাজানো আছে : অজয়, ভাগওয়াতি, এইচ.সি. জীবন, জোন্স, ম্যাগি, ম্যাকগিল, রাজ, রমেশ, রেবেকা, রয়, শান্তি, স্টুয়ার্ট এবং টমাস। ড্রয়ারে লুকিয়ে রাখা একটা ভিডিও

প্লেয়ার আছে। কম্পনরত হাতে আমি আমার টেপটা ঢোকালাম প্লেয়ারে। আমার ঘরের ছবি ভেসে উঠলো টিভি পর্দায়। দেখলাম বিছানায় শুয়ে আছি আমি। আমার লাল ডায়রিতে লিখছি। কথা বলছি রামুর সাথে। ঘুমাচ্ছি। আমি টেপটা সামনে পিছনে ক'রে দেখলাম শান্তারামকে দেখা যায় কিনা। এপর মিসেস টেলরের টেপটা চালু করলাম। নিজের বিছানায় বসে আছেন তিনি। ভীতু ভীতু পায়ে এক লোক ঘরে ঢুকে তার হাতটা ধরলো। আমি কেবল তাকে পেছন থেকে দেখতে পাচ্ছি। লোকটা মিসেস টেলরকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো বার কয়েক। আচম্‌কা দরজায় নক হতেই লোকটা ঘুরে গেলো। ভয়ে আর বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম আমি। ইনি তো স্বয়ং হাইকমিশনার! টেপটা বের ক'রে জায়গা মতো রেখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। ভাবলাম এই ঘরেও একটা গোপন ক্যামেরা থাকতে পারে। এবার বুঝলাম কর্নেল সাহেব কি ক'রে সব জানতেন। পুরো বাড়িতে এবং সম্ভবত হাই কমিশনে গোপন ক্যামেরা বসিয়ে রেখেছেন। তিনি একজন স্পাই। তবে আমি কোনো স্টিভ নোলান নই। মাসে ১৬০০ রুপি মাইনা পাওয়া এক লোক। যার মোট পাওনা ৪৩৫০০ রুপিতে গিয়ে ঠেকেছে। আমার লাল ডায়রিতে তা লেখা আছে। আমি সেই টাকাগুলো চাই। টাকাগুলো শুধু ডায়রির হিসেবেই থাকবে সেটা আমার কাম্য নয়। সুতরাং আমি আমার মুখ বন্ধ রাখবো। আর সাহেব মেমসাহেব যখনই হাসবে আমিও হাসবো তাদের সঙ্গে।

কর্নেল টেলরকে মোবাইল ফোনে ফোন করলাম। "স্যার, আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে ক্ষমা চাইছি। বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। জয় ভিসিডি প্লেয়ার আর থ্রি-ইন-ওয়ান নিয়ে গেছে। সে আপনার অফিসের দরজা ভেঙে ঢুকেছিলো।"

"কি?"

"জি স্যার। আমি দুঃখিত, স্যার।"

"শোনো টমাস। আমি চাই তুমি এই কাজগুলো করো। এক্ষুণি আমার অফিসটা নিরাপদ ক'রে ফেলো। ভাঙা তালা সরিয়ে যেকোনো তালা লাগিয়ে দাও। ঘরে ঢোকার কোনো দরকার নেই। কাউকে সেখানে ঢুকতে দেবে না। পুলিশকেও খবর দেবে না। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পুলিশ ডাকবে না। ওকে? অ্যালার্ম যদি বাজে তবে কি-প্যাডে ০০০৭ নাম্বারটা পাঞ্চ ক'রে দেবে। বুঝেছো? তাহলে অ্যালার্ম বাজা বন্ধ হয়ে যাবে। আমি আগামীকালই দিল্লিতে চলে আসছি। আমি আসার আগ পর্যন্ত আমার অফিসে কাউকে ঢুকতে দেবে না। বুঝেছো, কি বললাম?"

"জি স্যার।"

নিজের মায়ের শেষকৃত্য বাদ দিয়েই কর্নেল টেলর দিল্লিতে ফিরে এলেন পরের দিন। বাড়ি এসেই সোজা ঢুকলেন নিজের অফিসে। সব দেখে হাফ ছেড়ে বাঁচলেন তিনি। "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। এই ঘর থেকে কোনো কিছু খোয়া যায় নি। ভালো কাজ করেছো, টমাস। আমি জানতাম তোমার উপর নির্ভর. করা যায়।"

* * *

পরবর্তী ছয়মাস আমার জীবন আবার আগের মতোই চলতে লাগলো। নতুন একজন বাবুর্চিকে ভাড়া করা হলো যে কিনা তিহার জেল থেকে হাজার হাজার মাইল দূরেও ছিলো না। নিজের পরিবারের এক বিয়েতে অনুমতি ছাড়া গাড়ি ব্যবহার করার অভিযোগে ভাগওয়াতিকে বরখাস্ত করা হলো। ম্যাগির নতুন বয়ফ্রেন্ড জেমস্‌কে পাকড়াও করা হলে তাকে এ বাড়ির ত্রিসীমানার মধ্যে আসতে নিষেধ করা হলো। মাদকদ্রব্য নেবার সময় রয় ধরা পড়ে গেলে আচ্ছামতো পিটুনি দেয়া হলো তাকে। মিঃ এবং মিসেস টেলর পুণরায় কথা বলতে শুরু করলেও বেশ শীতল ভাব বজায় রইলো তাদের মধ্যে। আর আমার ধারণা কর্নেল টেলর নির্জন কোনো স্থানে জীবন কুমারের সাথে দেখা সাক্ষাত অব্যাহত রাখলেন।

সারা দিন আমি একটা ফোনের জন্যে অপেক্ষায় আছি। জেমস ম্যাগিকে ফোন করবে। আমাকে ম্যাগি বলে দিয়েছে তার বাবা ফোনটা তোলার আগেই যেনো আমি সেটা ধরি। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে ফোনটার রিং বাজলো। সঙ্গে সঙ্গে আমি সেটা তুলে নিলেও বুঝতে পারলাম টেলর সাহেব আমারও আগে সেটা তুলে নিয়েছেন। "হ্যালো," বললেন তিনি।

অন্যপাশ থেকে জীবন কুমার বললো, "আগামীকাল আমার সাথে দেখা করুন। ইন্ডিয়া গেটের কাছে কোয়ালিটি আইসক্রিম শপের সামনে। আমার কাছে ডিনামাইটের মতো বিস্ফোরক তথ্য রয়েছে।"

"বেশ," বলেই কর্নেল টেলর ফোনটা রেখে দিলেন।

টেলর সাহেব ফস্টার বিয়ার নিয়ে টিভিতে *স্পাইক্যাচার* অনুষ্ঠানটি দেখছেন। স্টিভ নোলান তার ঘনিষ্ঠ এক বন্ধুকে কমিউনিস্টদের পক্ষে গুপ্তচর বৃত্তি করার অপরাধে পাকড়াও করেছে। খুব মুষড়ে পড়েছে সে বন্ধুর বিশ্বাস ঘাতকতায়। একটা বারে বসে আছে বিষন্ন মুখে। বারটেন্ডার তাকে বলছে, "এ দুনিয়াটা খুবই নোংরা একটা জায়গা। কিন্তু কেউ যদি ধোয়ামোছা করতে রাজি

না হয় তবে পুরো দেশটা নর্দমা হয়ে যাবে।" কথাটা শুনে স্টিভ সিদ্ধান্ত নিলো বন্ধু হলেও তার বিরুদ্ধে সে ব্যবস্থা নেবে। কোনো মাফ নেই। লাল রঙের ফেরারিতে করে সেই কমিউনিস্ট স্পাইয়ের বাড়িতে চলে গেলো সে। "তুমি মানুষ ভালো হলেও খারাপ একটা কাজ করছো," বন্ধুকে বলে অস্ত্র হাতে তুলে নিলো। "বন্ধুত্ব খুবই বিরাট ব্যাপার। কিন্তু তার আগে দেশ। আমি দুঃখিত।" কথাটা বলেই গুলি ক'রে হত্যা করলো নিজ বন্ধুকে।

* * *

পরের দিন রাতে দশটার দিকে পুলিশের একটা জিপ এসে থামলো টেলর সাহেবের বাড়ির সামনে। রামুকে যে ইন্সপেক্টর গ্রেফতার করেছিলো সে আর সঙ্গে একজন পুলিশ কমিশনার। কর্নেল টেলর তাদের সঙ্গে। দশ মিনিটের মধ্যে হাই কমিশনারও এসে পৌছালেন। তাকে খুব মর্মাহত দেখাচ্ছে। "কি হয়েছে?" পুলিশ চিফকে তিনি বললেন। "কর্নেল টেলরকে কেন *পারসোনা নন গ্রাটা* আখ্যায়িত করা হয়েছে? ফরেন অফিস তাকে কেন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দেশ ছাড়তে বলছে?"

"ইওর এক্সিলেন্সি, আমাদের কাছে প্রমাণ আছে আপনার অফিসার তার কূটনৈতিক শিষ্টাচার বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত আছেন। তাকে দেশ ছাড়তেই হবে," পুলিশ চিফ জবাবে বললেন।

"কিন্তু তার বিরুদ্ধে অভিযোগটা কি?"

"আমরা তাকে হাতে নাতে কিছু টপসিক্রেট দলিল দস্তাবেজসহ গ্রেফতার করেছি। এইসব ডকুমেন্ট উনি আমাদের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের জীবন কুমার নামের এক কেরাণীর কাছ থেকে নিয়েছেন।"

কর্নেল টেলরের মুখটা ফ্যাকাসে। মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন ড্রইংরুমের মাঝখানে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন হাই কমিশনার। "আমার দীর্ঘ জীবনে এই প্রথম আমার অধীনস্থ কোনো অফিসার *পারসোনা নন গ্রাটা* হলো। তবে আমার কথা বিশ্বাস করুন, চালর্স কোনো স্পাই নয়। কিন্তু আপনারা যখন বলছেন তাকে দেশ ছাড়তে হবে, সে দেশ ছাড়বে।" তারপর তিনি পুলিশ চিফকে এক পাশে ডেকে নিয়ে বললেন, "মিঃ চোপরা, অনেক বছর ধরে আমি আপনাকে অনেক বোতল *ব্লাক লেভেল* হুইস্কি পাঠিয়েছি। আপনি কি সেই কথাটা মনে রেখে আমাকে একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন?"

"অবশ্যই দেবো।"

"এমনিই জানতে চাচ্ছি আর কি। আপনারা কি ক'রে জানতে পারলেন চার্লস আজকে মিটিং করতে যাচ্ছে? কুমার নামের লোকটা কি আপনাদের খবর দিয়ে রেখেছিলো?"

"কী যে বলেন। জীবন কুমার খবর দিতে যাবে কেন? ঘটনা বরং উল্টো। আপনাদের মধ্যেই কেউ একজন সেটা দিয়েছে। সে ইন্সপেক্টর ত্যাগিকে ফোন ক'রে বলেছে ইন্ডিয়া গেটের কাছে কর্নেল টেলর গোপন কিছু ডকুমেন্ট নিতে যাচ্ছেন।"

"আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। আপনারা কি ক'রে বুঝলেন লোকটা অস্ট্রেলিয়ান?"

ইন্সপেক্টর ত্যাগি সামনে এগিয়ে এলো। "মিঃ অ্যাম্বাসেডর, তার উচ্চারণই বলে দিয়েছে সেটা, লোকটা বলেছে, '*গুডে মেইটে, গো টু ইন্ডিয়া গেইটে, টুনাইট এট এইটে।*' বুঝতেই পারছেন, এরকম উচ্চারণ একজন অস্ট্রেলিয়ান ছাড়া আর কার হবে?"

পরের দিনই কর্নেল টেলর একা দিল্লি ছাড়লেন। মিসেস টেলর আর বাচ্চারা পরে যাবে। আমিও টেলরদের ছেড়ে যাচ্ছি। তিনটি চাবির রিং, ছয়টি টি-শার্ট, ত্রিশটি *অস্ট্রেলিয়ান জিওগ্রাফিক* ম্যাগাজিন সহকারে। আর সেই সঙ্গে ৫২০০০ রুপি। একেবারে কড়কড়ে নতুন নোটের।

রয় উদভ্রান্তের মতো আচরণ করছে। ড্রাগ নেয়ার পর থেকেই তার অধঃপতনের শুরু। ম্যাগি জেমসকে টাটা জানালো। মিসেস টেলরকে নিয়ে আমি চিন্তিত নই। হাই কমিশনারের সাথে তিনি ভালোই থাকবেন। আর আমার কথা যদি বলেন, আমি মুম্বাই চলে যাচ্ছি সেলিমের সাথে দেখা করতে। এটা হবে দারুণ!

স্মিতা তার হাত ঘড়িতে তাকালো। একটা ত্রিশ বাজে। "আরো বলবো?" বললাম আমি।

"এছাড়া কি আমাদের আর কোনো উপায় আছে?" তার জবাব। "আগামীকালের মধ্যেই তারা তোমার বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করবে।" 'প্লে' বাটনে চাপ দিয়ে বললো সে।

আরেকটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে আছি আমরা। প্রেম কুমার তার ডেস্কে বসে আমার দিকে চেয়ে বললো, "মিঃ টমাস, তুমি জানো তোমার সৌভাগ্যের সমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে। আমি বাজি ধরে বলতে পারি এরপরের প্রশ্নের জবাব

তুমি দিতে পারবে না। সুতরাং তোমার লাইফ বোটের একটা ব্যবহার করার জন্যে প্রস্তুত থেকো।"

সিগনেচার টিউন বাজতে শুরু করলে আমার দিকে আবারো ফিরলো প্রেম কুমার। "আমরা এবার পঞ্চাশ হাজার রুপির জন্যে পাঁচ নাম্বার প্রশ্নে যাবো। প্রশ্নটি কূটনৈতিক জগতের। যখন কোনো সরকার বিদেশী কূটনীতিককে *পারসোনা নন গ্রাটা* হিসেবে ঘোষণা দেয় এখন তার অর্থ কি দাঁড়ায়? এ) কূটনীতিকটি খুবই সম্মানিত, বি) কূটনীতিকের সময় সীমা বাড়ানো উচিত, সি) কূটনীতিক খুবই কৃতজ্ঞ একজন লোক, নাকি ডি) কূটনীতিক মহাশয় অগ্রহণযোগ্য? আমার প্রশ্নটা কি বুঝতে পেরেছো, মিঃ টমাস?"

"হ্যা," জবাবে বললাম আমি।

"ঠিক আছে। তাহলে জবাব দাও। তোমার দুটো লাইফবোটই কিন্তু অক্ষত আছে। কি করবে তুমি?"

"ডি।"

"কি বললে?"

"বললাম ডি। কূটনীতিক মহাশয় অগ্রহণযোগ্য।"

"আন্দাজে বললে নাকি? মনে রেখো ভুল হনে কোনো টাকাই পাবে না। তবে ইচ্ছে করলে জবাব না দিয়ে চলেও যেতে পারো, তাহলে অন্তত যা জিতেছো তা পকেটে নিয়ে যেতে পারবে।"

"আমি জানি সঠিক জবাব হলো ডি।"

দর্শকদের মধ্যে ফিস্‌ফাস শোনা গেলো।

"তুমি কি একশত ভাগ নিশ্চিত?"

"হ্যা।"

ড্রামের বাজনা বেজে উঠলো। সঠিক জবাবের লেখাটা ভেসে উঠলো পর্দায়।

"একদম সঠিক জবাব! পঞ্চাশ হাজার রুপি জিতে গেছো তুমি!" প্রেম কুমার বললো। দর্শক উঠে দাঁড়িয়ে হাত তালি দিতে শুরু করলো সমানে। প্রেম কুমার কপালের ঘাম মুছে বললো, "বলতে বাধ্য হচ্ছি, অসাধারণ! আজ রাতে, মিঃ টমাসকে দেখে মনে হচ্ছে সে বুঝি সবই জানে।"

নিজের বোতাম সামলে রাখো

"খালাস! শেষ," আপন মনেই বললাম আমি। "আর কোনো হুইস্কি দেয়া যাবে না, বার বন্ধ হয়ে গেছে এখন। বাসায় চলে যান।"

"না-না-না। পিলিজ, এ কথা বোলো না। আরেট্টু দাও। লাস্ট পেগ," কাস্টমার লোকটি অনুনয় ক'রে খালি গ্লাসটা বাড়িয়ে দিলো। ঘড়িতে তাকিয়ে দেখলাম বারোটা চল্লিশ। টেকনিক্যালি রাত একটার আগে বারটা বন্ধ করা হয় না।

বিরক্ত হয়ে আমি ব্লাকডগের বোতলটা তুলে নিলাম। "একশ রুপি দিন," তাকে বললাম। লোকটা পকেট থেকে দোমড়ানো মোচড়ানো নোটটা বের ক'রে আমার হাতে দিলে তার খালি গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে দিলাম।

"ধন্যবাদ, বারটেন্ডার," এক ঢোক পান করেই টেবিলে আছাড় মেরে রাখলো গ্লাসটা। টেবিলে থাকা সব কিছু পড়লো মেঝেতে আর বলাই বাহুল্য গ্লাসটাও ভেঙে গেলো। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সে ঘুমিয়ে পড়বে। আমাকে কেবল তার সৃষ্ট ধ্বংসাবশেষ পরিস্কারই করতে হবে না, একটা ট্যাক্সি ডেকে তাকে বাড়িতেও পাঠাতে হবে এখন। তার কাছ থেকে আগেই ড্রিংকসের টাকা নেয়াটা ভালো হয়েছে। এই কাস্টমারের কাছ থেকে কোনো বখশিস পাওয়া দুরাশা মাত্র।

এর এই অবস্থার জন্যে অনেকাংশে আমি নিজেও দায়ি। এই কাস্টমারের মধ্যে যেকোনো সময় আউট হয়ে যাবার লক্ষণ ছিলো স্পষ্ট। তবে আমি ভেবেছিলাম আরো এক পেগ হয়তো সে টানতে পারবে। যথারীতি আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো।

জিমি'স বার অ্যান্ড রেস্টুরেন্টে দু'মাস ধরে কাজ করলেও আমি বুঝতে পারি না কোন্ কাস্টমারের কতোটুকু সক্ষমতা রয়েছে। অবশ্য আমি নিজে নিজে মাতালদের একটা ক্যাটাগরি তৈরি করেছি। আমার তালিকায় সবার উপরে আছে ঘোড়ারা। এরা যতো মদই গিলুক কথাবার্তা পর্যন্ত স্পষ্ট থাকবে। কিছুই বোঝা যাবে না। এরপর আছে গাধারা। দু'তিন পেগ গিলেই আবোল

তাবোল কথা বলবে তারা, আবেগ তাড়িত হয়ে পড়বে। এমনকি কান্নাকাটিও করবে। তাদের পরে আছে কুত্তারা। এরা যতো খাবে ততোই মাতাল হবে, হাউকাউ আর মারামারি করবে। তাদের কেউ কেউ আবার রোজির সাথে অসদাচরণও ক'রে থাকে। তাদেরও নিচে আছে ভাল্লুকের দল। মদ পেটে যেতেই গভীর ঘুমে ঢলে পড়বে তারা। সবার নিচে অবস্থান করছে শূয়োরের দল। তারা শেষ পেগটা গলা দিয়ে ঢোকাতে না ঢোকাতেই বমি ক'রে ভাসিয়ে দেবে। এই শ্রেণী বিভাগটা একেবারে নিশ্চিদ্র নয়। আমি এমন কাস্টমারও দেখেছি যারা ঘোড়ার মতো শুরু ক'রে শূয়োরে রূপান্তরিত হয়। আবার কুত্তারা ভাল্লুকেও পরিণত হয় কখনও কখনও। ভাগ্য ভালো এই কাস্টমারটি শূয়োরের মতো না হয়ে ভাল্লুকের মতো পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে।

শেষ মাতালের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে ঘড়িতে তাকালাম। একটা দশ বাজে। রোজি আর তার বাবা গোয়া'তে ছুটি কাটাতে যাওয়ার পর থেকেই আমাকে প্রায় প্রতিরাতে একটা দেড়টার পর ধারাবি বস্তির ছোট্ট খুপরিতে ফিরে যেতে হচ্ছে। এটা অংশত আমার নিজেরই দোষ। আমি যদি ম্যানেজারকে বলতাম আমি মদ মিক্স করতে জানি না। কোন্‌টার সাথে কি মেশাতে হয়, কতোটুকু দিতে হয় কিছুই আমি জানি না, তাহলে আজ আমার এ পরিণতি হোতো না। বারটেন্ডার আলফ্রেডের অনুপস্থিতিতে আমাকেই সেই দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে এখন।

জিমি'স বার অ্যান্ড রেস্টুরেন্টটি দক্ষিণ মুম্বাইর সবচাইতে ভালো খাবার রাখে। খাবারগুলো ভালো হলেও দাম বেশ সস্তা। সব ধরণের কাস্টমারই এখানে ছুটে আসে। রাস্তার দিন মজুরের ঠিক পাশের টেবিলে কোনো সরকারী পদস্থ কর্মকর্তাকে দেখতে পেলে আপনি অবাক হবেন না। ম্যানেজার আমাদেরকে বলে দিয়েছে কাস্টমারদের সাথে যতো বেশি পারা যায় কথা বলতে। কারণ মদখোররা যতো কথা বলে ততো বেশি পান করে। রোজির বাবা, ঢুলুঢুলু চোখের আলফ্রেড ডিসুজা এ কাজটি বেশ ভালো মতোই করে। সে হলো এখানকার বারটেন্ডার। এখানে আগত বেশির ভাগকেই সে নামে চেনে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাদের সাথে বসে আড্ডা দেয়। তাদের কথা শোনে। সেই সাথে গিলতে থাকে গ্লাসের পর গ্লাস। রোজি নিজেও খুব দ্রুত বার গার্ল হয়ে উঠেছে। টাইট আর লো-কাটের ব্লাউজ, সেই সাথে শর্ট স্কার্ট পরে বারে বসে সে। মাঝে মধ্যেই উপুড় হয়ে কোনো কিছু নেবার ভান ক'রে কাস্টমারদের বিনোদিত করে। আর তার বহুমূল্যবান অংশটি দেখতে পেয়ে অনেক কাস্টমারই সস্তা মদের বদলে দামি মদের অর্ডার দিয়ে থাকে। কখনও কখনও তার এই কৌশলটা তাকে ঝামেলায়ও ফেলে দেয়। কিছু বাজে

কাস্টমার তাকে সস্তা নারী ভেবে একটু বেশি বাড়াবাড়ি করতে উদ্যত হয়। তখন আমাকেই হস্তক্ষেপ করতে হয়, এগিয়ে গিয়ে নিরস্ত করতে হয় কাস্টমারকে।

মি: আলফ্রেড মনে করে রোজি আর আমার মধ্যে একটা নটখট চলছে। বাজ পাখির মতো আমার উপর চোখ রাখে লোকটা। তার ধারণা একদমই ভুল। রোজি খুবই চমৎকার মেয়ে। ছোটো খাটো আর বিশাল বক্ষার। যেভাবে সে মাঝে মধ্যে আমার সাথে চোখ নাচিয়ে কথা বলে তাতে আমার মনে হয় আমাকে কিছু ইঙ্গিত করার চেষ্টা করছে সে। তবে আমার মস্তিষ্ক এইসব ইঙ্গিতপূর্ণ সিগনাল গ্রহণ করতে সক্ষম নয়। এটা একজন মানুষের স্মৃতিতে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। নিতা। আগ্রার ডাক্তার বলেছেন, আঘাত থেকে সেরে উঠতে তিন চার মাস লাগবে তার। আর আমি এও জানি শ্যাম আমাকে কখনই তার সাথে দেখা করতে দেবে না। এজন্যেই আমি মুম্বাইতে ফিরে এসেছি। এখন বসে বসে আগ্রার জাবর কাটি। তবে এই শহরে আমার নিজের স্মৃতি থেকেও তো আমি পালাতে পারি নি। অতীতের স্মৃতি প্রতি মুহূর্তে আমাকে তাড়িয়ে বেড়ায়। ব্যর্থ জ্যোর্তিবিদ শান্তারাম আমাকে পথেঘাটে বিদ্রূপ ক'রে বেড়ায় সারাক্ষণ। অভিনেত্রী নিলীমা কুমারি লোকাল ট্রেন থেকে আমাকে ডাক দেয়। আর এ শহরের প্রতিটি বিলবোর্ড থেকে আমার বন্ধু সেলিম আমাকে চেয়ে চেয়ে দেখে। তবে সচেতনভাবেই আমি ঠিক করেছি সেলিমের সাথে কোনো রকম যোগাযোগ করবো না। আমার এই পাগলপারা জীবনের পাগলামীপূর্ণ পরিকল্পনার সাথে তাকে জড়ানোর কোনো ইচ্ছে আমার নেই।

আমি মুম্বাইর ধারাবি নামক বিশাল একটা বস্তিতে থাকি। টিনের ছাদ আর বেড়ার দেয়াল। যখনই পাশ দিয়ে ট্রেন যায় আমার ঘরটা কাঁপতে শুরু করে। কোনো ধরণের স্যানিটেশন কিংবা সুপেয় পানির ব্যবস্থা সেখানে নেই। তবে ধারাবিতে আমি একা নই। দুশ' হেক্টর জমিতে আমার মতো লক্ষ লক্ষ লোকের বাস এই ধারাবিতে। শহরের ডোবা-নালা অংশের এই বস্তিটি অবস্থিত। পোকামাকড়ের মতো বসবাস করি আমরা। মারা যাই পশুপাখির মতো। দেশের সবখান থেকেই লোকজন এখানে এসে জড়ো হয়। তবে বিহার, উত্তর প্রদেশ, তামিলনাড়ু এবং গুজরাট থেকে বেশি লোক আসে। স্বপ্নের শহর মুম্বাইয়ে তারা আসে একবুক আশা নিয়ে। তবে সেই স্বপ্ন খুব জলদিই দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়। যেমনটি হয়েছে আমার বেলায়।

তবে ধারাবি একেবারে জঘন্য জায়গা নয়। দিল্লির জুভেনাইল হোম

আমাদেরকে হীন থেকে হীনতর করেছিলো, কিন্তু ধারাবির বিশাল আকার আমাদেরকে অনেক ক্ষুদ্র ক'রে তোলে। নদর্মাগুলো মশায় পরিপূর্ণ। জঘন্য আর দুগর্ন্ধযুক্ত এখানকার পায়খানাগুলো। তাও আবার সম্প্রদায় ভেদে আলাদা আলাদা। যেখানে সেখানে আবর্জনার স্তূপ। তবে অভূক্ত লোকজনের জন্যে এই ধারাবি হলো তাদের মাথা গোঁজার আশ্রয়।

মুম্বাইর আলোকজ্জ্বল শহরতলীতে, যেখানে হাজার হাজার বহুতল ভবন মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, অত্যাধুনিক শপিং মলগুলো জৌলুসের বহির্প্রকাশ ঘটাচ্ছে, ধারাবির মতো বস্তি সেখানে ক্যান্সারতুল্য। এই শহর অবশ্য নিজের এই বিষ ফোঁড়াটাকে অগ্রাহ্য করে সময় পার করছে। ফলে এটা অবৈধই রয়ে গেছে। ধারাবির সবগুলো খুপড়িই 'অবৈধ স্থাপনা।' যেকোনো সময় উচ্ছেদের শিকার হতে পারে এগুলো। কিন্তু এখানকার জীবন যুদ্ধে ব্যস্ত অধিবাসীরা এটা মোটেও পরোয়া করে না। অবৈধ ঘরে, অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ আর ক্যাবল সংযোগ নিয়ে দিনাতিপাত করে তারা। অভিযোগ আছে, ধারাবিতে অবৈধ অনেক কলকারখানা রয়েছে—এমন কি এর অধিবাসীরা লোকাল ট্রেনে টিকেট ছাড়া অবৈধভাবেই যাতায়াত ক'রে থাকে। রেললাইন তো গিয়েছে বস্তির কোল ঘেষেই!

কিন্তু শহরের এই ক্যান্সারকে শুধুমাত্র 'অবৈধ' আখ্যা দিয়ে তো আর থামানো যায় না। ধীরে ধীরে এটার আকৃতি বাড়ছে।

আমি প্রতিদিন ধারাবি থেকে কমিউটার ট্রেনে ক'রে জিমি'স বারে যাতায়াত করি। আমাকে এখানে বিকেল থেকে কাজ করতে হয় মাঝরাত পর্যন্ত। এটাই হলো সবচাইতে ভালো খবর। তবে কাস্টমারের ঘ্যান ঘ্যানানি আর হৃদয়বিদারক কিস্‌সা শুনতে ভালো লাগে না। আমার মনে হয়, হুইস্কি হলো বিরাট উপশমকারী ঔষুধ। এখানে কাজ করে অন্তত তাই মনে হয়েছে আমার।

শান্তারামের সাথে আমার ঐ ঘটনার পর আমার মনে হয়েছিলো আমি আর কোনো দিনই মাতালদের সহ্য করতে পারবো না। কিন্তু মুম্বাইতে আসার পর জিমি'স বারই একমাত্র জায়গা যেখানে আমি কাজ পেয়েছি। আমি নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দেই যে, আমার বস্তির পায়খানার উৎকট দুগর্ন্ধের চেয়ে হুইস্কির গন্ধ অনেক ভালো। আর ধারাবি বস্তির অধিবাসীদের কাছ থেকে প্রতিদিনকার শোনা ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি, অসুখ-বিসুখের কাহিনীর চেয়ে মাতালদের বকককানি অনেক বেশি সুখকর। তো খুব তাড়াতাড়ি আমি একটা মিথ্যে অভিব্যক্তি দিতে শিখে ফেললাম। "আচ্ছা," "তাই নাকি!" "বাপ্‌রে!" "ওয়াও!" ইত্যাদি। অবিশ্বস্ত স্ত্রী আর পীড়াদায়ক বসের কাহিনী প্রতি রাতেই

জিমি'স বারে সম্প্রচারিত হয়। প্রতিদিন আমি *থ্রু-ডব্লিউ.বি* অনুষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে চিঠির অপেক্ষায় থাকি। কখন তারা জানাবে আমি তাদের শোয়ে অংশ নিতে পারবো। কিন্তু ডাকপিয়ন আর আসে না। পরাজয়ের মেঘ আমার মনকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলতে শুরু করেছে এখন। মনে হচ্ছে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমি মুম্বাই এসেছি সেটা আর পূরণ হবে না। আমি বোধহয় স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটছি। এই শক্তিশালী স্রোত পেরিয়ে আমি আমার লক্ষ্যে পৌছাতে পারবো না। কিন্তু এরপরই আমি আমার প্রাণপ্রিয় নিতার আর্তচিৎকার আর নিলীমা কুমারির গোঙানী শুনতে পাই। সঙ্গে সঙ্গে আমার ইচ্ছাশক্তি আবার ফিরে আসে পুরো মাত্রায়। আমাকে ঐ শো'তে যেতেই হবে। আর সেটা ঘটার আগ পর্যন্ত মাতালদের বকবকানি শোনা ছাড়া আমার কোনো উপায় নেই। কেউ ভালো। কেউ খারাপ। কেউ বা মজার। কেউ বিষন্ন। আবার কেউ একেবারেই উদ্ভট রকমের।

মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। কিন্তু বারে বসে থাকা একজন কাস্টমার কিছুতেই যেতে চাচ্ছে না। একটা মার্সিডিজ গাড়িতে ক'রে এসেছে সে। বাইরেই সেটা পার্ক করা আছে। সেই দশটা থেকে মদ খেয়েই যাচ্ছে লোকটা। তার পোশাক পরিহিত ড্রাইভার গাড়িতে ব'সে ঝিমুচ্ছে এখন। সে হয়তো জানে তার মালিক এতো জলদি বের হয়ে আসবে না। লোকটার বয়স হবে ত্রিশের মতো। সুট-টাই পরা।

"আমার ভাই, এই যে আমার ভাই," দু'মিনিট পরপরই সে এটা বলছে। ব্লাক লেভেল হুইস্কি আর শামি কাবাব খাচ্ছে সে।

ম্যানেজার আমার দিকে আঙুল তুলে বললো, "টমাস, তার পাশে গিয়ে বসো। তার ভায়ের ব্যাপারে জানতে চাও। দেখতে পাচ্ছো না, বেচারা কেমন মুষড়ে পড়েছে?"

"কিন্তু...ম্যানেজার সাহেব, এখন তো মাঝরাত পেরিয়ে গেছে! তাকে আমাদের চলে যেতে বলা উচিত। তা না হলে আমি সাড়ে বারোটার লোকাল ট্রেনটা মিস্ করবো।"

"আমার সাথে মুখে মুখে কথা বলবে না। বললে তোমার চোপা ভেঙে দেবো।" আমাকে ধমকে বললো সে। "যাও, কাস্টমারকে কথাবার্তায় ব্যস্ত রাখো। লোকটা মার্সিডিজে ক'রে এসেছে। দামি দামি মদের অর্ডার নাও তার কাছ থেকে।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি কাস্টমারের কাছে গেলাম।

"ওহ্, আমার ভাই। আশা করি তুমি আমাকে মাফ ক'রে দিয়েছো," সে বললো গোঙাতে গোঙাতে। লোকটা গাধার মতো আচরণ করছে। তবে একেবারে যা তা অবস্থায় নেই, এই যা। আরো কয়েক পেগ পেটে পড়লে কথার ফুলঝুরি ছোটাবে।

"আপনার ভায়ের কি হয়েছিলো, স্যার?" জানতে চাইলাম আমি।

লোকটা ঢুলুঢুলু চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, "আমার কাছে জানতে চাইছো কেন? তুমি খালি যন্ত্রণাটা বাড়িয়ে দিতেই পারবে।"

"আপনার ভায়ের কথা আমাকে বলুন, তাতে হয়তো যন্ত্রণাটা একটু কমে যাবে।"

"না। কোনো কিছুই এই যন্ত্রণা কমাতে পারবে না। এমন কি তোমার হুইস্কিও না।"

"বেশ, স্যার। আপনি যদি আপনার ভায়ের কথা বলতে না চান আমি আর জানতে চাইবো না। কিন্তু আপনার কি হয়েছে?"

"তুমি কি আমাকে চেনো না?"

"না, স্যার।"

"আমি প্রকাশ রাও। সুরিয়া ইন্ডাস্ট্রিজের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। ইন্ডিয়ার সবচাইতে বড় বোতাম কারখানা।"

"বোতাম?"

"হ্যা। এই যে তোমার শার্টে আছে। প্যান্ট, কোট, ব্লাউজ সবখানেই বোতাম আছে। আমরা এগুলো বানাই। সব ধরণের বোতামই আমরা বানাই। পত্রপত্রিকায় কি তুমি আমাদের বিজ্ঞাপনগুলো দ্যাখো নি? আমি নিশ্চিত, তোমার শার্টের বোতামগুলোও আমাদের কোম্পানির।"

"আর আপনার ভাই, তার নাম কি?"

"আমার ভাই? অরবিন্দ রাও। আহ্, বেচারা ভাই আমার। ওহ্ অরবিন্দ!" আবারো সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলো।

"অরবিন্দের কি হয়েছে? সে কি করেছে?"

"সে-ই তো সুরিয়া ইন্ডাস্ট্রিজের মালিক ছিলো। আমি তাকে সরিয়ে দিয়েছি।"

"কেন সরিয়ে দিলেন? আচ্ছা, আমাদের কাছে স্কটল্যান্ড থেকে নতুন আসা হুইস্কি দিচ্ছি আপনাকে। খেতে খেতে বলুন ঘটনাটি।"

"ধন্যবাদ তোমাকে। গন্ধটা তো বেশ! আমি হানিমুন করতে মরিশাসের রাজধানী পোর্ট লুইয়ে গেছিলাম। সেখানেই এরকম হুইস্কি প্রথমবারের মতো খাই।"

"আপনি বলছিলেন আপনার ভাইকে সরিয়ে দিলেন, তারপর?"

"ওহ্ আচ্ছা। আমার ভাই খুব ভালো মানুষ ছিলো। কিন্তু তার মাথা খারাপ হয়ে যাওয়াতে তাকে এমডির পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়।"

"মাথা খারাপ, মানে পাগল? কিভাবে?"

"লম্বা এক কাহিনী।"

আমি রোজির একটা ডায়লগ ব্যবহার করলাম। "রাত তো এখনও ফুরোয় নি। বোতল এখনও পরিপূর্ণ। তাহলে আপনি শুরু করছেন না কেন, স্যার?"

"তুমি কি আমার বন্ধু?" আমার দিকে তাকিয়ে বললো সে।

"অবশ্যই আমি আপনার বন্ধু," দাঁত বের ক'রে হেসে বললাম।

"তাহলে তোমাকে আমার গল্প বলবো। আমি মাতাল হয়ে গেছি, বুঝলে। আর মাতালেরা সব সময় সত্যি কথা বলে। ঠিক বলেছি না, বন্ধু?"

"অবশ্যই।"

"তো বন্ধু আমার। আমার প্রাণপ্রিয় ভাই অরবিন্দ খুব দারুণ ব্যবসায়ী ছিলো। শূন্য থেকে সে সুরিয়া ইন্ডাস্ট্রিজটা তৈরি করে। পুরনো হায়দ্রাবাদে আমরা আগে তসবিহ্ আর জপমালা বিক্রি করতাম। চেনো তো জায়গাটা? অরবিন্দই আমাদের এই শিল্পটি নির্মাণ করেছে যার উত্তরাধিকার এখন আমি।"

"আপনি নিশ্চয় আপনার ভায়ের ব্যবসায় সাহায্য করতেন।"

"খুব একটা না। আমি একজন ব্যর্থ। এমনকি মেট্রিক পাসও করতে পারি নি। আমার ভাইয়ের উদারতায় আমি তার কোম্পানিতে সেল্‌স ডিভিশনে কাজ করতে শুরু করি। ভালোই কাজ করি সেখানে, আর একটা সময় আমার ভাইও আমাকে আরো বড় দায়িত্ব দেয়। আন্তর্জাতিক সেলসের হেড বানিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দেয় নিউইয়র্কে। ওখানে আমাদের একটা অফিস আছে।"

"নিউইয়র্ক? ওয়াও, দারুণ ব্যাপার ছিলো সেটা!"

"হ্যা। জায়গাটা অবশ্যই দারুণ। তবে আমার কাজটা ছিলো বেশ কঠিন। সারা দিন মিটিং আর ফোন ক'রে কেটে যেতো।"

"তো কি হলো সেখানে? একটু দাঁড়ান, আপনার জন্যে আরো শাম্মি কাবাব নিয়ে আসছি।"

"ধন্যবাদ বন্ধু। নিউইয়র্কেই আমার সাথে জুলির পরিচয় ঘটে।"

"সে আবার কে?"

"তার আসল নাম আরজুলি ডি রনসারি। তবে সবাই তাকে জুলি বলেই ডাকতো। কৃষ্ণ বর্ণের হলেও কোকড়ানো চুল আর সরু কোমরের জন্যে দেখতে ছিলো বেশ। আমাদের অফিসের কাছেই একটা ব্লকে সে ক্লিনারের কাজ করতো। হাইতি থেকে অবৈধভাবে এসেছিলো। হাইতির নাম শুনেছো তো?"

"না। সেটা কোথায়?"

"ক্যারিবিয়ানের একটি দেশ, মেক্সিকোর খুব কাছে।"

"বুঝলাম। তাহলে আপনার সাথে জুলির পরিচয় হলো।"

"মাঝে মধ্যেই আমি তাকে হাই হ্যালো বলতাম। একদিন কর্তৃপক্ষের কাছে সে ধরা পড়ে গেলো। গ্রিন কার্ড ছাড়া কাজ করছে। আমাকে অনুনয় ক'রে বললো আমি যেনো তাকে আমার একজন কর্মচারী হিসেবে দেখাই, তাহলে অন্তত আমেরিকায় থেকে যেতে পারবে সে। আমি তাই করলাম। বিনিময়ে আমাকে প্রেম ভালোবাসা সম্মান আর মাথা খারাপ করার মতো সঙ্গম উপহার দিলো সে। আমার কথা বিশ্বাস করো। আমি মাতাল, আর মাতালেরা সত্যি বলে, ঠিক?"

"একদম ঠিক। আপনি আরেক পেগ নিচ্ছেন না কেন? এই মদটা তো বেশ ভালো, তাই না?"

"ধন্যবাদ বন্ধু। তোমার অনেক দয়া। তুমি অনেক ভালো। অন্তত জুলির চেয়ে তো ভালোই। সে আমাকে ব্যবহার করেছে, বুঝলে। আমার দুর্বলতা নিয়ে খেলেছে। বিশাল শহরে আমি ছিলাম খুবই একা। ফলে খুব দ্রুতই আমরা বিয়ে ক'রে ফেললাম।"

"তারপর আপনারা মরিশাসের পোর্ট লুইয়ে চলে গেলেন হানিমুন করতে। ঠিক বলেছি না?"

"ঠিক। কিন্তু হানিমুন থেকে ফিরে এসে আমি জুলির চরিত্রের অন্ধকার একটি দিক আবিষ্কার করি। বিয়ের পর আমি প্রথম তার ফ্ল্যাটে গিয়ে আজব সব জিনিস দেখতে পেলাম—রামের বোতলে জপমালা পরানো, আজব দেখতে কতোগুলো পুতুল, বিভিন্ন ধরণের পাথর, ক্রুশ, এমনকি সাপের চামড়া। তার কাছে বসু নামের কালো রঙের একটা বেড়ালও ছিলো। দেখতে খুবই জঘন্য ছিলো সেটা।

"ব্রনক্সে ছিনতাইকারীরা যখন ছুরি দিয়ে আমাকে আক্রমণ করলো তখন বুঝতে পারলাম জুলির মধ্যে আরো কিছু আছে যা আমি ধরতে পারি নি। আমি সৌভাগ্যবান ছিলাম, তাদের হাত থেকে অল্পের জন্যে বেঁচে যাই। পালাতে পারলেও আমার হাতে একটু আঘাত লাগে। জুলি আমাকে হাসপাতালে যেতে না দিয়ে কিছু হারবাল চিকিৎসা করালো। তারপর আজব আজব মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিলো আমার হাতে। মাত্র দু'দিনে আঘাতটা একেবারে উধাও হয়ে গেলো। এমনকি দাগও রইলো না। তখনই সে আমাকে জানালো সে একজন ভুডু সাধক।"

"ভুডু? এটা আবার কি?"

"তুমি জানো না, বন্ধু। ভুডু হলো হাইতির একটা ধর্ম। এর বিশ্বাসীরা

লোয়াস নামে আত্মার উপাসনা করে, তারা বিশ্বাস করে সমগ্র দুনিয়া লোয়াসে পরিপূর্ণ এবং একে অন্যের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। একটা আরেকটাকে প্রভাবিত করে। কোনো কিছুই দূর্ঘটনা নয়, সবই সম্ভব এ দুনিয়াতে। এজন্যেই ভুডু জানা লোকেরা আজব আজব জিনিস করতে পারে। যেমন মৃত মানুষকে জীবিত করা।"

"ঠাট্টা করছেন?"

"না, মোটেই না। এইসব মৃত লোকদের জম্বি বলে ডাকা হয়। বললামই তো আমি মাতাল, আর মাতালেরা মিথ্যে বলে না। ঠিক?"

"তা ঠিক।" এখন আমি তার গল্পে পুরোপুরি ডুবে গেছি। তাকে যে আরো মদ গেলাতে হবে সেটাও ভুলে গেলাম বলা চলে।

"জুলি আমার জীবনটা ওলটপালট ক'রে দিলো। নিতান্তই ক্লিনারের কাজ করতো সে, কিন্তু আমরা বিয়ে করার পর সে হাই-সোসাইটিতে উঠতে চাইলো। সে ভুলে গেলো শিল্পপতির ভাইকে সে বিয়ে করেছে, খোদ শিল্পপতিকে নয়। সব সময়ই সে টাকা চাইতো। এমন সব টাকা চাইতো যা আমার নিজের নয়। ওগুলো আমার ভায়ের কোম্পানির।

"আমাকে চুরি করতে বাধ্য করলো সে। প্রথমে ছোটোখাটো—খরচ বেশি দেখিয়ে টাকা সরাতাম। পরে ক্লায়েন্টের কাছ থেকে পাওনা টাকা আর লেজারে না তুলে, হেড অফিসে না পাঠিয়ে মেরে দিতাম। একসময় তহবিল তছরূপ অধ মিলিয়ন ডলারে গিয়ে পৌছালো। তারপরই মুম্বাইতে থাকা আমার ভাই সব জেনে গেলো।"

"হায় ঈশ্বর! তারপর কি হলো?"

"তুমি কি ভেবেছো? আমার ভাই খুবই রেগে গেলো। চাইলে আমাকে পুলিশে দিতে পারতো। কিন্তু রক্ত বলে কথা। তার কাছে ক্ষমা চাইলে সে আমাকে মাফ ক'রে দেয়। অবশ্য আমেরিকা থেকে আমাকে বদলি করে হায়দ্রাবাদের ছোট্ট একটা অফিসে নিয়ে আসে। আমাকে আমার বেতনের টাকা থেকে তছরূপ করা অর্ধেক টাকা আদায় করতে আদেশ করে সে। অবশ্য বিশ বছরের মধ্যে।

"খুশি মনেই আমি শর্তটা মেনে নিই। কিন্তু জুলি খুবই ক্ষেপে গেলো। 'তোমার ভাই হয়ে সে কিভাবে এমন কাজ করতে পারলো?' আমাকেও ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করলো সে। 'কোম্পানিতে তোমার সমান অধিকার আছে। নিজের অধিকারের জন্যে তোমার লড়াই করা উচিত।'

"বার বার এসব শুনে আমারও মনে হলো আমার ভাই আমার সাথে ঠিক কাজ করছে না। সে স্মার্ট আর চতুর। এরপর একদিন অরবিন্দ হায়দ্রাবাদের

অফিসে ভিজিট করতে এলে আবারো কিছু তহবিল তছরূপের ঘটনা তার চোখে ধরা পড়ে। প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে যায় সে। সবার সামনে আমাকে চড়থাপর মারে, গালাগালি করে। বলে আমি একটা অকাল কুষ্মাণ্ড। কোম্পানির সাথে আমার সব ধরণের সম্পর্ক শেষ করার হুমকি দেয় সে।

"আমি একেবারে শেষ হয়ে গেলাম। এই প্রথম, আমার মনে হলো নিজের ভাইকে পাল্টা আঘাত করি। জুলিকে ঘটনাটা বলতেই সে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো। 'তোমার ভাইকে একটা শিক্ষা দেবার সময় এসে গেছে,' আমাকে বললো সে। 'তুমি কি প্রতিশোধ নিতে প্রস্তুত?' 'হ্যা,' জবাবে বললাম আমি। ভায়ের হাতে অপমান হয়ে আমার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে তখন। 'তাহলে তোমার ভায়ের আধোয়া শার্টের একটা বোতাম আর কয়েকটা মাথার চুল আমাকে এনে দাও।' 'আমি তার চুল পাবো কোথায়?' বললাম তাকে। 'সেটা তোমার ব্যাপার,' বললো জুলি। আচ্ছা, তুমি আমাকে মদ দিচ্ছো না কেন?"

দ্রবত তার গ্লাস ভরে দিলাম আমি। "তাহলে আপনি কিভাবে আপনার ভায়ের চুল আর শার্টের বোতাম জোগার করলেন?"

"খুব সহজ। মুম্বাইয়ে তার বাসায় গিয়ে একদিন থাকলাম। লন্ড্রির জন্যে রাখা কাপড় থেকে একটা বোতাম ছিঁড়ে নিলাম। তারপর যে নাপিতের দোকানে সে চুল কাটায় তার ওখানে গিয়ে তাকে ঘুষ দিয়ে বললাম এরপর চুল কাটতে আসলে তার এক গাছি চুল আমার জন্যে রেখে দিতে। তাকে বললাম তিরুপানিতে অবস্থিত প্রভু ভেঙ্কটেশ্বরের মন্দিরে তার চুলগুলো অর্ঘ্য হিসেবে দান করবো।

"তো এক মাসের মধ্যে জুলিকে চুল আর বোতাম দিতে পারলাম। এরপর জুলি যা করলো সেটা খুবই বিস্ময়কর। আজব দেখতে একটা পুরুষ পুতুল নিলো সে। বোতামটি সেই পুতুলের বুকে সেলাই ক'রে লাগালো আর চুলের গোছা আঁটকে দিলো সেটার মাথায়। এরপর একটা মোরগ জবাই ক'রে সেটার সমস্ত রক্ত একটা পাত্রে জমা করলো জুলি। নিজের ঘরে গিয়ে আজব ভাষায় মন্ত্র পড়তে লাগলো। তারপর পুতুলটাকে সেই রক্তে ভিজিয়ে কালো রঙের সুঁচ নিয়ে বললো, 'ভুডু পুতুল প্রস্তুত। এতে আমি তোমার ভাইয়ের আত্মা প্রোথিত করেছি। এখন এই কালো সূঁচ দিয়ে পুতুলটার যা করবে মুম্বাইয়ে থাকা তোমার ভায়েরও তাই হবে। ধরা যাক, আমি পুতুলটার মাথায় পিন দিয়ে খোঁচা মারলাম তোমার ভাইয়ের তাহলে সুতীব্র মাথা ব্যথা হবে। আর বুকে আঘাত করলে তোমার ভায়ের বুকে তীব্র যন্ত্রণা অনুভূত হবে। চেষ্টা ক'রে দ্যাখো।' ভাবলাম সে ঠাট্টা করছে। কিন্তু তার সাথে নিছক মজা করতে আমি পিন দিয়ে পুতুলটার বুকে খোঁচা দিলাম। দু'ঘণ্টা বাদে মুম্বাই থেকে খবর

পেলাম অরবিন্দর মাইনর হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। তাকে ভর্তি করা হয়েছে বৃচ ক্যান্ডি হাসপাতালে।"

"হায় হায়! এটা তো বিস্ময়কর ঘটনা," আমি আৎকে উঠে বললাম।

"হ্যা, আমার অবস্থাটা তাহলে বোঝো। আমি বুঝে গেলাম জুলির ব্লাক ম্যাজিক ভুডু পুতুল তৈরি করতে পেরেছে।

"এরপর কয়েক মাস ধরে পুতুলটা হয়ে উঠলো আমার গোপন খেলনা। আমার সমস্ত রাগ ক্ষোভ ঘৃণা উগড়ে দিলাম। ভায়ের যন্ত্রণায় আনন্দ পেতে শুরু করলাম আমি। পুতুলটা মুম্বাইয়ে নিয়ে গিয়ে নিজের চোখের সামনে অরবিন্দকে যন্ত্রণায় ছটফট করতে দেখতাম। এরপর অরবিন্দ যখন সবার সামনে থাকতো তখনও এটা ব্যবহার করতাম। জাপানি ক্লায়েন্টদের সাথে মিটিং করছে সে। আমি বসে আছি ঘরের এক কোণে। শুনতে পাচ্ছি অরবিন্দ বলছে, ' মিঃ হারাদা, জাপানে আমাদের শাখা খোলার চিন্তা আছে, তবে—' আমি কালো পিন দিয়ে পুতুলটায় খোঁচা মারলাম। 'ওয়াও!' আমার ভাই চিৎকার ক'রে মাথা ধরে বসে পড়লো। তার বিদেশী ক্লায়েন্টরা চলে গেলো ডিনার না করেই।

"ব্যাঙ্গালোরে এক পারিবারিক বিয়ের অনুষ্ঠানে অরবিন্দর সাথে গেলাম। অরবিন্দ যখন জামাই-বউকে আশীবাদ করতে যাবে শুরু করলাম আমার খেলা। তীব্র মাথা ব্যথায় পাগলের মতো অবস্থা হলো তার। সবাই বলাবলি করতে লাগলো অরবিন্দ পাগল হয়ে যাচ্ছে।

"আমার ভাই সেরা শিল্প উদ্যোক্তার পুরস্কার নিতে গেছে এক অনুষ্ঠানে। সঙ্গে আছি আমি। ব্যস্! বক্তব্য দেয়ার সময় শুরু ক'রে দিলাম পীড়ন। প্রচণ্ড মাথা ব্যথায় অরবিন্দ ট্রফি রাখা টেবিলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে চিৎকার করতে শুরু ক'রে দিলো।

"ডাক্তারের কাছে গেলে অরবিন্দর মাথায় এম.আর.আই করা হলো, কিন্তু কিছুই পাওয়া গেলো না। ডাক্তার তাকে মনোবিজ্ঞানীর কাছে যেতে বললো।

"অবশেষে আমি বার্ষিক শেয়ারহোল্ডারদের মিটিংয়ে পুতুলটা নিয়ে গেলাম। একেবারে শেষ মাথায় বসে শুরু ক'রে দিলাম আমার শয়তানী। অরবিন্দ কেবলমাত্র এমডি'র রিপোর্ট দিতে যাবে। ব্যস্। আ! ই! ক'রে মাথা ধরে পাগলের মতো আচরণ করতে লাগলো সে। পুরো থিয়েটারে একটা বিশৃঙ্খলা নেমে এলো। কিন্তু শেয়ার হোল্ডাররা সঙ্গে সঙ্গে এ রকম পাগল এমডি'র পদত্যাগ দাবি ক'রে বসলো। এক সপ্তাহের মধ্যে তাকে বাধ্য করা হলো পদত্যাগে। আমি হলাম পরবর্তী এমডি। আর আমার ভাইকে তালাবদ্ধ ক'রে রাখা হলো মেন্টাল হাসপাতালে।

"দু'বছর ধরে আমার ভাই মেন্টাল হাসপাতালে ছিলো। এই সময়ে আমি কল্পনাতীতভাবেই ধনী হয়ে উঠলাম। অবশেষে যেমনটি জুলি চেয়েছিলো তার

সবই পেলো সে। পোর্ট-অ-প্রিন্স থেকে নিজের মা আর ভাইকে এনে রাখলো মুম্বাইয়ে। তবে আমি আস্তে আস্তে বুঝতে পারলাম যা করেছি ঠিক করি নি। আর তখনই আমার সাথে পরিচয় হলো জ্যোৎস্নার।"

"জ্যোৎস্না? সে কে?"

"অফিশিয়ালি সে আমার নতুন সেক্রেটারি। তবে বাস্তবে সে আমার জান। আমার সব। তার সাথে আমার অনেক মিল। জুলির সাথে আমার খুব কমই মিল আছে বলা যায়। জ্যোৎস্না হলো জুলির একেবারে বিপরীত। সে-ই আমাকে বুঝিয়েছে আমি আমার বড় ভায়ের সাথে সাথে অন্যায় করেছি। সিদ্ধান্ত নিলাম অরবিন্দকে মেন্টাল হাসপাতাল থেকে ছাড়িয়ে আনবো।"

"তাহলে আপনি কি তাকে ছাড়িয়ে আনতে পেরেছিলেন?"

"না। দেরি ক'রে ফেলেছিলাম। ওখানে তারা আমার ভাইকে ইলেক্ট্রিক শক্ দিয়ে ভীষণ অত্যাচার করেছিলো। দু'সপ্তাহ আগে অরবিন্দ মারা গেছে।"

"কি?"

"হ্যা বন্ধু, আমার ভাই মারা গেছে।" কাঁদতে শুরু করলো সে। আমার দু'হাত ধরে বললো, "আমিই তাকে খুন করেছি।"

মিঃ রাও গাধা থেকে খুব দ্রুত কুত্তায় পরিণত হয়ে গেলেন।

"কুত্তির বাচ্চা জুলি। এবার তার মুখোশ খুলে দেবো আমি। তার মোটকি মা আর অপদার্থ ভাইকে জানালা দিয়ে নিচে ছুড়ে ফেলবো। তার ঐ কুতকুতে বেড়ালটাকেও খুন করবো আমি। মুম্বাই থেকে লাথি মেরে তাড়াবো জুলিকে। হাইতিতে গিয়ে পচে মরবে সে।"

"কিন্তু এটা আপনি কিভাবে করবেন?"

তার চোখ দুটো চক্‌চক্ ক'রে উঠলো। "তুমি আমার বন্ধু। আর আমি হলাম মাতাল। মাতালেরা সব সময় সত্যি কথা বলে। তাই তোমাকে বলছি, ইতিমধ্যে আমি একজন উকিলের সাথে কথা বলে ডিভোর্সের সব কাগজপত্রও তৈরি ক'রে ফেলেছি। জুলি যদি ভালোয় ভালোয় রাজি হয় তো ভালো কথা। না হলে অন্য ব্যবস্থা করবো। বুঝলে।" প্যান্টের পকেট থেকে একটা ছোটো ব্যারেলের পিস্তল বের করলো সে। জিনসিটা আমার হাতের তালুর আকারের হবে। "এই সুন্দরীটাকে দ্যাখো। এটা দিয়ে আমি জুলির মাথা উড়িয়ে দেবো। তারপর বিয়ে করবো জ্যোৎস্নাকে। তুমি আমার দোস্ত। আর আমি হলাম মাতাল। মনে রাখবে মাতালেরা মিথ্যে...আ-আ-আ-আ!" বুকের বাম পাশটা ধরে আচম্‌কা চিৎকার দিলো সে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো টেবিলের উপর।

মনে হচ্ছে আরো একবার বখশিস পাওয়া থেকে বঞ্চিত হতে যাচ্ছি।

লাল বাতি জ্বালিয়ে পুলিশের জিপ এলো আধ ঘন্টার মধ্যেই। একটা অ্যাম্বুলেন্সের সাথে ডাক্তারও এলো জিমি'স বারে। প্রকাশ রাওকে মৃত ঘোষণা

করলো সেই ডাক্তার ভদ্রলোক। মারাত্মক হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন তিনি। তার পকেট খুঁজে তারা টাকা ভর্তি মানিব্যাগ, সুন্দরী এক ভারতীয় মেয়ের ছবি আর ডিভোর্সের কাগজপত্র পেলো। তবে কোনো অস্ত্র খুঁজে পেলো না তারা। মৃত মানুষের আবার অস্ত্রের কী প্রয়োজন!

স্মিতা আমার দিকে হাসি হাসি মুখে চেয়ে আছে। "তুমি আমাকে এসব গাঁজাখুরি গল্প বিশ্বাস করতে বলছো?"

"আমি কিছুই বলছি না। প্রকাশ রাও আমাকে যা যা বলেছে তাই কেবল বললাম আপনাকে।"

"এসব ঘটনার মধ্যে কোনো সত্য নেই, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।"

"আমি কেবল বলতে পারি কল্পনার চেয়ে বাস্তব অকে বেশি অদ্ভুত।"

"আমি বিশ্বাস করতে পারছি না রাও কারো ভুডু পুতুলের খোঁচাখুঁচিতে মারা গেছে। আমার ধারণা এটা তুমি বানিয়ে বানিয়ে বলছো।"

"বেশ। গল্পটা না হয় বিশ্বাস নাই করলেন। কিন্তু আমি আমার প্রশ্নটা তাহলে কিভাবে ব্যাখ্যা করবো?"

'প্লে' বাটনে টিপ দিলো স্মিতা।

প্রেম কুমার নিজের ডেস্কে টোকা মেরে বললো, "লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলমেন। আমরা এবার পরের প্রশ্নে যাবো। আর এই ছয় নাম্বার প্রশ্নের জবাব দিতে পারলে মিঃ টমাস জিতে যাবে এক লক্ষ রুপি। এই প্রশ্নটি দেশ এবং রাজধানী সংক্রান্ত। মিঃ টমাস, তুমি কি রাজধানীগুলোর ব্যাপারে পরিচিত? এই ধরো, ইন্ডিয়ার রাজধানী কোন্‌টা?"

"নিউ দিল্লি।"

"ভালো। আর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের?"

"নিউইয়র্ক?"

প্রেম কুমার হেসে বললো, "না। এটা ভুল। ঠিক আছে, ফ্রান্সের রাজধানী?"

"আমি জানি না।"

"জাপানের?"

"জানি না।"

"ইতালির রাজধানী। সেটাও কি জানো না?"

"না।"

"তাহলে তো পরের প্রশ্নটা তোমার জন্যে বেশ কঠিনই হবে। মনে হচ্ছে লাইফবোট ব্যবহার না ক'রে সেটার জবাব তুমি দিতে পারবে না। তো আসা যাক এক লক্ষ রুপির জন্য ছয় নাম্বার প্রশ্নে। পাপুয়া নিউ গিনির রাজধানী কোন্‌টি? এটা কি এ) পোর্ট লুই, বি) পোর্ট-অ-প্রিন্স, সি) পোর্ট মোরসবি নাকি ডি) পোর্ট অ্যাডেলেইড?"

সাসপেন্সের মিউজিক বাজতে শুরু করলো।

"প্রশ্নটার সম্পর্কে তোমার কি কোনো ধারণা আছে, মিঃ টমাস?"

"হ্যা। আমি ভুল জবাবগুলো জানি।"

"তাই নাকি?" অবিশ্বাসের সুরে বললো প্রেম কুমার। দর্শকদের মধ্যেও ফিসফাস শুরু হয়ে গেলো।

"হ্যা, আমি জানি এটা পোর্ট-অ-প্রিন্স নয়, ওটা তো হাইতির রাজধানী। পোর্ট লুই হলো মরিশাসের। আর পোর্ট অ্যাডিলেইড অস্ট্রেলিয়ার একটি বন্দর। তাহলে সঠিক জবাব হবে সি। পোর্ট মোরস্‌বি।"

"অসাধারণ! তুমি কি একশতভাগ নিশ্চিত?"

"হ্যা।"

ড্রামের শব্দ শোনা গেলো। সঠিক জবাবের লেখাটা ভেসে উঠলো পর্দায়।

"একেবারে একশতভাগ সঠিক জবাব! এটা পোর্ট মোরস্‌বি। তুমি এক লাখ রুপি জিতে গেছো। এখন তুমি লাখপতি!" প্রেম কুমার ঘোষণা দিলো। দর্শকেরা উঠে হাত তালি দিয়ে স্বাগত জানালো আমাকে। প্রেম কুমার তার কপালের ঘাম মুছে নিলো। "সত্যি বলছি, তুমি যেভাবে একের পর এক জবাব দিয়ে যাচ্ছো, মনে হচ্ছে ভুডু ম্যাজিক দেখছি!"

স্মিতা হেসে ফেললো, "এটা কোনো ভুডু ম্যাজিক না, গর্দভ," টিভির পর্দায় প্রেম কুমারকে উদ্দেশ্য ক'রে বললো সে। আচম্‌কা তার চোখ গেলো শোবার ঘরের কার্পেটের দিকে। উপুড় হয়ে ছোট্ট একটা বোতাম তুলে নিলো স্মিতা। শার্টের বোতাম। আমার শার্টের দিকে তাকালো এবার। বোতামটা আমার হাতে দিয়ে বললো, "এই নাও। নিজের বোতাম সামলে রাখো।"

ওয়েস্টার্ন এক্সপ্রেসে খুন

নিউ দিল্লির পাহাড়গঞ্জ রেল স্টেশনটি হৈহট্টগোল আর লোকজনের ভীড়ে পরিপূর্ণ থাকে। ট্রেনের ইঞ্জিন অধৈর্য ষাড়ের মতো ফোস্‌ফোস্‌ করে সেখানে।

আপনি যদি আমাকে ঐ জায়গাতে খোঁজ করেন তবে কোথায় খুঁজবেন? আপনি হয়তো প্লাটফর্ম আর তার আশেপাশে ছিন্নমূল শিশুদের ভীড়েই আমাকে খুঁজবেন। আপনি হয়তো আমাকে একজন হকার হিসেবেও ভাবতে পারেন। যে কিনা স্টেশনের টয়লেট থেকে পানি সংগ্রহ ক'রে মিনারেল ওয়াটার বলে চালিয়ে দেয়। প্লাটফর্মের নোংরা জামা পরা সুইপারও ভাবতে পারেন আমাকে। কিংবা লাল কুর্তা পরা কুলিদের দলের মধ্যেও আমাকে দেখার কথা কল্পনা করতে পারেন যারা প্যাসেঞ্জারের মালামাল বহন ক'রে থাকে।

আরেকবার ভাবুন। আমি হকারও নই, কুলিও নই। নই কোনো সুইপার। আজকে আমি একজন সম্মানিত যাত্রী। স্লিপার ক্লাশে ক'রে মুম্বাই যাচ্ছি। টিকেট সহকারেই। সাদা সূতির শার্ট আর লেভি জিন্সের প্যান্ট পরে আছি। আমার জিনিসপত্র বহন করছে একজন কুলি। তার মাথায় যে সুটকেসটা আছে তাতে কিছু কাপড়চোপড়, পুরনো খেলনা, কতোগুলো *অস্ট্রেলিয়ান জিওগ্রাফিক* ম্যাগাজিন আর সেলিমের জন্যে কেনা একটা ইলেক্ট্রিক গেম রয়েছে। সুটকেসে কোনো টাকা নেই। ট্রেনে ডাকাতির অনেক গল্প আমি শুনেছি। আমি চাই না আমার জীবনের মূল্যবান বেতনের টাকাগুলো ঝুঁকির মধ্যে থাকুক। টেলরদের কাছ থেকে বেতন বাবদ কড়কড়ে পঞ্চাশ হাজার রুপি আছে আমার কাছে। এমন এক জায়গায় ওগুলো আছে যা কেউ দেখতে পাবে না—আমার আন্ডার ওয়্যারের ভেতর। ওখান থেকে দু'হাজার রুপি দিয়ে ট্রেনের টিকেট আর জামা-কাপড় কিনেছি। এখন এই কুলিকে কিছু দিতে হবে আর কিছু টাকা দিয়ে কিনে নিতে হবে খাবার-দাবার। বুক পকেটে রাখা খুচরা টাকাগুলোর দিকে তাকালাম এক ঝলক। বান্দ্রা স্টেশন থেকে ঘাটকোপারে সেলিমের ঝুপড়ি ঘরে বেবিট্যাক্সি ক'রে যাওয়ার মতো যথেষ্ট টাকা আছে আমার কাছে। লোকাল ট্রেন থেকে না নেমে বেবিট্যাক্সি থেকে আমাকে নামতে দেখলে

সেলিম কি অবাক হবে না? আর সে যখন গেমটা দেখবে, আশা করি খুশিতে জ্ঞান হারাবে না সেলিম।

পাঁচ নাম্বার প্লাটফর্মটি সুপার মার্কেট থেকেও বেশি জনাকীর্ণ। রেলওয়ে ডিপার্টমেন্ট আমার নামটা একেবারে বদলে ফেলেছে। তারা ওটাকে টি.এম রাম বানিয়ে দিয়েছে বুঝতে না পেরে। তাসত্ত্বেও আমি খুশি। খুশি কারণ কোচ নাম্বার ৭-এর লোয়ার বার্থে আমার সিট পড়েছে।

কোচটা ট্রেনের প্রায় শেষ দিকে পড়েছে। ওখানে পৌছাতে পৌছাতে কুলি একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়লো। দরজার কাছে আমার বার্থে বসলাম আমি। সুইকেসটা রাখলাম সিটের নিচে। কুলিকে বিশ রুপি দিলে সে আরো বেশি টাকার জন্যে চাপাচাপি করলো। তাকে দু'রুপি বেশি দিয়ে দিলে খুশি মনে চলে গেলো সে। কুলি চলে গেলে আশেপাশে চেয়ে দেখলাম আমি।

আমার ক্যাবিনে মোট ছয়টি বার্থ আছে। একটা আমর সামনে আর দুটো ঠিক আমার পাশে। আমার সামনের সিটে বাবা-মা আর দুই সন্তানের এক পরিবার বসে আছে—আমার বয়সী এক ছেলে আর আমার চেয়ে অল্প বেশি বয়সের এক মেয়ে। বাবা একজন মধ্যবয়সী মারওয়ারি ব্যবসায়ী। কালো ওয়েস্ট কোট আর টুপি পরে আছে। ঘন ভ্রূ আর পাতলা গোঁফ। তার বউয়ের বয়স তার কাছাকাছিই হবে। তার মুখটাও স্বামীর মতো তিক্ত হয়ে আছে। সবুজ শাড়ি আর হলুদ ব্লাউজ পরে আছে মহিলা। আমার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সে। ছেলেটা বেশ লম্বা এবং হালকাপাতলা, তার ভাবসাব অবশ্য বন্ধুত্বপূর্ণ। কিন্তু জানালার পাশে বসে থাকা মেয়েটি আমাকে চুম্বকের মতো টানছে। খুবই হালকা পাতলা গড়ন আর ফর্সা। নীল রঙের সালোয়ার কামিজ এবং ওড়না পরে আছে। তার চোখ দুটো খুবই সুন্দর। মুখে কোনো দাগ নেই, একেবারে মসৃণ ত্বক। ঠোঁট দুটো বেশ সুন্দর। আমি জীবনেও তার মতো সুন্দর মেয়ে দেখি নি। এমন মেয়ে যাকে দেখার জন্যে বার বার চোখ চলে যাবে। মেয়েটার জাদুময়ী চোখে আমি হারিয়ে যেতে পারবো ব'লে মনে হলো। তার দিকে চেয়ে থাকার সময় একটা বাচ্চার কান্না আমার মনোযোগে বিঘ্ন সৃষ্টি করলো। কয়েক মাসের ছেলে শিশু। আমার পাশের বার্থে মায়ের কোলে আছে সে। মা'র বয়স খুব কম, খুবই বিপর্যস্ত দেখতে। দোমড়ানো মোচড়ানো লাল শাড়ি পরে আছে সে। দেখে মনে হচ্ছে বোধহয় একা একাই ভ্রমন করছে। বাচ্চাটার মুখে চুষনি দিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করছে সে, কিন্তু বাচ্চা কান্না থামাচ্ছে না। অবশেষে ব্লাউজ সরিয়ে বাচ্চার মুখে স্তন চেপে ধরলো মহিলা। আমার সিট থেকে আমি তার ভরাট স্তন দেখতে পাচ্ছি স্পষ্ট। দেখে আমার মুখ শুকিয়ে গেলো। যখন দেখলাম মারওয়ারি ব্যবসায়ী আমার দিকে চেয়ে আছে চোখ সরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলাম।

কম্পার্টমেন্টে চা-ওয়ালা ঢুকলে একমাত্র আমিই চায়ের জন্যে অর্ডার দিলাম। তারপর এলো পত্রিকা হাতে একজন হকার। ব্যবসায়ী লোকটি *টাইমস অব ইন্ডিয়া*'র এক কপি কিনলো। তার ছেলে কিনলো *আরচি* কমিক আর আমি কিনলাম এক কপি *স্টারবার্স্ট* ম্যাগাজিন।

অবশেষে যথারীতি যাত্রার সময়ের চেয়ে দেড় ঘণ্টা দেরিতে ট্রেনটা চলতে শুরু করলো হুইসেল বাজাতে বাজাতে। প্লাটফর্মের ডিজিটাল ঘড়িতে ১৮:৩০ দেখার পরও হাত ঘড়িটা দেখে নিলাম। আমি আমার কব্জিটা ঝাঁকিয়ে একটু মুচড়িয়ে নিলাম যাতে ক'রে অন্যেরা, বিশেষ ক'রে মেয়েটি আমার হাতের ক্যাসিও ডিজিটাল ঘড়িটা খেয়াল করে। পালিকা বাজার থেকে নগদ দুশ' রুপি দিয়ে কিনেছি এটা। বাবা পত্রিকায় আর ছেলে কমিক বইয়ে ডুবে গেলো। মা রাতের খাবার দাবার গোছাতে ব্যস্ত। বাচ্চা কোলের তরুণী মা ঘুমে ঢলে পড়েছে। বাচ্চাটা এখনও মুখে দুধ চুষে যাচ্ছে। আমি ফিল্ম ম্যাগাজিন পড়ছি এরকম একটি ভান করলাম। যে পাতাটি খুলে রেখেছি তাতে হালের সেক্সসিম্বল পুণম সিংয়ের বিকিনি পরা একটা ছবি আছে, কিন্তু তার সম্পদের দিকে আমার কোনো আগ্রহ নেই। আমার চোখ বার বার চলে যাচ্ছে জানালার পাশে বসা মেয়েটির দিকে, যে কিনা বাইরের দৃশ্য দেখছে এক মনে। এমন কি একবারের জন্যেও সে আমার দিকে তাকাচ্ছে না।

রাত আটটার পর মেয়েটির মা একটা বাক্স থেকে প্রচুর খাবার-দাবার বের করলো—পুরি, আলু ভাজি আর দই। সেই সাথে ঘরে বানানো গুলাব জামুন এবং বরফির গন্ধে পুরো কম্পার্টমেন্টটা ভরে উঠলে আমার ক্ষিদেটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। কিন্তু ডিনারের খাবার অর্ডার নিতে প্যান্ট্রি ছেলেটা আসছে না। স্টেশন থেকে আমার কিছু খাবার কিনে নেয়া উচিত ছিলো হয়তো।

মারওয়ারি পরিবারটি বেশ আয়েশ ক'রে খেতে শুরু করলো। বাবা একের পর এক পুরি সাবার ক'রে যাচ্ছে। মা আস্তে আস্তে খাচ্ছে আর একটু পর পর কাঁচা মরিচে কামড় বসাচ্ছে। ছেলেটার মনোযোগ কেবল গুলাব জামুনের দিকে। গোগ্রাসে খাচ্ছে সে। কেবল মেয়েটি খাচ্ছে কম। নীরবে আমি আমার ঠোঁট চাটলাম। অবাক করার ব্যাপার হলো ছেলেটি আমাকে বেশ কয়েকটি পুরি সেধে বসলো, তবে ভদ্রভাবে আমি প্রত্যাখ্যান করলাম সেটা। প্যাসেঞ্জারবেশি ডাকাতের দল ঔষুধ মেশানো খাবার খাইয়ে অনেক প্যাসেঞ্জারকে সর্বস্বান্ত করার গালগল্প আমি শুনেছি। তবে *আর্চি* কমিক পড়া ছেলের পক্ষে ডাকাত হবার কোনো কারণই নেই। তারপরও মেয়েটা যদি আমাকে সাধতো হয়তো আমি সেটা গ্রহণ করতাম। হয়তো না, অবশ্যই গ্রহণ করতাম।

ডিনার শেষে ছেলেটি আর তার বোন মনোপালি নামের একটা খেলা খেলতে শুরু করলো। বাবা মা দু'জনে পাশাপাশি বসে গল্পগুজব করছে।

আমি আমার তলপেটে হাত বোলালাম। আন্ডারওয়্যারের ভেতরে আমার টাকাগুলো আছে। আশ্চর্য, টাকার স্পর্শ পেতেই আমার ক্ষিদেটা উবে গেলো অলৌকিকভাবেই।

ট্রেন ভ্রমণ মানে সম্ভাবনার ব্যাপার। ওঠার সময় আপনি আর নামার সময় আপনি আগের সেই ব্যক্তিটি থাকবেন না। যাত্রা পথে আপনি নতুন বন্ধু পেতে পারেন, অথবা খুঁজে পেতে পারেন পুরনো শত্রুকে। বাসি সমোচা খেয়ে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হতে পারেন আবার দূষিত পানি খেয়ে আমাশয়েও ভুগতে পারেন। আর বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনি আপনার ভালোবাসার মানুষটিও খুঁজে পেতে পারেন ট্রেন ভ্রমণে। আমার সামনে বসে নীল সালোয়ার কামিজ পরা মেয়েটার প্রেমে বোধহয় আমি পড়েই গেছি। ভালোবাসা মানে সিনেমার নায়ক নায়িকাদের মতো মেকি ভালোবাসা নয়, বাস্তবিক প্রেম ভালোবাসা। বালিশে মুখ গুঁজে অশ্রব ঝড়ানো প্রেম নয়, বিয়ের মধ্য দিয়ে পরিসমাপ্তি ঘটা প্রেম। বাচ্চাকাচ্চার আগমন, আর সপরিবারে গোয়া ভ্রমণ।

আমার কাছে মাত্র পঞ্চাশ হাজার রুপি আছে, কিন্তু প্রত্যেক রুপিই আমাকে রঙ্গিন রঙ্গিন স্বপ্ন দেখাচ্ছে। আমার মস্তিষ্কে সিনেমাস্কোপ ছায়াছবি নির্মাণ করছে একের পর এক। যেনো আমি পঞ্চাশ মিলিয়ন রুপির মালিক।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাই বোন দু'জনেই খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে ছেলেটা এসে আমার পাশে বসলো। আমরা কথা বলতে আরম্ভ করলাম। জানতে পারলাম তার নাম অক্ষয় আর বোনের নাম মিনাক্ষী। তারা দিল্লিতে থাকে, এক মামার বিয়েতে মুম্বাই যাচ্ছে। অক্ষয় তার মিউজিক প্লেয়ার আর কম্পিউটার গেম নিয়ে উচ্ছ্বসিত। সে আমাকে এনটিভি আর ইন্টারনেট সম্পর্কে বললো। ইন্টারনেটের কিছু পর্নোসাইটের ব্যাপারেও জানালো আমাকে। আমি তাকে বললাম আমি ইংরেজিতে কথা বলতে পারি, *অস্ট্রেলিয়ান জিওগ্রাফিক* ম্যাগাজিন পড়ি। স্ক্র্যাবল খেলতে পছন্দ করি আর আমার আছে সাত সাতজন মেয়ে বন্ধু, তাদের তিনজন আবার ফরেনার। তাকে আরো জানালাম আমার অনেক বড় মিউজিক প্লেয়ার রয়েছে, আর আছে পেন্টিয়াম ফাইভ কম্পিউটার। দিনরাত আমি ইন্টারনেট সার্ফ করি। তাকে বললাম আমি মুম্বাই যাচ্ছি আমার সবচাইতে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাথে দেখা করতে। তার নাম সেলিম। আমি বান্দ্রা স্টেশন থেকে ঘাটকোপারে যাবো ট্যাক্সিতে করে।

আমার বোঝা উচিত ছিলো ষোলো বছরের ছেলেকে বোকা বানানোর

চেয়ে ষাট বছরের বুড়োকে বোকা বানানো বেশি সহজ। অক্ষয় আমার চাপাবাজিটা ধরে ফেললো। "হা! তুমি কম্পিউটারের কিছুই বোঝো না। পেন্টিয়াম ফাইভ এখনও বেরই হয় নি। তুমি একটা চাপাবাজ," আমাকে বললো সে।

আমি আর পারলাম না। "ওহ্, তাই নাকি! তাহলে তুমি মনে করছো আমি মিথ্যে বলছি? তো, মিঃ অক্ষয়, তুমি কি জানো এই মুহূর্তে আমার কাছে পঞ্চাশ হাজার রুপি আছে? এতো টাকা তো তুমি জীবনেও দ্যাখো নি। দেখেছো?"

আমার কথা বিশ্বাস করতে চাইলো না অক্ষয়। টাকাগুলো দেখাতে বললো সে, আর আমিও তাকে বিমুগ্ধ করার জন্যে প্রলোভনে পড়ে গেলাম। একটু ঘুরে প্যান্টের ভেতর থেকে আন্ডারওয়্যারে লুকিয়ে রাখা টাকাগুলো বের ক'রে আনলাম। একটা এনভেলপে রেখেছিলাম, ঘামে একেবারে ভিজে গেছে সেটা। বিজয়ীর ভঙ্গিতে নোটগুলো তার সামনে মেলে ধরলাম। কয়েক মুহূর্ত দেখিয়েই আবার জায়গামতো টাকাগুলো রেখে দিলাম আমি।

অক্ষয়ের চোখ দুটো যদি দেখতেন! কোটর থেকে যেনো বের হয়ে আসতে চাইছে। আমি বিজয়ীর তৃপ্তিতে মুচকি হাসি হাসলাম। জীবনে এই প্রথম আমি কল্পনায় নয়, বাস্তবেই ভড়কে দিলাম কাউকে। অন্য মানুষের চোখে আমার প্রতি সমীহের আভাসও দেখতে পেলাম সেই সঙ্গে। এই ঘটনায় আমি একটা জিনিস শিখলাম। স্বপ্নের ক্ষমতা কেবল তোমার নিজের উপর প্রভাব ফেলে। কিন্তু টাকা থাকলে অন্যের উপরেও প্রভাব বিস্তার করা যায়। আমার আন্ডারওয়্যারে থাকা পঞ্চাশ হাজার রুপিকে আমার কাছে পঞ্চাশ মিলিয়ন বলে মনে হলো আরেকবার।

* * *

রাত দশটা বাজে অক্ষয়ের মা বিছানা বালিশ গোছগাছ করতে শুরু করলো ঘুমানোর প্রস্তুতি হিসেবে। বাচ্চা কোলের মহিলা অবশ্য বালিশ-বিছানা ছাড়াই ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার কোনো বিছানা বালিশ নেই। অবশ্য আমি খুব একটা ঘুম কাতুরেও নই। তাই জানালার পাশে বসে বাইরের অন্ধকার দেখছি। আমার সামনের লোয়ার বার্থে অক্ষয়ের মা, দ্বিতীয় তলায় মিনাক্ষী। আর আমার উপরের বার্থে অক্ষয়ের বাবা উঠে পড়লো। পাশের বার্থে উপরের আসনটি বেছে নিলো অক্ষয়। ঐ বাচ্চাসহ মহিলার ঠিক উপরে সেটা।

অক্ষয়ের বাবা সঙ্গে সঙ্গে নাক ডাকতে শুরু ক'রে দিলো। তার স্ত্রী চাদর টেনে মুখ ঢেকে শুইয়ে পড়লো চুপচাপ। আমি উপরে থাকা মিনাক্ষীকে দেখার

চেষ্টা করলাম, কিন্তু তার একটা হাতের সামান্য অংশ ছাড়া কিছুই দেখতে পেলাম না। আচম্‌কা সে তার বিছানায় উঠে বসে আমার দিকে ঝুঁকে নিচে পড়ে যাওয়া জুতা তুলতে গেলো। তার গায়ের ওড়না সরে আছে, ফলে তার কামিজের গলার ফাঁক দিয়ে ভরাট স্তনের আভাস দেখতে পেলাম স্পষ্ট। সারা শরীরে এক ধরণের উত্তেজনা বয়ে গেলো আমার। মনে হয় মেয়েটা বুঝে ফেলেছে আমি তার দিকে চেয়ে আছি। কারণ সে সঙ্গে সঙ্গে ওড়নাটা বুকে জড়িয়ে আমার দিকে কটমট চোখে তাকালো।

কিছুক্ষণ পর আমিও ঘুমে ঢলে পড়লাম। দেখলাম মধ্যবিত্তের টিপিক্যাল এক স্বপ্ন। লাল টকটকে ফেরারি গাড়ি। নীল সালোয়ার কামিজ পরা সুন্দরী এক স্ত্রী। মাত্র পঞ্চাশ হাজার রুপি সঙ্গে নিয়ে।

পেটে গুঁতো খেয়ে ঘুম থেকে উঠে গেলাম আমি। চোখ খুলে দেখি রাগি চেহারার এক লোক লাঠি দিয়ে আমাকে গুঁতো মেরে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার বেশ পুরু গোঁফ। লাঠিটা আমাকে ভাবালো না, আমাকে ভাবালো তার অন্য হাতে থাকা বন্দুকটা। "এটা ডাকাতি," শান্ত কণ্ঠে সে বললো যেনো কোনো সংবাদ পাঠক বলছে 'আজ বুধবার।' সাদা শার্ট আর কালো প্যান্ট পরা সে, তার মাথার চুল বেশ লম্বা। বয়স খুব কম। দেখে মনে হবে স্টূট রোমিও কিংবা কলেজ ছাত্র। তবে এটাও তো ঠিক সিনেমার বাইরে আমি জীবনে কখনও ডাকাত দেখি নি। হয়তো ডাকাতেরা দেখতে কলেজ ছাত্রদের মতোই হয়ে থাকে। লোকটা আবার কথা বললো। "আপনারা সবাই নিচে নেমে আসুন। কেউ বাহাদুরি দেখানোর চেষ্টা না করলে আমিও কাউকে আঘাত করবো না। পালানোর কিংবা দৌড়ানোর চেষ্টা করবেন না। আমার সঙ্গীরা অন্য দরজাগুলোতে পাহারা দিচ্ছে। আপনারা সবাই সহযোগীতা করলে দশ মিনিটের মধ্যেই কাজ শেষ ক'রে চলে যাবো।"

অক্ষয়, মিনাক্ষী আর তার বাবা-মা ভয়ে ভয়ে নিচে নেমে এলো। তাদের চোখে মুখে আতঙ্ক। আমার পাশে বাচ্চা কোলের মহিলা বিব্রত হয়ে পড়লো কারণ তার বাচ্চা আবারও তীক্ষ্ণ গলায় কাঁদতে শুরু ক'রে দিয়েছে। "ওরে দুধ খাওয়াও," ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললো ডাকাত। ভয়ার্ত মা নার্ভাস হয়ে তার এক স্তনের বদলে দুটো স্তনই বের ক'রে ফেললো। দৃশ্যটা দেখে ডাকাত দাঁত বের ক'রে হেসে স্তনে থাবা বসানোর ভঙ্গী করলে মহিলা চিৎকার দিয়ে নিজের বুক ঢেকে ফেললো সঙ্গে সঙ্গে। ডাকাত হেসে খুন। এবার কিন্তু আমি মজা পাই নি। অস্ত্র তাক্ করা থাকলে উন্মুক্ত স্তনে কোনো আগ্রহ থাকার কথাও নয়।

ডাকাত এবার আসল কাজে চলে এলো। তার এক হাতে একটা থলে আর অন্য হাতে বন্দুকটা তো আছেই। "ঠিক আছে, এবার যার যা আছে সব আমাকে দিয়ে দাও। এই থলেতে। কেউ যদি আমার কথা মতো কাজ না করো তবে গুলি ক'রে মারবো তাকে।" মিনাক্ষীর মা আর বাচ্চাটার মা এ কথা শুনে কাঁদতে আরম্ভ ক'রে দিলো। অন্য কম্পার্টমেন্ট থেকেও আমি কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম। ডাকাতের সহযোগীরা অন্য কম্পার্টমেন্টেও হয়তো একইভাবে সবার কাছ থেকে জিনিসপত্র কেড়ে নিচ্ছে।

ডাকাত লোকটি এক এক ক'রে থলেটা বাড়িয়ে দিলো আমাদের দিকে। বাচ্চার মা দিয়ে শুরু করলো সে। ভয়ার্ত চোখে মহিলা তার চামড়ার ব্যাগ থেকে বাচ্চার চুষনি আর দুধের বোতলটা বের ক'রে ব্যাগটা থলের মধ্যে দিয়ে দিলো। মিনাক্ষীকে হতবিহ্বল দেখাচ্ছে। নিজের হাতের স্বর্ণের বালা খুলে থলেতে রাখতে গেলে ডাকাত লোকটি তার হাত খপ্ ক'রে ধরে বাঁকা হাসি হাসলো। "সোনার বালার চেয়ে তুমি অনেক বেশি সুন্দর, ডার্লিং আমার," ডাকাত এ কথা বললে মিনাক্ষী নিজের হাত ছাড়াতে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো। হাত ছেড়ে দিয়ে তার কামিজের গলা ধরলো ডাকাত। মেয়েটা পিছু হটে গেলে জামাটা ছিঁড়েই গেলো। বেরিয়ে পড়লো তার ব্রা। আমরা সবাই তীব্র আতংকে দেখছি। মিনাক্ষীর বাবা আর সহ্য করতে পারলো না। "শূয়োরের বাচ্চা!" চিৎকার ক'রে ডাকাতকে ঘুষি মারা চেষ্টা করলো সে। কিন্তু প্যাস্থারের মতো লোকটার রিফ্লেক্স। মিনাক্ষীকে ছেড়ে দিয়ে পিস্তলের বাট দিয়ে আঘাত ক'রে বসলো তাকে। ব্যবসায়ীর কপালটা সঙ্গে সঙ্গে ফেঁটে রক্তারক্তি ব্যাপার হয়ে গেলো। মিনাক্ষীর মা আবারো চিৎকার করতে শুরু করলো আর্তস্বরে।

"চুপ কর," ডাকাত বললো। "তা না হলে সবাইকে খুন করবো।"

এ কথায় কাজ হলো। আমরা সবাই পাথরের মতো স্থির আর নিশ্চুপ হয়ে গেলাম মুহূর্তেই। আমার মধ্যে এমনভাবে ভয় জেঁকে বসলো যে গলা শুকিয়ে কাঠ হবার জোগার। হাত-পা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেলো বলা চলে। মিনাক্ষী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তার মা-বাবা নিজেদের সব কিছু ডাকাতের থলেতে জমা দিয়ে দিলো। অক্ষয় জানতে চাইলো তার হাতে থাকা *আরচি* কমিকটা থলেতে রাখবে কি না। এ কথায় ডাকাত একেবারে ক্ষেপে আগুন হয়ে গেলো। "তুই ঠাট্টা করছিস?" কষে একটা চড় বসালো তার গালে। অক্ষয়কে নিজের গালে হাত বোলাতে দেখে আমি মুখ টিপে হেসে ফেললাম। ডাকাত এবার আমার দিকে ফিরলো। "তুই হাসছিস কেন? তোর কাছে কি আছে?" পকেট থেকে খুচরা টাকা পয়সা সব বের ক'রে থলেতে দিয়ে দিলাম, কেবল আমার

লাকি কয়েনটা রেখে দিলাম নিজের কাছে। আমি আমার হাত ঘড়িটা খুলতে যেতেই ডাকাত বললো, "এটা নকল। এটা আমার লাগবে না।" আমাদের ক্যাবিনে সব কাজ শেষ ক'রে সে চলে যেতে উদ্যত হবে এমন সময় অক্ষয় তাকে বললো, "দাঁড়ান। আপনি একটা জিনিস নিতে ভুলে গেছেন।"

ডাকাত লোকটি ঘুরে দাঁড়ালো। আমার দিকে আঙুল তুলে অক্ষয় বললো, "এই ছেলেটার কাছে পঞ্চাশ হাজার রুপি আছে!" কথাটা সে আস্তে ক'রে বললেও আমার কাছে মনে হলো পুরো ট্রেনের সবাই সেটা শুনতে পেয়েছে।

ডাকাত তীর্যক হাসি দিয়ে অক্ষয়ের দিকে তাকালো। "আবার ঠাট্টা করছিস?"

"না, কসম খেয়ে বলছি।" তারপর আমার পেটের দিকে ইঙ্গিত ক'রে বললো, "ওর আন্ডারওয়্যারের ভেতর আছে," মুচকি হেসে বললো অক্ষয়।

"আহ্!" ডাকাত শব্দ করলো।

কাঁপতে শুরু করলাম আমি। জানি না সেটা ভয় থেকে নাকি রাগে। আমার কাছে চলে এলো ডাকাত। "ভালোয় ভালোয় টাকাগুলো দিয়ে দিবি নাকি সবার সামনে তোকে ন্যাংটা করবো।"

"না। এগুলো আমার টাকা।" চিৎকার ক'রে বলে আমার নুনুর উপর এমনভাবে হাত রাখলাম যেনো ফুটবল খেলায় ফ্রি-কিকের বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছি। "আমার কষ্টের উপার্জন। এ টাকা আমি দেবো না। আমি তো আপনার নামটা পর্যন্ত জানি না।"

কথাটা শুনে হেসে খুন ডাকাত লোকটি। "ডাকাতেরা কি ক'রে জানিস না? অন্যের টাকা-পয়সা আমরা কেড়ে নেই। নাম জানবি কেন, অ্যা? এখন টাকাগুলো বের কর, নইলে সবার সামনে..." আমার মুখের সামনে পিস্তল তাক্ করলো সে।

পরাজিত সৈনিকের মতো আমি অস্ত্রের ক্ষমতার কাছে পরাভূত হলাম। টাকাগুলো হাতে নিয়ে খুশিতে শিষ বাজালো ডাকাত। "এতো টাকা তুই পেলি কোথায়?" আমাকে জিজ্ঞেস করলো সে। "চুরি করেছিস, বুঝছি।" থলের ভেতর রেখে দিলো টাকাগুলো। "আমি এই কম্পার্টমেন্টের অন্য লোকদের সাথে যখন কাজ করবো কেউ যেনো এক চুলও না নড়ে।"

আমি চেয়ে চেয়ে আমার পঞ্চাশ মিলিয়ন রুপির স্বপ্ন হাতছাড়া হতে দেখলাম।

ডাকাতের দল অন্য কম্পার্টমেন্টে চলে গেলেও কেউই ইমার্জেন্সি কর্ডটা টান দিলো না। আমরা আমাদের সিটে বরফের মতো জমে রইলাম। দশ মিনিট পর ডাকাত লোকটি আবার ফিরে এসে বললো, "ভালো," তারপর

থলেটা আমার সামনে একটু তুলে ধরে হাসলো। তারপর তাকালো মিনাক্ষীর দিকে। ওড়না দিয়ে সে বুক ঢেকে রেখেছে। তারপরও কামিজ ফুঁড়ে সাদা ব্রাটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটলো ডাকাত।

ডাকাতের সহযোগী চিৎকার ক'রে বললো, "আমি রেডি। তুই কি রেডি?"

"হ্যা," জবাবে বললো সে। আচম্‌কা ট্রেনটা ধীরগতির হতে শুরু করলো।

"জলদি!" অন্য ডাকাতটি ট্রেন থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লো।

"আমি আসছি একটু পর, এই থলেটা নে।" আমাদের সবর্স্ব লুট করা থলেটা দরজা দিয়ে ছুঁড়ে বললো ডাকাত। ট্রেন থেকে লাফ দিতে যাবে কিন্তু শেষ মুহূর্তে সে আবার আমাদের ক্যাবিনে ফিরে এলো। "জলদি ক'রে আমাকে একটা চুমা দিয়ে দাও তো," মিনাক্ষীকে বললে মেয়েটা ভয়ে নিজের সিটে কুঁকড়ে বসে রইলো।

"আমাকে চুমা দিবি না? ঠিক আছে, তাহলে ওড়নাটা সরা। তোর দুধ দেখা আমাকে," অস্ত্র তাক্ ক'রে আদেশ করলো সে। "শেষ ওয়ার্নিং। জলদি কর। তোর দুধ দেখা, না হলে মাথা উড়িয়ে দেবো।" মিনাক্ষীর বাবা নিজের দু'চোখ বন্ধ ক'রে ফেললো। অজ্ঞান হয়ে গেলো তার মা।

ফোঁপাতে ফোঁপাতে মিনাক্ষী ওড়না সরিয়ে ফেললো। কেবল ব্রা পরা এখন।

তবে আমি এটা দেখলাম না। আমি দেখলাম এক লম্বা মহিলা, যার চুলগুলো উড়ছে বাতাসে। সাদা শাড়ি পরে আছে সে। তার হাতে একটা বাচ্চা। সাদা শার্ট কালো প্যান্ট পরা পুরু গোঁফ আর লম্বা চুলের এক লোক তার দিকে এগিয়ে আসছে। মহিলার দিকে অস্ত্র তাক্ ক'রে লোকটা বলছে, "শাড়ি খুলে ফেল।" মহিলা কাঁদতে শুরু করলো। বজ্রপাত। ধূলোবালি উড়ছে। গাছের মরা পাতা উড়ছে সেই বাতাসে। বাচ্চাটা তার মার কোল থেকে লাফ দিয়ে নেমে লোকটার সাথে মারামারি করতে শুরু ক'রে দিলো। শিশুটি অতিমানবীয় ক্ষমতা প্রদর্শন করছে। তার সাথে লোকটা কোনোভাবেই পেরে উঠছে না। ধস্তাধস্তি হলো তাদের দু'জনের মধ্যে। সমানে সমানে লড়ছে তারা। লোকটার যে হাতে অস্ত্র সেই হাতটা ধরে তারই বুকের দিকে ঘুরিয়ে দিলো শিশুটি। তারপর ধূম-ধূম ক'রে দুটো শব্দ। লোকটার বুকে একটা লাল বৃত্ত দেখা যাচ্ছে।

"হায় ঈশ্বর!" অক্ষয়ের কণ্ঠটা প্রতিধ্বনিত হলো। ডাকাত লোকটি মেঝেতে পড়ে আছে। আর তার রিভলবারটি আমার হাতে। ধোয়া বের হচ্ছে নল দিয়ে। ট্রেনটা এখন বেশ দ্রুত গতিতে ছুটে চলছে।

আমি বুঝতে পারছি না কী ঘটেছে। ডাকাত লোকটির শার্টে যে লাল বৃত্ত সেটা আস্তে আস্তে বড় হতে হতে পুরো শার্টটাই ভিজে একাকার হয়ে গেলো। আমি একটা ঘোরের মধ্যে আছি। অক্ষয়ের বাবা আমাকে ধরে ঝাঁকি দিলে সম্বিত ফিরে পেলাম।

আমার বার্থে সমস্ত কম্পার্টমেন্টের লোক এসে জড়ো হয়েছে। নারী-পুরুষ শিশু সবাই ঘিরে রেখেছে আমাকে। মৃত ডাকাতকে দেখছে তারা আর আমার দিকে বিস্ময়ে চেয়ে আছে। আমি আমার হাতের অস্ত্রটার দিকে তাকালাম। ওটাতে লেখা আছে 'কোল্ট'। ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখলাম আসলে লেখা আছে 'কোল্ট এবং 'কন ইউএসএ-ডিআর ২৪৬৯১।'

মিনাক্ষী আমার দিকে কৃতজ্ঞ চোখে চেয়ে আছে। সেলিম যেভাবে ফিল্মস্টারদের দিকে তাকিয়ে থাকে ঠিক সেভাবে আমাকে দেখছে সে। আমি জানি এই মুহূর্তে সে আমার প্রেমে পড়ে গেছে। এখন যদি তাকে বলি তো সে আমাকে বিয়েও করতে রাজি হবে। খুব খুশি মনেই আমার সন্তানের মা হবে। এমনকি আমার কাছে পঞ্চাশ হাজার রুপি না থাকলেও। কিন্তু আমি তার দিকে সেভাবে তাকালাম না। কারণ সব কিছু বদলে গেছে। আমি কেবল আমার হাতের রিভলবার আর মৃত ডাকাতকে দেখছি। যার নাম পর্যন্ত আমি জানি না।

পুলিশ। পুলিশ আমাকে কী করবে? এক মেয়ের শ্লীলতাহানি করতে যাওয়া ডাকাতকে খুন করার জন্যে তারা কি আমার প্রশংসা করবে? নাকি আইন নিজের হাতে তুলে নেবার জন্যে আমাকে জেলে ঢোকাবে? আমি জানি না। আর এটা জানার চেষ্টা আমি করতেও পারি না। এই জুয়ো খেলাটা আমার জন্যে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে। কর্নেল টেলরের কথাটা মনে পড়ে গেলো আমার 'তোমার পেছনে যে লেগেছে তাকে ধোকায় ফেলে দাও। দেখবে সে তোমাকে আর খুঁজে পাবে না।'

পরবর্তী স্টেশনে ট্রেনটা থামার আগেই আমি জানালা দিয়ে লাফিয়ে নেমে পড়লাম। তারপর উঠে বসলাম অন্য একটা ট্রেনে। সেই ট্রেনটা আবার কোনো এক স্টেশনে থামলে সেটা থেকে নেমে আরেকটাতে চাপলাম। সারা রাত ধরে আমি এই ক'রে গেলাম। কোনো ট্রেনেই বসলাম না। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম কেবল।

কোথায় যাচ্ছি আমি জানি না। এমনকি কোন্ ট্রেনে উঠেছি তাও জানি না। কেবল একটা ছেড়ে আরেকটা। তবে আমি নিশ্চিত, মুম্বাই আর যেতে পারছি না। অক্ষয় হয়তো সেলিমের ব্যাপারে পুলিশকে বলে দিয়েছে। তারা আমাকে ঘাটকোপার থেকে গ্রেফতার করতে পারবে।

সকাল ন'টার দিকে আমি যে ট্রেনটাতে ছিলাম সেটা গিয়ে থামলো চমৎকার এক স্টেশনে। বড় বড় ক'রে সেখানে লেখা আগ্রা। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ১৬৯ মিটার উঁচুতে অবস্থিত।

স্মিতা তার মুখে হাত চাপা দিলো। "ওহ্ গড," বললো সে। "তাহলে এতোগুলো বছর ধরে তুমি একজন লোককে খুন করার অপরাধে ভুগছো?"

"একজন নয়, দু'জন। শান্তারামকে যে আমি ধাক্কা মেরেছিলাম সেটা ভুলে যাবেন না," জবাবে বললাম আমি।

"কিন্তু ট্রেনে যা ঘটেছে সেটা তো দুর্ঘটনা। তাছাড়া তুমি এটাকে আত্মরক্ষার জন্যে করেছো বলেও ব্যাখ্যা করতে পারো। আমি দেখবো এরকম কোনো ঘটনা কিংবা কোনো মামলা রেজিস্টার্ড করা হয়েছে কিনা। আমার মনে হয় না যাত্রীরা তোমার বিরুদ্ধে কিছু বলেছে। তুমি তো তাদেরকে বাঁচিয়েছো, তাই না! আচ্ছা, ঐ মেয়েটার কি হয়েছিলো? মিনাক্ষী? তাকে কি তুমি আর কখনও দ্যাখো নি?"

"না। দেখি নি। এবার চলুন শো'টা দেখি।"

স্টুডিওর বাতি আবারো ক্ষীণ হয়ে এলো।

আমার দিকে ফিরলো প্রেম কুমার। "এবার আমরা সাত নাম্বার প্রশ্নে যাবো দুই লাখ রুপির জন্যে। তুমি রেডি?"

"রেডি," আমি বললাম।

"ঠিক আছে। প্রশ্ন নাম্বার সাত। রিভলবার আবিষ্কার করেছে কে? এ) স্যামুয়েল কোল্ট, বি) ব্রবস ব্রাউনিং, সি) ড্যান ওয়েসেন, নাকি ডি) জেমস রিভলবার?"

মিউজিক বাজতে লাগলো। খুব মনোযোগ দিয়ে ভাবছি আমি।

"এসব নাম কি শুনেছো কখনও?" প্রেম কুমার আমাকে বললো।

"একজনের নাম পরিচিত ব'লে মনে হচ্ছে।"

"তাহলে তুমি কি কুইট করবে নাকি সুযোগ নেবে?"

"মনে হয় সুযোগ নেবো।"

"আবারো ভেবে দ্যাখো। এখন পর্যন্ত তুমি এক লাখ রুপি জিতেছো। ভুল জবাব দিলে পুরোটাই হারাবে।"

"আমার হারাবার কিছু নেই। খেলার জন্যে আমি প্রস্তুত।"

"তাহলে তোমার ফাইনাল জবাব কি?"

"এ। কোল্ট।"

"তুমি কি একশ' ভাগ নিশ্চিত?"

"হ্যা।"

ড্রামের বাজনা বেজে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে। সঠিক জবাব লেখাটা ভেসে উঠলো পর্দায়।

"একদম সঠিক জবাব! ১৮৩৫ সালে স্যামুয়েল কোল্ট রিভলবার আবিষ্কার করেছেন। তুমি দুই লাখ রুপি জিতে গেছো!"

আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। আমি আমার পঞ্চাশ হাজার রুপির তিনগুণেরও বেশি টাকা জিতে গেছি। যে ডাকাতের নাম জানতাম না তাকে ধন্যবাদ।

দর্শকদের মধ্য থেকে 'উহ্' আর 'আহ্' ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। সিগনেচার টিউনটা বাজতে শুরু করলেও আমার কানে কেবল আগ্রা হয়ে দিল্লি-মুম্বাইয়ের ট্রেনের ঝুক ঝুক শব্দটাই কানে বাজছে।

প্রেম কুমার আচম্‌কা নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে আমার সাথে হাত মেলালো। কিন্তু আমার হাতটা একেবারেই যন্ত্রবৎ ব'লে মনে হলো তার কাছে। মানুষ বিস্মিত হলে, হতবাক হলে তার মস্তিষ্ক সেটা কাটিয়ে উঠতে কিছুটা সময় তো নেবেই।

এক সৈনিকের কিস্‌সা

ঠিক রাত সাড়ে আটটার দিকে এয়ার রেইডের সাইরেনের শব্দটি পুরো চাউলে শোরগোল ফেলে দিলো। আসন্ন আক্রমণের ব্যাপারে সতর্কতা হিসেবে গত সপ্তাহে যে নির্দেশনাসমূহ দেয়া হয়েছিলো বাসিন্দারা তা পালন করলো যথারীতি। সব বাতি নিভিয়ে দিয়ে সব ধরনের গ্যাজেটের কানেকশান খুলে, গ্যাসের চুলা বন্ধ ক'রে ঘরদোরের দরজা-জানালা লাগিয়ে বাঙ্কারের দিকে চলে গেলো সবাই।

বাঙ্কারটি স্কুল ভবনের নিচে। বিশাল আয়তক্ষেত্রের বাঙ্কারটিতে কয়েকটি ভাঙা চেয়ার আর একটি টেবিল রয়েছে। মেঝেতে লাল কার্পেট বিছানো। চৌদ্দ ইঞ্চির একটা টিভি সেটও আছে সেখানে। বাঙ্কারটি বেশ গরম, দম বন্ধ হবার জোগার হলো আমাদের। তবে এটা আমাদের সুরক্ষার জন্যে বানানো হয়েছে তাই কোনো ধরণের অভিযোগ জানালাম না আমরা। যদিও গুজব আছে পালি হিলের একটা বাঙ্কারে নাকি বত্রিশ ইঞ্চির টিভি রয়েছে। আরো আছে আরামদায়ক সোফা এবং এয়ারকন্ডিশনের সুব্যবস্থা।

বাসিন্দাদের সবাই টিভির সামনে জড়ো হয়েছে। একটা নিউজ চ্যানেল টিউন করা আছে টিভিতে। চেয়ে দেখলাম পুরো চাউলের সবাই আছে এখানে। গোখলে, নেনে, বাপাট পরিবার, মিঃ ওয়াগেল, মিঃ কুলকার্নি, মিসেস ডামলে, মিঃ শিরকে, মিসেস বারউই...কেবল আমাদের চাউলের কর্তা ব্যক্তি মিঃ রামকৃষ্ণা নেই। তিনি ভাড়ার হিসাব আর অন্যান্য বিষয় নিয়ে ব্যস্ত আছেন।

প্রথমে বিজ্ঞাপন। এই যুদ্ধের স্পন্সর করেছে মাদার ইন্ডিয়া টুথপেস্ট আর জলি চা। এরপর প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ। ভারতীয় বাহিনী যুদ্ধে জয় লাভ করতে যাচ্ছে। আমাদেরকে সুখবরটা দিলেন তিনি। আর মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই চূড়ান্ত বিজয় হবে। বেশ চড়া গলায় বললেন যুদ্ধের ময়দানেই শত্রুকে পরাস্ত করা হবে। এই সন্ত্রাসবাদের সমাপ্তি ঘটানো হবে, ঘটানো হবে ক্ষুধা আর দারিদ্র্যের। অবশেষে আমাদের কাছে আবেদন জানালেন সৈনিক কল্যাণ তহবিলে দান করার জন্যে।

প্রধানমন্ত্রীর পর এক তরুণী অভিনেত্রীকে পর্দায় দেখা গেলো। সেও একই কথা বললো সবার উদ্দেশ্যে। তবে ফিল্মি স্টাইলে। মহিলারা অভিনেত্রীকে নিয়ে কথাবার্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়লো। কতো অল্প বয়স তার! দেখতে কি সুন্দর! তার শাড়িটা কি সিল্কের নাকি শিফনের, একে অন্যকে তারা প্রশ্ন করলো। মেয়েটা তার গায়ের চামড়া এতো মসৃণ রাখে কিভাবে? কতো ফর্সা সে! তার কোনো *ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি* ক্রিমের দরকার নেই।

পুরুষেরা রেগেমেগে একাকার। বানচোতগুলো আমাদের যথেষ্ট সমস্যায় ফেলেছে। বললো তারা। যথেষ্ট হয়েছে। আর নয়। এবার পাকিস্তানকে একেবারে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে হবে।

মিঃ ওয়াগেল যুদ্ধের বিষয়ে বেশ অভিজ্ঞ। এক বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার সে, আমাদের চাউলে সে-ই সবচাইতে শিক্ষিত লোক। পাকিস্তানের কাছে মিসাইল আর এটম বোমা রয়েছে, আমাদের বললো সে। এজন্যেই নাকি আমাদেরকে বাঙ্কারে রাখা হয়েছে। যাতে ক'রে তেজস্ক্রিয়া থেকে রক্ষা পেতে পারি। কিন্তু এটম বোমার হাত থেকে রক্ষা পাবার আসলে কোনো উপায় নেই। সে বললো, এটম বোমা যখন পড়বে তখন পানি হয়ে যাবে বাতাস। আর বাতাস হয়ে যাবে আগুন। সূর্যটা উধাও হয়ে যাবে নিমেষে। বিশাল ধোয়ার এক কুণ্ডলী ঢেকে দেবে আকাশ। আমরা সবাই মারা যাবো। শেষ কথাটা বেশ গুরু গম্ভীরভাবে বললো সে।

কিন্তু সেলিম, পুতুল, ধ্যানেশ আর আমার মতো আট-দশ-বারো বছরের বাচ্চাদের কাছে মৃত্যু কল্পনা করা খুব কঠিন। যারা কিনা এর আগে যুদ্ধ কাকে বলে জানে না। আমরা বরং যুদ্ধের ব্যাপারে বেশ উৎসাহী আর কৌতুহলী। টিভির সামনে বসে আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যুদ্ধের ছবি দেখছি।

তেজস্ক্রিয়তা কী জিনিস আমরা জানি না, আর এটা নিয়ে আমাদের মধ্যে কোনো মাথা ব্যাথাও নেই। আমরা মাথা ঘামাচ্ছি অন্য কিছু নিয়ে। যেমন :

এটম বোমার শব্দ কতো জোরে হয়?

আমরা কি আমাদের বাড়ির উপর দিয়ে জেট ফাইটার উড়ে যেতে দেখবো?

সেটা কি দিওয়ালির মতো হবে?

আমাদের চাউলে যদি একটা মিসাইল এসে পড়তো তবে কী দারুণ ব্যাপারই না হোতো?

যুদ্ধের তৃতীয় রাতে বাঙ্কারে আমাদের জীবনটা বেশ অভ্যস্ত হয়ে এলো। মহিলারা খাবার দাবার নিয়ে আসতে লাগলো, সেলাইয়ের কাজকর্মও করতে

শুরু ক'রে দিলো কেউ কেউ। নিজেদের মধ্যে স্বভাবসুলভ গালগল্প চলতে লাগলো পুরো মাত্রায়। জানেন, মিসেস গোস্বামী পঁচিশ ইঞ্চির টিভি কিনেছে? ঈশ্বরই জানে তার স্বামী এতো টাকা কোত্থেকে পায়! মনে হয় মিঃ বাপাট আর তার বউয়ের মধ্যে গতরাতে কড়া ঝগড়া হয়েছে। স্টারবার্স্টের নতুন সংখ্যাটি দেখেছেন? আরমান আলী নাকি সমকামী!

পুরুষেরা যুদ্ধের নতুন নতুন খবর মনোযোগ দিয়ে শুনে যাচ্ছে। জরুরি অবস্থা নাকি জারি করা হবে, কথাটা কি সত্যি? পাঠানকোটে নাকি বোমা বর্ষণে অনেক লোক মারা গেছে? নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের সংকট আছে। অন্তত বাচ্চাদের দুধ স্টক ক'রে রাখা উচিত।

আমরা বাচ্চারা খেলাধূলায় মত্ত। আই স্পাই নামের একটা খেলা খেলতে খেলতে আমরা একেবারে পরিশ্রান্ত। এরপরই পুতুল আরেকটা খেলা আবিষ্কার করলো। খেলাটার নাম ওয়ার অ্যান্ড পিস। খুব সহজ একটা খেলা। আমরা দু' দলে ভাগ হয়ে যাবো। একদলে পাকিস্তানী জেনারেল আর অন্য দলে ভারতীয় জেনারেল। দু'দল থেকে একজন একজন ক'রে দড়ি টানাটানি খেলবে। যে হারবে সে হবে যুদ্ধবন্দী। আর তাকে মুক্ত করতে হলে বিপক্ষ দলের একজনকে বন্দী বানিয়ে বিনিময়ে মুক্ত করতে হবে। দলের নেতা হলো জেনারেল। তাকে ধরা মানে দু'জন বন্দীকে ধরা। যে দল বেশি সংখ্যক যুদ্ধবন্দী পাবে তারাই জিতবে। তবে একটা সমস্যা দেখা দিলো। কেউ পাকিস্তানী জেনারেল হতে চায় না। প্রকারান্তরে তারা সেলিমকেই ধরলো। "তুই মুসলিম," বললো তাকে, "সুতরাং তুইই হবি পাকিস্তানী।" প্রথমে সেলিম রাজি হলো না। কিন্তু এক প্যাকেট বাবলগামের টোপে রাজি হলো সে। আমিও সেলিমের দলে যোগ দিলাম। আর আমরা দু'জনে মিলে ভারতীয়দের একেবারে নাস্তানাবুদ ক'রে ছাড়লাম। খেলা শেষে আমরা এক কোণে বসে জিরোচ্ছি আর যুদ্ধ নিয়ে কথা বলছি।

"যুদ্ধ আমার ভালো লাগছে," বললাম আমি। "খুব মজার। আমার মালেকীন নিলীমা কুমারি আমাকে এক সপ্তাহের ছুটি দিয়েছেন কারফিউর কারণে।"

"হ্যা, আমার স্কুলও এক সপ্তাহের জন্যে বন্ধ ক'রে দেয়া হয়েছে," বললো পুতুল।

"প্রতি মাসে যদি একটা ক'রে যুদ্ধ হোতো," ধ্যানেশ বললো।

"আমি বলছি এইসব বাজে কথা বন্ধ করো," আমাদের পেছন থেকে এক লোক বজ্রকণ্ঠে বললো।

ঘুরে দেখি ক্রাচ হাতে বয়স্ক এক শিখ ভদ্রলোক। লম্বা আর হালকা

পাতলা গড়ন তার। পাতলা গোঁফ আর রোদে পোড়া চেহারা। তার সামরিক পোশাকের সাথে মিল রেখে অলিভ রঙের পাগড়ি পরে আছে। আমাদের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলে সে বললো, "যুদ্ধ নিয়ে তামাশা করার সাহস কোত্থেকে পেলে? যুদ্ধ কোনো ঠাট্টার বিষয় নয়। খুবই সিরিয়াস ব্যাপার। এতে প্রাণহানি ঘটে।"

তখনই আমরা খেয়াল করলাম তার একটা পা নেই।

জানতে পারলাম লোকটার নাম ল্যান্স নায়েক বলবান্ত সিং। খুব অল্পদিন হলো আমাদের চাউলে এসেছে। একাই থাকে। যুদ্ধে এক পা হারিয়েছে সে।

আমাদেরকে শান্ত ক'রে বলবান্ত সিং টিভির সামনে গিয়ে বসলো।

টিভিতে যুদ্ধের লাইভ ছবি দেখাচ্ছে। একটা রকেট ছুটে গিয়ে দূরে কোথাও বিস্ফোরিত হলে একজন অফিসার বললো, "আমরা নিখুঁতভাবে টার্গেটে আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছি।" এরকম আরো কয়েকটা দৃশ্যের পর টিভি পর্দায় একজন বিখ্যাত গায়িকা এসে দেশাত্মবোধক গান গেয়ে শোনালো।

বলবান্ত সিং উঠে দাঁড়িয়ে বিরক্তির সাথে বললো, "এটা কোনো সত্যিকারের যুদ্ধ নয়। এটা তামাশা। তারা আপনাদেরকে সোপ অপেরা দেখাচ্ছে।"

মিঃ ওয়াগেল খুশি হলো না। "তাহলে সত্যিকারের যুদ্ধ কি?" সে জানতে চাইলো।

একজন সিভিলিয়ানের দিকে সৈনিকেরা যেভাবে তাকায় বলবান্ত ঠিক সেভাবেই মিঃ ওয়াগেলের দিকে তাকালো। "এইসব শিশুতোষ ছবির চেয়ে সত্যিকারের যুদ্ধ অনেক আলাদা। সত্যিকারের যুদ্ধে থাকে রক্ত আর রক্ত। মৃতদেহ, বেয়নেটে ছিন্নভিন্ন সহযোদ্ধাদের লাশ। বোমার আঘাতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উড়ে যাওয়া লোকজন দেখা যায় চারপাশে।"

"আপনি কোন্ যুদ্ধে লড়েছিলেন?" মিঃ ওয়াগেল জানতে চাইলো।

"আমি শেষ যে সত্যিকারের যুদ্ধটা হয়েছিলো সেটাতে লড়েছি। ১৯৭১ সালে," গর্বের সাথে বললো বলবান্ত সিং।

"তাহলে আপনি আমাদেরকে সেই আসল যুদ্ধের কথা বলুন," মিসেস ডামলে বললো।

"হ্যা, বলুন, আঙ্কেল," আমরা সমস্বরে বললাম।

বসে পড়লো বলবান্ত সিং। "আসলেই জানতে চান? ঠিক আছে, তাহলে আমি আমার গল্পটা বলছি। সেই গৌরবোজ্জ্বল চৌদ্দটি দিন যখন আমরা পাকিস্তানকে হারিয়ে বিজয় অর্জন করেছিলাম।"

দাদি-নানির চারপাশে বাচ্চারা যেভাবে জড়ো হয় আমরা ঠিক সেভাবে তার চারপাশে জড়ো হলাম।

বলবান্ত সিং প্রচণ্ড আবেগ নিয়ে বলতে শুরু করলো। "আমি এখন আপনাদের সবাইকে সেই সময়টাতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো যা ভারতীয় জাতীয় জীবনে সবচাইতে গৌরবোজ্জ্বল দিন হিসেবে পরিচিত।"

টিভির সাউন্ড একেবারে কমিয়ে দেয়া হলো। সবার মনোযোগ সাবেক যোদ্ধার দিকে। টিভির নকল যোদ্ধা ছেড়ে এখন বাস্তবের আসল যোদ্ধা সামনেই আছে। তাই সবাই তার কথা শুনতে উদগ্রীব।

"সত্যিকারের শেষ যুদ্ধটি শুরু হয়েছিলো ১৯৭১ সালের ৩রা ডিসেম্বরে। তারিখটা আমার মনে আছে কারণ ঐ দিনই যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়, আর আমি পাঠানকোট থেকে বউয়ের চিঠিতে জানতে পারি আমার একটা ছেলে সন্তান হয়েছে। প্রথম সন্তান।

"চিঠিটা পড়ে আমি কেঁদে ফেললাম, তবে সেটা আনন্দের। একটা সুখবর জেনে যুদ্ধে যাচ্ছি ব'লে আরো খুশি হলাম আমি।"

"বাচ্চাটার নাম কি রেখেছিলো আপনার বউ?" মিসেস ডামলে জানতে চাইলো।

"আগে থেকেই ঠিক করা ছিলো ছেলে হলে শের সিং আর মেয়ে হলে দূর্গা। তো তার নাম রাখা হয় শের সিং।"

"যুদ্ধটা কিভাবে শুরু হলো?" মিঃ শিরকে জানতে চাইলো।

"ডিসেম্বরের তিন তারিখে ছিলো অমাবস্যা। গাঢ় অন্ধকার চারদিকে। শত্রুপক্ষ আচম্‌কা আমাদের ওয়েস্টার্ন সেক্টরের শ্রীনগর, অবন্তিপুর, পাঠানকোট, উত্তরলাই, আগ্রা, যোধপুর, আম্বালার কয়েকটি স্থানে বিমান হামলা চালায়। বিমান হামলার পর পরই পদাতিক বাহিনীর তুমুল আক্রমণ শুরু করে তারা। তাদের মূল লক্ষ্য ছিলো চাম্ব সেক্টর।"

"যুদ্ধ যখন বাধে তখন আপনি কোথায় পোস্টেড ছিলেন?" মিঃ ওয়াগেল জানতে চাইলো।

"চাম্বে। ১৩তম ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনে। আমি শিখ রেজিমেন্টে ছিলাম। চাম্ব দখল করতে পারলে পুরো রাজ্যটিই শত্রুদের দখলে চলে যেতো। ওটা ছিলো গুরুত্বপূর্ণ একটি জায়গা।

"তো সেই রাতে পাকিস্তানীরা আমাদের উপর তিন বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করে। খুবই ভারি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তারা এগোতে থাকে। আক্রমন এতোটাই তীব্র হলো যে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের প্রায় সব বাঙ্কার ধ্বংস হয়ে গেলো। আমাদের তিনটি সীমান্ত টহল দলও তুলে নিতে বাধ্য হই।

"আক্রমণ যখন শুরু হয় তখন আমি তিনজন লোকের কমান্ডে ফ্রন্ট পোস্টে ছিলাম। আমার পোস্টে শত্রুপক্ষ তুমুল আক্রমণ চালায়। আমাদের পেছনে মাত্র তিনটি ব্যাটালিয়ান ছিলো। সেটাও মুনাওয়ার তাওয়াই নদীর ওপাড়ে। আমাদের ইস্টার্ন ফ্রন্টে যতো আর্টিলারি আছে পাকিস্তানের কাছে তার চেয়েও বেশি ছিলো।

"আমার সাথে ছিলো সুখবিন্দার সিং, রাজেশ্বর আর কারনেইল সিং। কারনেইল ছিলো সব চাইতে সাহসী। যুদ্ধে তার কোনো ভয় ছিলো না। কিন্তু একটা ভয়ে সে সব সময় তটস্থ থাকতো।"

"সেটা কি?" মিঃ কুলকার্নি জানতে চাইলো।

"সমাহিত হবার ভয়। মানে, তখন গুজব ছিলো পাকিস্তানীরা আমাদের কাউকে বাগে পেলে তাকে মুসলিম রীতিতে সমাহিত করতো। কারনেইল ছিলো খুবই ধর্মভীরু। তার ভয় ছিলো ধরা পড়লে তাকে মেরে ছয় ফুট নিচে কবর দেয়া হবে, আগুনে পোড়ানো হবে না। 'আমাকে কথা দিন, স্যার,' সে আমাকে বলেছিলো যুদ্ধ শুরু হবার আগেই। 'মৃত্যুর পর আমাকে যেনো যথাযথভাবে দাহ করা হয়। তা না হলে আমার আত্ম ছয় হাজার বছর ধরে ঘুরে বেড়াবে। স্বর্গে ঠাই পাবো না আমি।' আমি তাকে আশ্বস্ত ক'রে বললাম, 'ঠিক আছে কারনেইল। তুমি মারা গেলে আমি তোমাকে হিন্দু রীতিতেই দাহ করবো। এ আমার প্রতীজ্ঞা।'

"তো ডিসেম্বরের তিন তারিখে আমি, সুখবিন্দার, কারনেইল আর রাজেশ্বর ফ্রন্টলাইনের একটা বাঙ্কারে ছিলাম।"

পুতুল তাকে বাধা দিলো। "আঙ্কেল, আপনাদের বাঙ্কারে কি এখানকার মতো টিভি ছিলো?"

যোদ্ধা লোকটি হেসে ফেললো। "না, আমাদের বাঙ্কার এতোটা আরামের ছিলো না। কোনো রকম চারজন লোক থাকার মতো ছিলো সেটা। মশা-মাছি আর কখনও কখনও সাপেরাও বেড়াতে আসতো সেখানে।" বলবান্ত সিং আরো সিরিয়াস হয়ে উঠলো। "চাষ অঞ্চলে বেশ লম্বা লম্বা ঘাস জন্মায়। যাকে আমরা হাতির ঘাস বলি। ফলে শুয়ে থাকলে সামনে কিছুই দেখা যায় না। আমরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমাদের সামনে মর্টার এসে পড়লো। গাঢ় অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেলাম না। আমাদের বাঙ্কারে একটা গ্রেনেড ছোঁড়া হলে আমরা হামাগুঁড়ি দিয়ে সরে যাই, কিন্তু বাঙ্কার থেকে বের হতেই ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি আসতে লাগলো আমাদের দিকে। আস্তে আস্তে আমরা ক্রলিং ক'রে ক'রে সামনে এগোতে লাগলাম। বোঝার চেষ্টা করলাম গুলিগুলো কোত্থেকে করা হচ্ছে। আমরা প্রায় পাকিস্তানী বাঙ্কারের কাছে চলে এলাম। কিন্তু তখনই

আমার পেছনে একটা মর্টার বিস্ফোরিত হলে সুখবিন্দার আর রাজেশ্বর নিহত হলো। শার্পনেইল লাগলো কারনেইলের পেটে। আমারই কেবল কিছু লাগে নি। ওখান থেকে পালাতে সক্ষম হই আমি। তক্ষুণি আমার কোম্পানি কমান্ডারকে হতাহতের কথা জানাই। আমি তাকে আরো জানাই, শত্রুপক্ষের বাঙ্কারে একটা এলএমজি পজিশন আছে, সেটা থামাতে না পারলে কোম্পানির আরো ক্ষতি হবে। আমার কমান্ডিং অফিসার আমাকে জানালেন যে আরেকটা সাব ইউনিট তিনি পাঠাতে পারবেন না। তিনি আমাকে বললেন কোনোভাবে এলএমজি পজিশনটা নিউট্রোলাইজ করা সম্ভব কিনা।

" 'আমি শত্রুপক্ষের বাঙ্কারের দিকে যাচ্ছি,' বললাম কারনেইলকে। 'তুমি আমাকে কভারিং দেবে।'

"কিন্তু কারনেইল বললো, 'স্যার, এটা তো আত্মঘাতি মিশন। আমি বললাম, 'জানি। কিন্তু কাউকে না কাউকে তো কাজটা করতে হবেই।' "

" 'তাহলে আমাকেই করতে দিন, স্যার,' কারনেইল বললো। 'আমি এলএমজিটা থামাবো।' তারপর সে আমাকে বললো, 'সাবজি, আপনার স্ত্রী আছে। এইমাত্র শুনেছেন আপনার একটা ছেলে হয়েছে। আমার তো কোনো পরিবার নেই। আমার কোনো পিছটানও নেই। আমি হয়তো এই আঘাতে মরেও যাবো। আমাকে আমার প্রিয় মাতৃভূমির জন্যে জীবন দিতে দিন। তবে আপনি আপনার প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে যাবেন না।' আমি কোনো কিছু বলার আগেই সে *ভারত মাতা কি জয়* বলে শত্রুপক্ষের বাঙ্কারের দিকে ছুটে চললো। তিনজন শত্রুকে বেয়নেট দিয়ে খতম ক'রে এলএমজিটা থামালো সে। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। কোত্থেকে গুলি এসে লাগলো তার বুকে। আমার চোখের সামনে লুটিয়ে পড়লো সে।"

যুদ্ধের দৃশ্যগুলো আমরা কল্পনা করতেই পুরো হলে নীরবতা নেমে এলো, বলবান্ত বলতে লাগলো পুরোদমে।

"আমাকে ফিরে যেতে বললেও প্রতীজ্ঞার কারণে আমি ওখানে রয়ে গেলাম। কারনেইলের মৃতদেহ পড়ে আছে শত্রুপক্ষের সীমানায়। আমার কোনো ধারণাই পাকিস্তানী বাহিনীর সংখ্যা কতো। আমার সেকশনে কেবল আমিই রয়ে গেছি।

"রাত তিনটার দিকে গোলাগুলি একেবারে বন্ধ হয়ে গেলো। বাতাস বইতে লাগলো চারপাশে। আস্তে আস্তে আমি সামনের দিকে এগোতে লাগলাম। দুশ' কদম দূরে কারো পায়ের শব্দ শুনে রাইফেলটা কক্ ক'রে ফেললাম। কিন্তু গুলি করলাম না। গুলি করলে শব্দ আর সৃষ্ট আলোর ফলে আমার অবস্থান জেনে যাবে শত্রুপক্ষ। আমি শুয়ে রইলাম একজায়গায়।

অনেকক্ষণ পর খুব কাছে দেয়াশলাই জ্বলতে দেখলাম। দশ ফিট দূরেও হবে না। আচমকা উঠে আমি বেয়নেট চার্জ করতে উদ্যত হলাম। এক পাকিস্তানী সৈনিক প্রস্রাব করছে। আমি তাকে যে-ই না আঘাত করবো সে আমার দিকে ফিরে তাকাতেই হাতের রাইফেলটা ফেলে দিলো। হাত জোর ক'রে অনুরোধ করলো। 'দয়া ক'রে আমাকে খুন কোরো না। তোমার কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইছি।'

" 'তোমরা কতোজন আছো এখানে?' তাকে বললাম আমি।

'আমি জানি না। আমি আমার ইউনিট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করছিলাম আমি। আমাকে হত্যা কোরো না।' কেঁদে ফেললো সে।

" 'কেন হত্যা করবো না?' বললাম তাকে। 'তুমি তো আমার শত্রু।'

" 'কিন্তু আমি তো একজন মানুষ। তোমার মতোই,' বললো সে। 'তোমার মতোই আমার রক্তের রঙ লাল। আমারও ঘরে বউ-বাচ্চা আছে। দশ দিন আগে আমার একটা মেয়ে হয়েছে। তার মুখটা না দেখে আমি মরতে চাই না।'

"তার কথা শুনে আমি একটু নরম হলাম। 'আমারও বউ আছে। মাত্র জন্ম নিয়েছে এক ছেলে। তার মুখ আমি এখনও দেখি নি।' শত্রুপক্ষের সৈনিককে বললাম। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার জায়গায় তুমি হলে কি করতে?' কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকলো সে। তারপর বেশ দৃঢ়ভাবে বললো, 'তোমাকে আমি খুন করতাম।'

" 'আমরা হলাম সৈনিক, বুঝেছো?' বললাম তাকে। 'আমাদেরকে আমাদের মতোই কাজ করতে হয়। তবে তোমাকে কথা দিচ্ছি তোমার লাশ যথাযথভাবে সমাহিত করবো।' তারপর চোখের পলক না ফেলে বেয়নেট চার্জ ক'রে তাকে মেরে ফেললাম।

"উফ্...ছি-ছি," মিসেস ডামলে তিক্তমুখে দু'চোখ বন্ধ ক'রে বললো। মিসেস শিরকেও ভড়কে গেছে। "আপনাকে এইসব খুনখারাবির নিখুঁত বর্ণনা না দিলেও চলবে। এসব শুনে আমার ছেলে আবার দুঃস্বপ্ন দেখতে শুরু করবে।"

বলবান্ত নাক সিঁটকালো। "হা! যুদ্ধ ভীতুদের জন্যে নয়। সত্যি বলতে কি এসব শুনলে শিশুরা বুঝবে আসলে কী ঘটেছিলো। তাদের বোঝা উচিত যুদ্ধ কোনো ছেলেখেলা নয়। খুবই মারাত্মক জিনিস। যুদ্ধে প্রাণহানি হয়।"

"এরপর কি হলো?" মিঃ ওয়াগেল জানতে চাইলো।

"শত্রুপক্ষের বাঙ্কারে গিয়ে কারনেইলের মৃতদেহটা কাঁধে ক'রে নিয়ে

এলাম নিজেদের ক্যাম্পে। পরদিন দাহ করলাম তাকে।" বলবান্তের দুচোখ ভিজে গেলো। "কর্নেলকে আমি কারনেইলের বীরত্বের কথা জানিয়ে তাকে মরণোত্তর এম.ভি.সি দেবার সুপারিশ করলাম।"

"এম.ভি.সি কি?" ধ্যানেশ জিজ্ঞেস করলো।

"মহা বীর চক্র। এটা আমাদের সেনাবাহিনীর সবচাইতে সম্মানজনক পুরস্কারের মধ্যে অন্যতম," জবাবে জানালো বলবান্ত।

"তাহলে সবচাইতে সেরা কোন্‌টি?"

"পিভি.সি, মানে পরম বীর চক্র। এটা প্রায় সবক্ষেত্রেই মরণোত্তর দেয়া হয়।"

"আপনি কোন্ পুরস্কার পেয়েছেন?" ধ্যানেশ আবারো প্রশ্ন করলো।

বিষন্ন হয়ে গেলো বলবান্ত সিংয়ের মুখটা । "আমি এরকম কোনো পদক পাই নি। তবে আমার গল্প এখনও শেষ হয় নি। মানদিয়ালা বৃজের ঘটনাটি এখনও বাকি আছে।"

মিঃ ওয়াগেল হাত ঘড়িতে তাকালো। "হায় হায়, মাঝরাত হয়ে গেছে। চলো চলো। কারফিউ শেষ হয়ে গেছে। আজ এ পর্যন্তই থাক। এবার বাড়ি ফিরতে হবে।"

অনিচ্ছায় আমরা সবাই বাড়ি ফিরে গেলাম।

পরদিন আবার শুরু হলো কাহিনীর বাকিটা। বলবান্ত সিং গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বললো, "মানদিয়ালাতে আবারো আক্রমণ করলো তারা। ভারি অস্ত্র আর ট্যাংকের সাহায্যে এগোতে লাগলো। তারা জানতো মানদিয়ালা বৃজ দখলে নিতে পারলে আমরা পিছু হটতে বাধ্য হবো। এক পর্যায়ে পুরো চাম্ব ছেড়ে চলে যাবো আমরা।

"দুটো পাকিস্তানী ব্যাটেলিয়ান আক্রমণ চালালো। সেটা ডিসেম্বরের পাঁচ তারিখ। আমেরিকার তৈরি প্যাটন ট্যাংক আর চায়নিজ টি-৫৯ ট্যাংক ছিলো তাদের বহরে। মাথার উপরে পাকিস্তানী বিমান বাহিনীর জেট আক্রমণের জন্যে লক্ষ্যবস্তু খুঁজে বেড়াচ্ছে। শুরু হলো তুমুল আক্রমণ। দুভার্গ্যের ব্যাপার হলো আমাদের অনেক সৈন্য কাপুরুষের মতো পালালো। পাকিস্তানীরা আমাদের সিও'কে ধরে হত্যা করলো। দখল ক'রে নিলো মানদিয়ালা বৃজ। মনে হলো কেবলমাত্র অলৌকিকভাবেই আমরা বেঁচে থাকতে পারি।

"ঠিক সে সময় আখনুর থেকে ৩৬৮ বৃগেডের কমান্ডার আমাদের সাথে যোগ দিলেন। তিনি যখন এলেন চারপাশে কেবল ধ্বংস আর মৃত্যু। জীবিত

সৈন্যেরা সব পালাচ্ছে। একেবারে বিরাণ ভূমি। চারপাশে দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে আগুন। তাওয়াই নদীর পানি সৈনিকের রক্তে লাল হয়ে গেছে। একেবারে বিধ্বস্ত অবস্থা। এটা টিভিতে দেখা যুদ্ধের মতো বোতাম টিপে রকেট ছোঁড়ার মতো ছিলো না।

"সিও আমাকে আগে থেকেই চিনতেন। তিনি আমাকে বললেন, 'বলবান্ত সিং, কি হচ্ছে? আমাদের সব লোক গেলো কোথায়?' দুঃখ ভাড়াক্রান্ত হৃদয়ে তাকে বললাম, 'স্যার, আমাদের অনেকেই যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়েছে। শত্রুর প্রচণ্ড আক্রমণে তারা টিকতে পারে নি।' আমরা তিনটি ট্যাংক আর অসংখ্য লোক হারিয়েছিলাম।

"সিও বললেন, 'আমরা সবাই যদি এ রকম করি তবে যুদ্ধে জিতবো কিভাবে?' তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে আমাদেরকে পিছু হটতে হবে।'

"সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রতিবাদ করলাম। 'স্যারজি, আমাদের রেজিমেন্টের মটো হলো *নিশ্চয় কর আপনি জিত কারোন*—আমি বিজয়ের জন্যে লড়াই করি। লড়াই ছাড়া আমি পিছু হটবো না।'

" 'এ হলো সৈনিকের মতো কথা, বলবান্ত।' সিও আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বাকি লোক নিয়ে র‍্যালি করতে বললেন। প্লাটুনের দায়িত্ব অর্পন করলেন আমার উপর। আমাদের প্রথম কাজ হলো এক্ষুণি সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে মানদিয়ালা বৃজটা পূণর্দখলে নেয়া। গুর্খা রাইফেল্‌সের ডেল্টা কোম্পানিও আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত। আমাদের কাছে বেঁচে যাওয়া কিছু ৩১ ক্যাভালারির ট্যাংক ছিলো।

"সকাল বেলা শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ। আমাদের মিলিত আক্রমণে এবার শত্রুপক্ষ কিছুটা দিশেহারা হয়ে গেলো। আস্তে আস্তে আমরা সামনে এগোতে লাগলাম।

"এবার শত্রুপক্ষ নদীর ওপাড় থেকে তাদের ট্যাংকগুলো নিয়ে এগোতে শুরু করলো। আমরাও আমাদের ট্যাংক নিয়ে মুখোমুখি হলাম। প্রথম দিকে আমরা ট্যাংক নিয়ে ভালোই লড়াই করলাম কিন্তু পাকিস্তানীরা যখন তাদের আমেরিকান তৈরি প্যাটন ট্যাংক নিয়ে বৃজটা অতিক্রম করলো আমাদের দুটো ট্যাংক ফেলে সেনারা পালালো।

"আমি জানি না আমার মধ্যে কী হলো। দৌড়ে পরিত্যাক্ত একটা ট্যাংকের ঢাকনা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। ট্যাংক সমন্ধে অনেক কিছু জানলেও জীবনে কখনও ট্যাংক চালাই নি। তাই ওটার কন্ট্রোল নিতে বেশ কয়েক মিনিট লেগে গেলো। তবে এক পর্যায়ে আমার ট্যাংকটা চলতে লাগলে আমি

আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠলাম। আমার ট্যাংকটা শত্রুপক্ষের আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে উঠলো মুহূর্তেই। আমিও সেটার গন্তব্য ঠিক করলাম শত্রুপক্ষের বাঙ্কারের দিকে। যতোই আক্রমণ হোক না কেন আমি এগোতে লাগলাম। এক পর্যায়ে তারা বাঙ্কার ছেড়ে পালাতে শুরু করলো। অবশ্য তাদের দু'জন ট্যাংকের উপর ওঠার চেষ্টা করলে আমি ট্যাংকের লম্বা কামানটা ঘুরিয়ে তাদেরকে মাছির মতো তাড়িয়ে দিলাম। এরই মধ্যে আমাদের অন্য ট্যাংকগুলো শত্রুপক্ষের উপর আক্রমণ চালাতে শুরু ক'রে দিলো। বিশ মিনিটের মধ্যে কেবল একটা প্যাটন ট্যাংক রয়ে গেলো। বাকি সব উধাও। ওটা পালাতে গেলে আমি পিছু নিলাম। আমার ট্যাংকে কামানের গোলা ছুড়ে আঘাত হানলে আগুন ধরে গেলো তাতে। কিন্তু আমার ট্যাংকের কামান অক্ষত থেকে যাওয়ায় আমি প্যাটন ট্যাংকটাকে পাল্টা আঘাত হানতে সক্ষম হলাম। খুব কাছ থেকে আঘাত করাতে প্যাটন ট্যাংকটা বিধ্বস্ত হয়ে গেলো। আমি আমার সিও'কে ট্যাংকের ওয়্যারলেস থেকে জানালাম, 'শত্রুপক্ষের আটটি ট্যাংক ধ্বংস, স্যার। পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রণে।'

"মানদিয়ালা বৃজ এবার আমাদের কব্জায়। চারপাশে তখনও শত্রুর দল ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ছোটো ছোটো পকেট আছে শত্রু পক্ষের। বৃজের আশেপাশে কিছু মেশিনগান আর রকেট লাঞ্চার তখনও কার্যকর। সব চাইতে বড় কথা বৃজের উপর তখনও পাকিস্তানী পতাকা উড়ছে। পাকিস্তানী বাঙ্কারের দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। বাঙ্কার থেকে দশ গজ দূরে থাকতে একটা গ্রেনেড ছুঁড়ে মারলে তিনজন পাঁক সৈন্য নিহত হলো। তবে একজন সৈন্য অক্ষত রয়ে গেলো তখনও। রাইফেলটা তুলে গুলি করতে গিয়ে দেখি ওটা ফেঁসে গেছে। ঐ পাক সৈন্যটিও দেখে ফেললো সেটা। তার মুখে হাসি। নিজের অস্ত্রটা তুলে সে আমার দিকে গুলি করলো। এক ঝাঁক গুলি এসে লাগলো আমার বাম পায়ে। মাটিতে পড়ে গেলাম আমি। মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হলাম। সৈন্যটি কাছে এসে আমার বুকে রাইফেল ঠেকিয়ে ট্রিগারে চাপ দিলো কিন্তু গুলির শব্দ শোনা গেলো না। ক্লিক্। ক্লিক্। তার ম্যাগজিন খালি। 'নারায়ে তাকবির, আল্লাহ আকবার!' বলে সে বেয়নেট নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো আমার উপরে। আমিও 'জয় হিন্দ' বলে আমার রাইফেলের বাট দিয়ে সজোরে তার মাথায় আঘাত ক'রে তাকে হত্যা করলাম। অবশেষে আমি উঠে দাঁড়ালাম, খুড়িয়ে খুড়িয়ে বৃজের কাছে গিয়ে শত্রুর পতাকা নামিয়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে ফেললাম। বৃজে উড়িয়ে দিলাম তেরঙা—আমাদের পতাকা। এটা ছিলো আমার জীবনের সবচাইতে সুখের মুহূর্ত। যদিও জানতাম আমি আমার এক পা হারিয়েছি।"

বলবান্ত সিং কথা শেষ করলে আমরা দেখতে পেলাম তার দু'চোখ ভিজে গেছে।

এক মিনিটের মতো কেউ একটুও নড়লো না। এরপরই পুতুল বলবান্ত সিংয়ের কাছে তার স্কুলের খাতাটা বাড়িয়ে দিলো।

দু'চোখ মুছে বৃদ্ধ সৈনিক বললো, "আরে এটা কি? আমি তো তোমার হোমওয়ার্ক ক'রে দিতে পারবো না।"

"আমি হোমওয়ার্ক করতে বলছি না," বললো পুতুল।

"তাহলে এটা দিচ্ছো কেন?"

"আমি আপনার অটোগ্রাফ চাই। আপনি আমাদের নায়ক।"

সবাই হাত তালি দিলো।

ধ্যানেশ আবারো সেই প্রশ্নটা করলো। "তাহলে আপনি কোন্ পদক পেলেন এই যুদ্ধের জন্যে?"

বলবান্ত চুপ মেরে গেলো। তারপর তিক্তভাবে বললো সে, "কিছু না। তারা আমাদের রেজিমেন্টকে দুটো এমভিসি আর দুটো পিভিসি দিয়েছিলো। আমার তিনজন সহযোদ্ধা *সেনা মেডেল* পায়। তবে আমাকে তারা কিছু দেয় নি। এমনকি মুখেও কোনো স্বীকৃতি দেয় নি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে। "তবে চিন্তা কোরো না। যখনই আমি অজ্ঞাত সৈনিকের স্মরণে জ্বলতে থাকা অমর জ্যোতির জ্বলজ্বলে শিখার দিকে তাকাই, আমার মনে হয় ওটা আমার মতো সৈন্যদের জন্যেই জ্বলছে।"

আবারো সবাই চুপ মেরে গেলো। আচম্‌কা মিসেস ডামলে গাইতে শুরু করলো, *"সারা জাহা সে আচ্ছা হিন্দুস্থান হামারা..."* আমরাও যোগ দিলাম তাতে। আমি জানি না আমাদের বাচ্চাদের মধ্যে কী ঘটলো, আমরা সৈনিকের মতো মার্চ করতে লাগলাম। স্যালুট দিলাম এই সাহসী সৈনিককে।

তিনি আমাদের একজন বীর। বলবান্ত সিং আনন্দে কেঁদে ফেললো। *"জয় হিন্দ!"* কথাটা বলেই ঘর থেকে চলে গেলো সে।

মিঃ ওয়াগেল ডায়াসে এসে ঘোষণা দিলো, "বন্ধুরা, আগামীকাল সৈনিক কল্যাণ তহবিল ফান্ডের একটি দল আমাদের এখানে আসবে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী সবাইকে আহ্বান জানিয়েছেন আমাদের সৈনিকদের সাহায্যে আমরা যেনো এগিয়ে আসি। আমি আশা করবো আপনারা সবাই নিজেদের পকেট উজাড় ক'রে দান করবেন।"

"কিন্তু আমাদের নিজেদের মধ্যে থাকা সৈনিকের কি হবে? আমাদের কি উচিত না তাকে সাহায্য করা?" মিঃ শিরকে বললো।

সবাই সমস্বরে বললো "হ্যা! হ্যা!"

"হ্যা! আপনারা ঠিকই বলেছেন। তবে আমার মনে হয় বলবান্ত সিং ১৯৭১ সালে যে বীরত্ব দেখিয়েছে সেটার স্বীকৃতি আদায় করাটাই হবে তার জন্যে সবচাইতে বড় সাহায্য। আগামীকাল এসবিএফ থেকে যারা আসবে তাদের কাছে আমরা এ দাবি জানাবো।"

আমরা সবাই বেশ উত্তেজনা বোধ করলাম। মনে হলো আমরা বুঝি সত্যি একটা ভালো কাজ করতে যাচ্ছি।

তারা তিনজন এলো। লম্বা মতো একজন বেটেখাটো আর মোটাসোটা দু'জন। সবাই সাবেক সেনা কর্মকর্তা। লম্বা যিনি তিনি নেভিতে ছিলেন, বেটে মতো লোকটা সশস্ত্রবাহিনীতে আর মোটা লোকটি বিমান বাহিনীর। বেটে খাটো লোকটা দীর্ঘ একটা বক্তব্য দিলেন। তারপর দানবাক্সে সবাই যে যার মতো দান করতে শুরু করলো। বলবান্ত সিং উপস্থিত নেই। বলে পাঠিয়েছে তার নাকি জ্বর এসেছে।

এরপরই শুরু হলো প্রশ্ন করার পালা। "আপনি কি কোনো যুদ্ধে লড়াই করেছেন?" আর্মির লোকটাকে কুলকার্নি জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যা, অবশ্যই। আমি ১৯৬৫ আর '৭১-এর যুদ্ধ করেছি।"

"৭১-এ আপনি কোথায় যুদ্ধ করেছেন?"

"চাম্বে। ওখানে সবচাইতে বড় যুদ্ধটা হয়েছিলো।"

"আপনার রেজিমেন্ট কোন্‌টা ছিলো?"

"আমি শিখ রেজিমেন্টে ছিলাম।"

"৭১-এর যুদ্ধের জন্যে আপনি কি কোনো মেডেল পেয়েছেন?"

"আমি বীরচক্র পদক পেয়েছি। এটা খুবই সম্মানের ব্যাপার।"

"কোন্ কারণে এটি আপনি পেয়েছেন?"

"মানদিয়ালা বৃজের যুদ্ধের জন্যে। সেখানে ৩৫ জন শিখ দারুণ যুদ্ধ করেছিলো।"

"আপনি কি ধরণের লোক, নিজে মেডেল পেয়েছেন অথচ অন্যদের কৃতিত্ব অস্বীকার করেছেন। যে আপনার বৃজ দখল নিতে সাহায্য করেছে সে কী পেয়েছে?"

"আমি দুঃখিত, বুঝতে পারলাম না। কার কথা বলছেন?"

"আমরা আমাদের এখানকার এক শিখ যোদ্ধার কথা বলছি যে ৭১-এ চাম্বে দারুণ যুদ্ধ করেছে, তার পরম বীর চক্র পাওয়ার কথা। যুদ্ধে সে এক পা হারিয়েছে। সে তো কিছুই পায় নি, কান্না ছাড়া। আমরা সিভিলিয়ান, কর্নেল

সাহেব, আমরা আপনাদের আর্মির নিয়মকানুন বুঝি না। তবে এটুকু বুঝি ঐ লোকটার সাথে অন্যায় করা হয়েছে। তার জন্যে কি আপনারা এখন কিছু করতে পারেন? সম্মান জানানোর জন্যে কখনও দেরি হয় না।"

"সেই মহান সৈনিকটি কোথায়?"

"সে আমাদের চাউলেই আছে।"

"সত্যি? তাহলে তো ভালোই হলো। তাকে সম্মান জানাতে পারলে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করবো।"

আমরা তাকে বলবান্ত সিংয়ের ঘরের সামনে নিয়ে গেলাম। কর্নেল সাহেব একাই ঢুকলেন ঘরে। আমরা চারপাশে ঘুরঘুর করলাম। উঁকি ঝুঁকি না মেরে থাকতে পরালাম না।

উচ্চকণ্ঠের বাদানুবাদ শুনতে পেলাম আমরা। তারপর ধুপধাপ শব্দ। দশ মিনিট পর কর্নেল সাহেব রেগেমেগে বের হয়ে এলেন। "এই লোকটার কথা আপনারা বলছেন, যে পিভিসি পায় নি? সে একটা মহা হারামি। তার মতো শয়তান আমি জীবনেও দেখি নি। ঐ শূয়োরটাকে গলায় দড়ি বেঁধে এখান থেকে নিতে পারলে ভালো হোতো।"

"আমাদের বীরকে নিয়ে আপনি এতো বাজে কথা বলার সাহস কোত্থেকে পেলেন?" মিসেস ডামলে বললো।

"বীর? যোদ্ধা? এটা তো সবচাইতে বড় ঠাট্টা হয়ে গেলো। সে একজন পালানো সৈনিক। চাম্ব সেক্টরে আক্রমণ শুরু হতেই কাপুরুষের মতো ভেগেছে ওখান থেকে। সে হলো শিখ রেজিমেন্টের কুলাঙ্গার। তার চৌদ্দ বছর জেল হওয়া উচিত ছিলো। দুভার্গ্য যে, পলায়ন সৈনিকদের কেসগুলো পাঁচ বছর পরই ক্লোজ ক'রে দেয়া হয়। তা না হলে তার বিরুদ্ধে এখনই আমি রিপোর্ট করতাম।"

আমরা হতবাক। "আপনি বলছেন কি, কর্নেল সাহেব? সে তো চাম্বের ঘটনা পুঙ্খনাপুঙ্খভাবে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছে। যুদ্ধে এমন কি সে এক পাও হারিয়েছে।"

"এটা একেবারে মিথ্যে। আমাকে ওর সত্য কাহিনীটা বলতে দিন। সেটাও হৃদয় বিদারক।" কর্নেল সাহেব একটু থামলেন। "যুদ্ধ যখন শুরু হয় বলবান্ত সিংয়ের মনের অবস্থা তখন খুব খারাপ। কারণ পাঠানকোটে তার বউ সদ্য এক ছেলে সন্তানের জন্ম দিয়েছে। পরিবারের কাছে ফিরে যাবার জন্যে সে ব্যাকুল ছিলো। ঠিক সে সময় পাকিস্তান আক্রমণ ক'রে বসলে সে যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালিয়ে নিজের বাড়িতে চলে যায়। সে হয়তো ভেবেছিলো যুদ্ধ থেকে বহু দূরে চলে গেছে, কিন্তু যুদ্ধ আসলে তার পিছু ছাড়ে নি। দু'দিন পর

পাকিস্তান এয়ারফোর্স পাঠানকোটে বিমান হামলা চালায়। তারা আমাদের বিমান ঘাঁটির কোনো প্লেনকে টার্গেট করতে পারে নি। এয়ার বেইসের কাছে একটা বাড়িতে বোমা পড়লে সেটা একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। পরে দেখা গেলো ঐ বাড়িটা বলবান্ত সিংয়ের। তার বউ আর নবজাতক তখনই মারা যায়। আর বোমার শার্পনেইলের আঘাতে নষ্ট হয় তার এক পা।"

"কিন্তু...যুদ্ধের এতো নিখুঁত বর্ণনা সে কিভাবে দিতে পারলো?"

কর্নেলের মুখটা তিক্ত হয়ে উঠলো। "আমি জানি না সে আপনাদের কাছে কোন্ গল্প করেছে, কিন্তু ছাব্বিশ বছর দীর্ঘ সময়, আর এ সময়ে বড় বড় সব যুদ্ধের কথাই লেখা হয়ে গেছে। সেটা হয়তো সে পড়ে থাকবে। বানচোতটা আপনাদেরকে ধোকা দিয়েছে। সস্তা সম্মান অর্জন করেছে। তাকে দেখে আমার দিনটাই মাটি হয়ে গেলো। দিনটা মোটেও ভালো নয়। গুড বাই।"

কর্নেল মাথা দোলাতে দোলাতে আমাদের চাউল থেকে বের হয়ে গেলেন। আমরা ফিরে এলাম বাঙ্কারে। আমাদের জন্যেও দিনটা ভালো ছিলো না। ভাবলাম বলবান্ত সিং এখন কী করছে কে জানে। সেই রাতে সে আর ঘর থেকে বের হলো না।

পর দিন সকালে তাকে পাওয়া গেলো। নিজের ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে সে।

পুলিশের জিপ এলো। আশেপাশে যারা থাকে তাদের সবাইকে রূঢ়ভাবে জিজ্ঞাসাবাদও করলো তারা। বলবান্তের লাশের ছবি তুললো এক ফটোগ্রাফার। সাদা কোট পরা এক ডাক্তার এলে বলবান্তের ঘরের চারপাশে ভীড় লেগে গেলো।

চাউলের সব বাসিন্দাদের সামনে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো তার লাশ। কেউ কিছু বললো না। আমি সেলিম আর পুতুল তাদের পেছন থেকে সব দেখলাম। আবারো বুঝতে পারলাম যুদ্ধ কোনো ঠাট্টার বিষয় নয়। এটা খুবই মারাত্মক একটি বিষয়। এতে প্রাণহানি ঘটে।

স্মিতার মুখটা খুব বিষন্ন দেখাচ্ছে।

"যুদ্ধের সময় আপনি কোথায় ছিলেন?" তাকে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"এখানে, এই মুম্বাইতে," জবাব দিয়ে সে তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পাল্টালো। "চলো, পরের প্রশ্নটা দেখি।"

প্রেম কুমার চেয়ারে ঘুরে আমাকে বললো, "মিঃ টমাস, ইতিমধ্যে দুই লাখ রুপি জিতে নিয়েছো তুমি। দেখা যাক আট নাম্বার প্রশ্নের জবাব দিয়ে পাঁচ লাখ রুপি জিততে পারো কিনা। তুমি রেডি?"

"আমি রেডি," জবাবে বললাম।

"ঠিক আছে। আট নাম্বার প্রশ্ন। ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীতে সর্বোচ্চ খেতাব কোন্‌টি? এটা কি এ) মহা বীর চক্র, বি) পরম বীর চক্র, সি) শৌর্য বীর চক্র, নাকি ডি) অশোক চক্র?"

সাসপেন্সের মিউজিক বাজতে শুরু করলো। সেই সাথে ঘড়ির টিকটিক শব্দ। দর্শকদের মধ্যে গুঞ্জন। তারা আমার দিকে সহমর্মিতার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। বেচারা ওয়েটারকে এবার বিদায় নিতেই হবে।

"বি! পরম বীর চক্র," আমি বললাম।

প্রেম কুমার ভুরু তুললো। "তুমি কি জবাবটা জানতে, নাকি আন্দাজে বললে?"

"জবাবটা আমি জানতাম।"

"তুমি কি একশত ভাগ নিশ্চিত?"

"হ্যাঁ।"

ড্রামের বাজনা বাজতে লাগলো। সঠিক জবাবের লেখাটা ভেসে উঠলো পর্দায়।

"একদম ঠিক, একশত ভাগ ঠিক!" চিৎকার ক'রে প্রেম কুমার বললো। দর্শকেরা হাত তালিতে ভরিয়ে তুললো পুরো হল। কেউ কেউ 'ব্রাভো!' বলেও চিৎকার দিলো। আমি হাসলাম। প্রেম কুমার একটুও হাসলো না।

বুঝতে পেরে স্মিতাও মাথা দোলাতে লাগলো।

লাইসেন্স টু কিল

উদাস হয়ে মুম্বাইর পথেঘাটে হাটলে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়। কলার খোসায় পা পড়ে পিছলে যেতে পারেন। হঠাৎ ক'রে খেয়াল করবেন, আপনি কুকুরের মলের উপর পা দিয়ে বসে আছেন। পথেঘাটে খোদাই ষাড় এসে আপনাকে তাড়া দিতে পারে। অথবা পুরনো কোনো বন্ধু যাকে আপনি এড়াতে চাইছেন সে হয়তো ঠিক আপনার সামনে পড়ে গেলো। জড়িয়ে ধরলো আনন্দের আতিশয্যে।

এরকমই ঘটনা ঘটলো আমার বেলায়, ১৭ই জুন মহালক্ষ্মী রেসকোর্সের সামনে। আমার সাথে ধাক্কা লাগলো সেলিম ইলিয়াসির। পাঁচ বছর পর।

তিন মাস আগে আগ্রা থেকে মুম্বাই যখন এলাম আমি ঠিক করেছিলাম সেলিমের সাথে দেখা সাক্ষাত করবো না। সিদ্ধান্তটা ছিলো খুব কঠিন। দীর্ঘ দিন ধরে তাকে আমি মিস্ করেছি। অবশ্য তখন আমি দিল্লি আর আগ্রায় ছিলাম। কিন্তু এখন একই শহরে থেকেও তার সাথে যোগাযোগ না করাটা খুব কষ্টের। তবে কুইজ শো'তে অংশ নেবার যে পরিকল্পনা আমি করেছি তাতে সেলিমকে না জড়ানোর ব্যাপারে আমি দৃঢ়প্রতীজ্ঞ।

"মোহাম্মদ!" আমাকে দেখামাত্র সেলিম চিৎকার ক'রে বললো। "তুই মুম্বাইতে কি করছিস? কবে এলি? এতোগুলো বছর কোথায় ছিলি?"

আমি ভাবতে লাগলাম আমাদের এই পুনর্মিলনীর ফলে কি আমাদের মধ্যেকার আগের মতোই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অটুট থাকবে? আমরা কি আগের মতোই একে অন্যের প্রতি সৎ থাকবো?

প্রথমে আমরা খুব বেশি কথা বললাম না। কাছের একটা বেঞ্চে বসে রইলাম। আমরা কেবল একে অন্যেকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে গেলাম নিঃশব্দে। দীর্ঘ দিন এক সঙ্গে থাকার জন্যে, দীর্ঘ দিন বিচ্ছেদের জন্যে। তারপরই এতোগুলো বছরে কি কি ঘটেছে সব বলতে লাগলাম দু'জনে। বলা ভালো, সেলিমই বেশি বললো, আমি কেবল শুনে গেলাম।

সেলিম খুব লম্বা হয়ে গেছে, দেখতে আগের চেয়েও সুন্দর লাগছে তাকে। ষোলো বছর বয়সে দেখতে সে যে কোনো বলিউড নায়কের চেয়েও বেশি হ্যান্ডসাম। শহরের কঠিন জীবন সংগ্রাম আমার মতো তার চেহারা সুরতে কোনো প্রভাব ফেলতে পারে নি। এখনও সে হিন্দি ছবি দেখতে পছন্দ করে, বলিউডের নায়কদের পূজা করে (কেবল আরমান আলীকে বাদে)। প্রতি শনিবার সে এখনও হাজি আলীর মাজারে গিয়ে নামাজ পড়ে। সবচাইতে বড় কথা জ্যোতিষের ভবিষ্যৎবাণী সত্যি হতে চলেছে। সে আর ডাব্বাওয়ালার কাজ করে না। এখন সে অভিনয় স্কুলে ভর্তি হয়েছে অভিনয় শেখার জন্যে।

"তুই জানোস আমার অভিনয় শেখার টাকা কে দেয়?" আমাকে বললো সে।

"না।"

"আব্বাস রিজভি।"

"ঐ যে বিখ্যাত ডিরেক্টর, অনেকগুলো হিট ছবি বানিয়েছে?"

"হ্যা, তার কথাই বলছি। দু'বছর বাদে তার একটা ছবিতে আমি নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করবো। এতোদিন পর্যন্ত আমি প্রশিক্ষণ নিতে থাকবো।"

"এটা তো দারুণ ব্যাপার। তো কিভাবে সম্ভব হলো?"

"লম্বা এক কাহিনী।"

"আমার জন্যে কোনো গল্পই লম্বা নয়, সেলিম। শুরু থেকে বল।"

তো এই হলো সেলিমের নিজের মুখে বলা গল্প :

"তুই আচম্‌কা আমাকে ছেড়ে চলে গেলে আমি চাউলে একা হয়ে পড়ি। আরো চার বছর ডাব্বাওয়ালার কাজ করি আমি। তবে অভিনেতা হবার স্বপ্নটা ঠিকই বুকে চেপে রেখেছিলাম।

"একদিন মুকেশ রাওয়াল নামের এক কাস্টমারের বাড়ি থেকে টিফিন ক্যারিয়ার নিতে গিয়ে তার ঘরের দেয়ালে তার সঙ্গে বড় বড় ফিল্মস্টারের ছবি দেখতে পাই। মিসেস রাওয়ালকে জিজ্ঞেস করলে জানতে পারি তার স্বামী চাকরির পাশাপাশি পার্ট টাইম ছবিতে কাজ করে জুনিয়র আর্টিস্ট হিসেবে।

"কথাটা শুনে পুলকিত হলাম। সেই বিকেলেই মুকেশ রাওয়ালের অফিসে গিয়ে তাকে জানালাম আমি তার মতো জুনিয়র আর্টিস্ট হতে চাই। আমাকে ভালো ক'রে দেখে হেসে ফেললো সে। বললো আমি নাকি কম বয়সী। তবে অল্প বয়সী চরিত্রে আমাকে নেয়া যায় কিনা সেটা জুনিয়র আর্টিস্ট সাপ্লায়ার পাপ্পু মাস্টারকে বলে দেখবে। আমাকে কিছু ছবি তুলে দিতে বললো

মুকেশজি। পাপ্পু যদি ছবি দেখে পছন্দ করে তবে আমার চান্স পাওয়া যাবে। তবে ছবিগুলো তুলতে হবে প্রফেশনাল স্টুডিওতে।

"সেই রাতে আমি ঘুমাতে পারি নি। পরদিন আমি এক ফটোগ্রাফারের কাছে গেলে সে আমার কাছে বিশাল অঙ্কের টাকা চেয়ে বসে। আমার পুরো মাসের উপার্জনের সমান সেটা। তাকে যখন বললাম এতো টাকা আমার পক্ষে দেয়া সম্ভব নয় তখন সে আমাকে বললো আমি যেনো সস্তায় একটা ডিসপোজেবল ক্যামেরা কিনে নিজেই ছবি তুলি, ঐ ছবি থেকে সে আমার ছবি বড় ক'রে দিতে পারবে। কথামতো কাজ করলাম আমি। পথ ঘাটের লোকজনকে দিয়ে আমি নিজের ছবি তোলালাম। অন্য কারোর মোটর সাইকেলে বসে অমিতাভের মতো পোজ দিলাম। বিচে বসে অক্ষয় কুমারের মতো অ্যাকশান ছবি তুললাম। সান অ্যান্ড স্যান্ড হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে ঠিক হৃত্বিক রোশানের ভঙ্গি করলাম। জনি ওয়াকারের খালি বোতল হাতে নিয়ে দেবদাসের শাহ্রুখ খানের মতো মাতাল সাজলাম। মোট বিশটি ছবি তুললাম এভাবে। কিন্তু রোলে ছত্রিশটি ছবি তোলার মতো জায়গা ছিলো। তাই ঠিক করলাম সুন্দর সুন্দর বিল্ডিং আর লোকজনের ছবি তুলে শেষ করে দেই রোলটা। এভাবে মহিমের একটা বেঞ্চে বসা এক লোকের ছবি তুলে আমি তো থ বনে গেলাম।"

"মানে?" আমি জানতে চাইলাম। "সে কি ঐ কুত্তার বাচ্চা আরমান আলী ছিলো?"

"না, মোহাম্মদ। তুইও ওকে ভালো ক'রে চিনিস। মিঃ বাবু পিল্লাই, মানে মামান। যে লোক আমাদেরকে দিল্লি থেকে এখানে নিয়ে এসে অন্ধ করে ফেলতে চেয়েছিলো।"

"হায় ঈশ্বর!" আমি মুখ চাপা দিলাম। "সে কি তোকে চিনতে পেরেছিলো?"

"হ্যা। 'তুই সেলিম না? তুই তো আমার ওখান থেকে পালিয়েছিলি। এবার কিন্তু পালাতে পারবি না।' চিৎকার করে বলেই আমার দিকে তেড়ে এলো সে।

"আমি কোনো কিছু না ভেবেই এক দৌড় লাগালাম। উঠে পড়লাম চলন্ত একটা বাসে।

"বাসে বসে ভাবছি তার কাছ থেকে কতো সহজেই না পালাতে পারলাম। তখন কি ঘটলো জানিস?"

"কি?"

"একটা ট্রাফিক লাইটে বাসটা থামলে মাথায় পট্টি বাধা আর হাতে নাঙ্গা তলোয়ার হাতে একদল লোক বাসে উঠে গেলো।"

"হায় হায়! ওরা নিশ্চয় দাঙ্গাকারী ছিলো না?"

"দাঙ্গাকারীই ছিলো। তখনই বুঝতে পারলাম একটা দাঙ্গাপীড়িত এলাকায় বাসটা এসে পড়েছে। আমাদের আশেপাশে গাড়ি ভাঙচুর আর আগুন জ্বলছে। পথেঘাটে রক্ত। ইট পাথরে একাকার চারদিক। ড্রাইভার সঙ্গে সঙ্গে বাস থেকে নেমে পালালো। ভয়ে আমি কাঠ হয়ে গেলাম। আমি ভেবেছিলাম এ জীবনে এরকম নারকীয় দৃশ্য আর দেখবো না। আমার মায়ের আর্ত চিৎকার আমার ভায়ের আর্তনাদ কানে শুনতে পেলাম। দাঙ্গাকারীরা বললো একজন মুসলমান নাকি কোনো হিন্দুর বাড়িতে আগুন দিয়েছে, তাই এখন তারা প্রতিশোধ নেবে। আমি জানতে পারলাম আসল ঘটনা বস্তির পানির কলের সামনে লাইন নিয়ে তুচ্ছ ঘটনা থেকে শুরু হয়েছে। কিন্তু লোকজন গুজবে কান দিয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। চারদিকে শুরু হয়ে গেছে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ।

" 'সবাই যার যার নাম বলুন। যারা হিন্দু তারা বাস থেকে নেমে চলে যেতে পারবে, কিন্তু যারা মুসলিম তারা বাসেই বসে থাকবে।' দাঙ্গাকারীরা বললো। একে একে যাত্রীরা নিজেদের নাম বলতে লাগলো। অরবিন্দু। উষা। যতীন। অরুণ, বাসন্তী, জগদিশ, নমর্দা, গঙ্গা, মিলিন্দ। বাসটা খালি হতে শুরু করলো। একটা ছেলেকে সন্দেহ হলে তারা এমনকি তার প্যান্ট খুলে লিঙ্গ পরীক্ষা করলো। খুবই বর্বর আর পৈশাচিক ব্যাপার। আমি আমার সিটে বসে কাঁপছি তখন। অবশেষে মাত্র দু'জন যাত্রী বাসে রয়ে গেলো। আমি আর আমার দুই সিট পেছনে এক লোক।

" 'তোর নাম কি? দলনেতা আমাকে জিজ্ঞেস করলো।

"আমি বলতে পারতাম রাম অথবা কৃষ্ণ। কিন্তু আমার জবান বন্ধ হয়ে রইলো। একজন দাঙ্গাকারী আমার গলার তাবিজের দিকে ইঙ্গিত ক'রে বললো, 'এই বানচোতটা নির্ঘাত মুসলিম। এসো, তাকে হত্যা করি।' সবাইকে বললো সে।

" 'হত্যা করলে তো বেঁচেই গেলো। এই মাদারচোদকে আমরা বাসের মধ্যেই জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবো। তবেই কেবল তার সম্প্রদায়ের লোকজন শিক্ষা পাবে আমাদের ঘরে আগুন দেবার মজা কেমন,' দলনেতা হেসে উঠলো। আরেকজন লোক ক্যান থেকে পেট্রোল ঢালতে শুরু করলো বাসের মধ্যে।

"আমার দুই সিট পেছনে বসা লোকটা আচম্‌কা উঠে দাঁড়ালো। 'তোমরা তো আমার নামটা জিজ্ঞেস করলে না। তাহলে শোনো, আমার নাম আহমেদ খান। আর যে বানচোত এই ছেলের গায়ে হাত দেবে তাকে আমি দেখে নেবো,' সে বললো।

"কয়েক মুহূর্তের নীরবতা নেমে এলো। তারপর দাঙ্গাকারীদের দলনেতা

বললো, 'আচ্ছা তাহলে তুইও মুসলিম। ভালো, তোকেও আগুনে পুড়িয়ে মারবো।'

"লোকটা একটুও ঘাবড়ালো না। 'আমাকে আগুনে পোড়াবার আগে এই জিনিসটা একটু দেখে নে,' একটা রিভলবার বের করলো সে। দাঙ্গাবাজদের দিকে তাক্ করলো সেটা।

"তাদের চোখগুলো যদি দেখতি। যেনো কোটর থেকে বের হয়ে আসছে। হাতের তলোয়ার ফেলে নিজেদের প্রাণপ্রিয় জীবনটা নিয়ে পড়িমরি ক'রে বাস থেকে নেমে দৌড়ে পালালো সব দাঙ্গাবাজ। কৃতজ্ঞতায় আমার দু'চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়লো।

"লোকটা আমাকে কাঁদতে দেখে বললো, 'তোমার নাম কি?' "

"সেলিম... সেলিম ইলিয়াসি," জবাবে আমি বললাম।

" 'আরে মিথ্যে কিভাবে বলতে হয় তুমি জানো না?' সে বললো। 'তবে যারা মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েও সত্য বলে আমি তাদেরকে সম্মান করি।'

"সে আমাকে জানালো তার ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের ব্যবসা আছে। বাইকুল্লা এলাকায় একাই থাকে সে। বললো তার একজন রান্নাবান্না আর ঘরদোড় সাফ করার লোক লাগবে। সে যখন ব্যবসার কাজে বিদেশ যাবে তার বাড়িটাও দেখেশুনে রাখতে হবে। আমি ভাবলাম তার মতো একজন ব্যবসায়ী বাসে অস্ত্র বহন করে কেন। যাহোক, আমি মাসে যা আয় করি তার দ্বিগুণ বেতন দেবার কথা বললে আমি তার বাড়ির কাজটা নিতে রাজি হয়ে যাই।

"আহমেদের বাড়িটা বিশাল একটা ফ্ল্যাট। তিনটা বেডরুম, কিচেন, ড্রইংরুম আর ছত্রিশ ইঞ্চির বিশাল একটা টিভি আছে ওখানে। আমি ওখানে রান্নাবান্নার কাজ করলেও অভিনেতা হবার স্বপ্নটা লালন করতে থাকলাম। আহমেদের সাথে কাজ করাটা বেশ আরামদায়ক ছিলো। বেশির ভাগ সময়ই সে বিদেশে থাকতো। সে সময় আমি স্টুডিওগুলোতে ঢুঁ মারতাম। ছবির রোলটা থেকে ছবি তুলে আমি মুকেশ রাওয়ালকে দিলে সে আবার ছবিগুলো পাপ্পু মাস্টারকে দিয়ে দিলো। বিশ্বাস কর, তিন মাস পরই আমি ছবিতে অভিনয় করার অফার পেয়ে যাই।"

"তাই নাকি?" অবাক হলাম আমি। "কোন্ রোলে, কোন্ ছবিতে?"

"আব্বাস রিজভির *ব্যাড বয়েজ* ছবিতে কলেজ ছাত্রের ভূমিকায়। নায়ক ছিলো সুনীল মেহরা।"

"তাহলে চল, এক্ষুণি ছবিটা দেখে আসি। আমি তোর ছবি দেখতে পেলে খুব খুশি হবো।"

"মানে..." সেলিম ইতস্তত করলো। "আমার রোলটা শেষ মুহূর্তে কেটে

ফেলে দেয়া হয়েছে। তাই পর্দায় আমাকে মাত্র তিন সেকেন্ডের জন্যে দেখা যায়, তাও আবার অনেক ছাত্রের সঙ্গে বসে থাকা অবস্থায়।"

"কি?" হতাশ হলাম আমি। "মাত্র তিন সেকেন্ড! এটা আবার কেমন রোল হলো?"

"জুনিয়র আর্টিস্টদেরকে এরকম রোল করতে হয়। ছোটোখাটো রোল করতে করতেই একদিন বড় সুযোগ চলে আসে। এভাবেই তো আমার সাথে প্রডিউসার আব্বাস রিজভির পরিচয় হয়েছে। আমাকে দেখে তিনি পছন্দ করেছেন, কথা দিয়েছেন তার পরের ছবিতে বড় একটা রোল দেবেন।

"পরবর্তী ছয় মাসে আমি আহমেদের অনেক কিছু জানতে পারলাম। সে একজন রহস্যময় লোক। জীবনে তার দুটো জিনিসের প্রতিই আগ্রহ ভালো খাবার খাওয়া আর টিভি দেখা। টিভিতে সে কেবল দুটো অনুষ্ঠান দেখতো। ক্রিকেট আর *মুম্বাই ক্রাইম ওয়াচ*। ক্রিকেটের ব্যাপারে সে বেশি আগ্রহী ছিলো। ইন্ডিয়া খেলুক আর না খেলুক, যেকোনো ম্যাচই সে দেখতো। এমনকি মাঝরাত ভোররাত হলেও সে ঘুম থেকে উঠে দেখতো। কেনিয়া আর কানাডার মতো নতুন টিমের খেলাও সে মিস্ করতো না।

"তার কাছে একটা ডায়রি ছিলো যাতে সব ধরণের ক্রিকেট পরিসংখ্যান রেকর্ড করা ছিলো। প্রত্যেক ব্যাটসম্যানের রানসংখ্যা, গড় রান তার মুখস্ত ছিলো বলা চলে। বোলারদের পরিসংখ্যানও তার জানা ছিলো। মোট কথা ক্রিকেটের সবই ছিলো তার নখদর্পনে।

"তবে এসবই করতো একটা উদ্দেশ্যে—ক্রিকেট ম্যাচে বেটিং করার জন্যে। ইন্ডিয়া-ইংল্যান্ড সিরিজের সময় আমি এটা আবিষ্কার করি। টিভিতে ম্যাচ দেখার সময় আহমেদ কাউকে ফোন করার চেষ্টা করতে থাকলে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আহমেদ ভাই কি করছেন?'

" 'আমি *সাট্টা* খেলবো এখন,' সে জবাবে বললো।"

"সাট্টা? এটা আবার কি?"

" 'বেটিং খেলার আরেক নাম। মুম্বাইর শক্তিশালী আন্ডারওয়ার্ল্ড এটার ব্যবস্থা করে। তাদের একটা সিন্ডিকেট আছে। লক্ষ কোটি রুপির খেলা এটি। প্রত্যেক ক্রিকেট ম্যাচে কোটি কোটি রুপির বাজি ধরা হয়। প্রতি বলে ধরা হয় হাজার হাজার রুপি। আমি হলাম এই খেলার বড় একজন খেলোয়াড়। এই যে বিশাল ফ্ল্যাট, টিভি, এয়ারকন্ডিশন, সবই সাট্টা খেলার পয়সায় করেছি। তিন বছর আগে ইন্ডিয়া-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে আমি বড় একটা দান মারি। ইডেন গার্ডেনের ঐ বিখ্যাত ম্যাচটার কথা মনে আছে তোমার? একসময় ইন্ডিয়া যখন ইনিংস পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে তখন ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে বাজির দর ছিলো হাজারে

এক। আমি লক্ষ্মনের উপর বাজি ধরে দশ লাখ রুপি জিতে যাই!'

"দশ লাখ! আমার চোখ দুটো গোল গোল হয়ে গেলো।

" 'হ্যা! আজ আমি ইন্ডিয়ার উপর দশ হাজার টাকার বাজি ধরেছি। আমি আমার বুকির কাছ থেকে বাজির দর জানার জন্যে লাইন পাচ্ছি না।' অধৈর্য হয়ে সে বার কয়েক নিজের মোবাইলটা সোফায় আঘাত করলো। অনেকবার করার পর একবার লাইন পেয়ে গেলো সে। 'হ্যালো, শারদ ভাই? এ.কে বলছি। কোর্ড ৩৫৬৩। আজকের ম্যাচে দর কতো?' আমি বুকির কথাটা শুনতে পেলাম অপরপ্রান্ত থেকে, প্রচুর ঘরঘর শব্দের ভেতর দিয়ে। 'ইন্ডিয়া ইতিমধ্যে ইংল্যান্ডের চেয়ে ১৭৫ রানে এগিয়ে আছে। এই লিডটা যদি ২৫০ ছাড়িয়ে যায় তবে ইন্ডিয়ার পক্ষে দর বেড়ে যাবে। তখন হয়তো তিনে এক হবে।'

" 'ইংল্যান্ডের বিজয়ী হবার দর কতো?' আহমেদ জানতে চাইলো।

" 'পাগল হয়েছো নাকি?' বুকি জবাবে জানালো। 'ইংল্যান্ডের জেতার কোনো উপায় নেই। বড়জোর তারা ড্র করতে পারে। তবে তুমি যেহেতু দর জানতে চেয়েছো তাই বলছি, আটে এক। তুমি কি এখনই বুক করবে?'

" 'হ্যা, ইন্ডিয়া হারার উপর আমি দশ হাজার টাকা বাজি রাখলাম।' আহমেদ বললো।

"আমি এ কথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেলাম। কারণ ইন্ডিয়ার অবস্থা খুব ভালো। তবে এটাও ঠিক, বুকিদের চেয়ে আহমেদ অনেক বেশি জানে। কারণ শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো ইংল্যান্ডই বিজয়ী হয়েছে। 'হা! দারুণ!' আহমেদ উচ্ছ্বাসে বলেই বুকিকে ফোন করলো। 'বলেছিলাম না, ইংল্যান্ড জিতবে? কতো পেলাম আমি? আশি হাজার? মন্দ নয়।'

"আহমেদ একটা শ্যাম্পেনের বোতল নিয়ে সাবাড় ক'রে দিলো। ঐদিন আমিও জীবনে প্রথমবারের মতো শ্যাম্পেনে চুমুক দিলাম।

"আহমেদের দ্বিতীয় আগ্রহের বিষয় হলো *মুম্বাই ক্রাইম ওয়াচ* নামের টিভি অনুষ্ঠান। ওটা কি তুই দেখেছিস?"

"না। দিল্লিতে ওটা দেখা যায় না।"

"যাইহোক, খুবই বিরক্তিকর একটি প্রোগ্রাম। কেবল খুন খারাবি আর অপরাধের সংবাদ।

"আহমেদ শিক কাবাব নিয়ে বসে বসে *মুম্বাই ক্রাইমওয়াচ* দেখতো আর হত্যার খবরগুলো শুনে উচ্চস্বরে হাসতো। কোনো এক কারণে সে এই অনুষ্ঠানটি দেখে বেশ মজা পেতো।

"মাঝে মধ্যেই আহমেদ কুরিয়ারে ক'রে হলুদ রঙের বড় এনভেলপ পেতো। আমাকে বেশ কড়াভাবে বলে দেয়া হয়েছিলো ওসব যেনো খুলে না

দেখি। ডাইনিং টেবিলে রেখে দেই। কিন্তু একদিন ভুলে ওরকম এনভেলপের উপড়ে আমি চা ফেলে দিলে ঘাবড়ে যাই। জানতাম আহমেদ যদি দেখে আমি তার এনভেলাপ নষ্ট করেছি ভীষণ ক্ষেপে যাবে। ওটার ভেতরে হয়তো মূল্যবান ব্যবসায়ীক দলিল-দস্তাবেজ আছে। তাই আমি খুব সাবধানে এনভেলপের আঠা দিয়ে লাগানো ফ্ল্যাপটা খুলে ভেতরের কাগজটা দেখে আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম।"

"কেন? সেটা কি ছিলো?"

"তেমন কিছু না। ওটাতে এক লোকের একটা ছবি আর টাইপ করা কিছু কথা লেখা ছিলো। আমি ঐ লেখাটুকু পড়তে পারলাম। ওটাতে লেখা ছিলো :

নাম : বিথাল ভাই ঘোরপাড়ে।
বয়স : ৫৬
ঠিকানা : ৭৩/৪, মার্ভ রোড, মালাদ।

"ধরে নিলাম এটা কোনো ব্যবসায়ীর ডিটেইল। আহমেদ হয়তো তার সাথে ব্যবসা করছে। এ নিয়ে আর খুব বেশি ভাবলাম না। সাবধানে এনভেলপের ভেতর ছবি আর কাগজটা রেখে আবার আঠা লাগিয়ে ডাইনিং টেবিলে রেখে দিলাম। আহমেদ ঘরে ফিরে এনভেলপটা খুলে দেখলো। কিছুক্ষণ পরই একটা ফোন এলো তার কাছে। 'হ্যা। পেয়েছি।' কেবল এটাই বললো সে।

"প্রায় দু'সপ্তাহ বাদে আহমেদ বসে বসে টিভিতে *মুম্বাই ক্রাইম ওয়াচ* দেখছে। আমি রান্না ঘরে সব্জি কাটতে ব্যস্ত। অবশ্য টিভির শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম। 'মালাদিতে আরেকটা হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। পুলিশ বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মিঃ বিথাল ভাই ঘোরপাড়ের হত্যাকারীকে খুঁজছে। নিজ বাসভবনে তিনি খুন হয়েছেন।' নামটা শুনে আমি চম্‌কে গেলাম। আমি টিভিতে তাকিয়ে আরো অবাক হয়ে গেলাম। এনভেলপে যে ছবিটা দেখেছিলাম ঠিক সেই ছবিটাই দেখাচ্ছে।

"খেয়াল করলাম আহমেদ হাসছে। এটাও আমাকে অবাক করলো। তারই একজন পরিচিত ব্যবসায়ীর মৃত্যুতে আহমেদ কেন হাসবে?

"এক মাস বাদে আরেকটা এনভেলপ এলে আমি সেটাও খুলে দেখলাম। ওটাতেও একটা ছবি আছে। আছে নাম আর ঠিকানা।

নাম : জামিল কিদওয়াই
বয়স : ২৮
ঠিকানা : ৩৫, শিলাজিৎ অ্যাপার্টমেন্টস, কোলাবা।

"নামটা মুখস্ত ক'রে চবি আর কাগজটা এনভেলপে রেখে দিলাম আগের মতো।

"আহমেদ বাসায় এসে খাম খুলে ছবি আর কাগজটা দেখলো। কিছুক্ষণ পর ফোন এলে সে কেবল বললো, 'প্যাকেট পেয়েছি।' ঠিক এক সপ্তাহ পর টিভিতে *মুম্বাই ক্রাইম ওয়াচ*-এ জামিল কিদওয়াইর খুন হবার খবরটা বিস্তারিত দেখালো। বাড়ির সামনে গাড়িতে বসা অবস্থায় তাকে গুলি করা হয়েছে। আহমেদ এক গ্লাস হুইস্কি খেতে খেতে খবরটা দেখে মুচকি হাসলো কেবল।

"আমি খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম। পুরো ব্যাপারটা ভালো ক'রে বোঝার জন্যে পরবর্তী খামটা এলে আমি শুধু ছবি আর নামটাই দেখলাম না, বরং লোকটার নাম আর ঠিকানা একটা কাগজে লিখে রাখলাম। প্রিমিয়ার রোড, কুরলার একটা ঠিকানা। এরপর পরের দিনই আমি আহমেদকে অনুসরণ করলাম। সে কেবল তিন তিনবার বাড়িটার সামনে দিয়ে গেলো আর এলো। দু'সপ্তাহ পর এই লোকটাও *ক্রাইম ওয়াচ*-এর বুলেটিনে ঠাঁই পেলো।

"আমি বোকা নই। বুঝতে পারলাম আমি একজন ভাড়াটে খুনির সাথে বসবাস করছি। কিন্তু কী করবো বুঝতে পারছিলাম না। আহমেদ একবার আমার জীবন বাঁচিয়েছে। পুলিশের কাছে গিয়ে তাকে ধরিয়ে দেবার কথা আমি ভাবতেও পারি না। এরই মধ্যে আব্বাস রিজভি আমাকে তার পরবর্তী ছবিতে ছোট্ট একটা চরিত্রে অভিনয়ের প্রস্তাব দিলেন। প্রস্তাবটা পেয়েই আমি হাজি আলীর দরগায় গিয়ে রিজভির জন্যে দোয়া চাইলাম। তার দীর্ঘ জীবন কামনা করলাম আমি।

"পরবর্তী দু'মাস আমি আহমেদের সাথে থাকলাম এমনভাবে যেনো কিছুই জানি না। কিন্তু তারপরই ঘটলো সেই ঘটনাটি।"

"কোন্ ঘটনা?"

"আজ থেকে চার মাস আগে, ফেব্রুয়ারির বিশ তারিখে। দিনটা আমার মনে আছে, কারণ ঐ দিন অস্ট্রেলিয়া-ইন্ডিয়ার শেষ ম্যাচটি ছিলো। আহমেদ ঐ ম্যাচেও বেটিং ধরলো। ইন্ডিয়ান দলের প্রধান ব্যাটসম্যান শচীন মালভাঙ্কার নিজের ৩৭তম সেঞ্চুরি করবে ব'লে বাজি ধরলো আহমেদ। বাজির দর অবশ্য কম ছিলো—দশে তেরো। তাই আহমেদ দশ লাখ রুপির বাজি ধরলো। তাহলে অন্তত তেরো লাখ রুপি পাবে। তার মানে তিন লাখ রুপি আয় হবে তার। মন্দ কি।

"সেই পুরো বিকেলটা আহমেদ টিভির সামনে বসে কাটিয়ে দিলো। আস্তে আস্তে নব্বইর ঘরে পৌছে গেলো শচীন মালভাঙ্কার। নিজের নখ দাঁত দিয়ে কামড়াতে শুরু করলো আহমেদ। এক পর্যায়ে নিশ্চিত সেঞ্চুরির দিকে এগিয়ে গেলো সে। নিরানব্বই! তার পার্টনার অজয় মিশ্রা এমন সময় অবিবেচকের

মতো এক রান নেবার জন্যে দৌড় শুরু করলে শচীন প্রথমে ইতস্তত করলো। কিন্তু ব্যাটসম্যানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে রান নিতে গেলে অস্ট্রেলিয়ান ফিল্ডারের ছোড়া বলে অপ্রত্যাশিতভাবেই রান আউট হয়ে গেলো বেচারা। নিরানব্বই রানে আউট!

"তুই ভাবতে পারিস আহমেদের অবস্থাটা কি হলো। শচীনের সাইত্রিশতম সেঞ্চুরির উপর দশ লাখ টাকা বাজি ধরে মাত্র এক রানের জন্যে পুরো টাকাটাই হারালো। 'ঐ বানচোতটাকে আমি খুন করবো।' রেগেমেগে ঘর থেকে বাইরে চলে গেলো সে। সম্ভবত মনের দুঃখে কোনো বারে গিয়ে থাকবে।

"ঐদিন বিকেলেই আরেকটা হলুদ রঙের খাম এলো। আমি চিন্তিত হয়ে পড়লাম ওটাতে বোধহয় কোনো ভারতীয় ব্যাটসম্যানের ছবি রয়েছে। কিন্তু ছবিটা যখন দেখলাম আমার দম বন্ধ হবার জোগার হলো।

"কেন? কার ছবি ছিলো সেটা?"

"ছবিটা ছিলো আব্বাস রিজভির। আমি বুঝে ফেললাম আহমেদের পরবর্তী টার্গেট হলো রিজভি। সে মারা গেলে তো আমার নায়ক হবার স্বপ্নটাও মরে যাবে। রিজভিকে আমার সতর্ক ক'রে দিতে হবে। কিন্তু আহমেদ যদি জানতে পারে আমাকে সে খুন করবে। হাজার হোক সে একজন পেশাদার খুনি।"

"তাহলে তুই কি করলি?" আমি কথাটা না জিজ্ঞেস ক'রে থাকতে পারলাম না।

"যা করার দরকার ছিলো তাই করেছি আমি। রিজভিকে গিয়ে সব বললাম। ছবি আর কাগজটাও দেখালাম। সব দেখে আমার কথা সে বিশ্বাস করলো। আমাকে বললো সে দুবাই চলে যাবে, এক বছর অনেকটা গা দিয়ে থাকবে। কৃতজ্ঞতার খাতিরে কথা দিলো আমাকে তার পরবর্তী ছবিতে নায়ক বানাবে। তবে তার আগে আমার বয়স আঠারো হতে হবে। ততোদিনে আমি প্রশিক্ষণ নিতে থাকবো। এজন্যেই সে আমার অভিনয় স্কুলের সমস্ত খরচ বহন করছে। আর আমি অপেক্ষা করছি কখন আমার বয়স আঠারো হবে।"

"হায় ঈশ্বর, কী ভয়াবহ গল্প, সেলিম," হাপ ছেড়ে বললাম আমি। "কিন্তু আহমেদ তোকে ছেড়ে দিলো? ঐ দিন তো তার একটা ফোন পাবার কথা, সে তো এনভেলপটার খোঁজ করেছিলো, নাকি?"

"না, আমি আহমেদকে এনভেলপটা ঠিকই দিয়েছিলাম। সে ফিরে এসে সব ঠিকঠাক মতোই পেয়েছিলো।"

"তাহলে তো রিজভিকে আহমেদের খুন ক'রে ফেলার কথা।"

"না, তার কারণ প্যাকেটটাতে অন্য আরেকটা ছবি আর ঠিকানা ছিলো যা

আমি কাছের টাইপরাইটিং ইন্সস্টিটিউট থেকে করিয়ে এনেছিলাম।"

"অসাধারণ। মানে তুই বলতে চাচ্ছিস ভুয়া ঠিকানা দিয়েছিস? কিন্তু ছবিটা কি ক'রে বানালি?"

"ছবি বানাতে হয় নি। সেটা সম্ভবও ছিলো না। আমি আহমেদকে সত্যিকারের ঠিকানা আর একটি ছবি দিয়েছিলাম। আর সেই মতোই সে কাজ সেরেছে। কিন্তু ভুল মানুষকে খুন করার কথাটা সে জেনে যাবার আগেই আমি তাকে বলি যে, ছুটি নিয়ে বিহারে নিজের গ্রামে যাবো কয়েক দিনের জন্যে। এই বলে তার ওখান থেকে কেটে পড়ি। তারপর থেকে আমি এই শহরেই অন্য কোথাও গা ঢাকা দিয়ে থাকলাম। গত সপ্তাহে *ক্রাইম ওয়াচ*-এ দেখলাম পুলিশের এনকাউন্টারে কুখ্যাত খুনি আহমেদ খান নিহত হয়েছে। তাই আমি শুকরিয়া আদায় করতে হাজি আলীর দরগায় এসেছি আজ। আর দ্যাখ, কী দারুণ ঘটনা! তোর সাথে দেখা হয়ে গেলো।"

"হ্যা, আসলেই দারুণ ঘটনা। কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন আছে। তুই কার ছবি আর ঠিকানা দিয়েছিলি এনভেলপে?"

"তাকে আমি মিঃ বাবু পিল্লাই মানে মামানের ছবি আর ঠিকানা দিয়েছিলাম।"

স্মিতা হাত তালি দিয়ে উঠলো। "দারুণ। আমি মনে করতাম তুমি বেশ স্মার্ট একটা ছেলে, কিন্তু জানতাম না সেলিমও একজন জিনিয়াস। পারফেক্ট এক টার্গেটকে সে অন্য আরেকজনের মাধ্যমে খুন করেছে। তারপর কি হলো? তুমি কি সেলিমকে বলেছো তুমি কুইজ শো'তে অংশ নিতে যাচ্ছো?"

"না, আমি তাকে বলি নি আমি কেন মুম্বাই এসেছি। আমি বলেছি আমি দিল্লিতে চাকরবাকরের কাজ করি। কয়েক দিনের জন্যে বেড়াতে মুম্বাই এসেছি।"

"তাহলে কুইজ শো'তে তোমার অংশ নেয়ার ব্যাপারে সেলিম কিছুই জানে না?"

"না। আমি তাকে বলতে যাবো তার আগেই পুলিশ ধরে নিয়ে গেলো।"

"বুঝেছি। এখন দেখি তোমার সাথে সেলিমের দৈবাৎ দেখা হওয়াটা কুইজ শো'তে কতোটুকু সাহায্য করেছে।"

স্টুডিও'র বাতিগুলো আবারো ম্রিয়মান হয়ে গেলো।

ক্যামেরার দিকে মুখ ক'রে প্রেম কুমার বললো, "আমরা এখন নয় নাম্বার প্রশ্নে যাবো। এক মিলিয়ন রুপির জন্যে। তুমি প্রস্তুত?"

"প্রস্তুত," বললাম আমি।

"ঠিক আছে। এবার বলছি নয় নাম্বার প্রশ্ন। এটা খেলাধূলা বিষয়ক। আমাকে বলো মি: টমাস, তুমি কোন্ খেলাটা খেলতে পছন্দ করো?"

"কোনো খেলাই না।"

"কোনো খেলা নয়? তাহলে তুমি তোমার শরীর-স্বাস্থ্য ফিট রাখো কি ক'রে? আমাকে দ্যাখো, প্রতি সকালে আমি জিমে যাই। তাই তো এরকম ঝরঝরে শরীর।"

"আপনি যদি সারা দিন ওয়েটারের কাজ করেন, প্রতিদিন কমিউটার ট্রেনে ত্রিশ কিলোমিটার ভ্রমণ করেন তবে আপনাকে কষ্ট ক'রে আর জিমে যেতে হবে না। এমনিতেই ফিট থাকবেন," জবাব দিলাম আমি।

দশর্কেরা হেসে ফেললে প্রেম কুমার ভ্যাবাচ্যাকা খেলো একটু।

"ঠিক আছে। ক্রিকেট থেকে করছি নয় নাম্বার প্রশ্নটি। ইন্ডিয়ার গ্রেটেস্ট ব্যাটসম্যান শচীন মালভাঙ্কার কতোগুলো টেস্ট সেঞ্চুরি করেছেন? এ) ৩৪টি, বি) ৩৫টি, সি) ৩৬টি নাকি ডি) ৩৭টি?"

মিউজিক বাজতে লাগলো।

"আমি কি একটা প্রশ্ন করতে পারি?"

"হ্যা, নিশ্চয়।"

"কিছু দিন আগে অস্ট্রেলিয়ার সাথে সিরিজ খেলার পর কি ইন্ডিয়া আর কোনো দেশের সাথে খেলেছে?

"না! আমার তো মনে হয় খেলে নি।"

"তাহলে আমি জবাবটা জানি। এটা সি। ৩৬টি।"

"এটা কি তোমার চূড়ান্ত জবাব? মনে রেখো, এক মিলিয়ন রুপির ব্যাপার।"

"হ্যা, এটা সি। ৩৬টি সেঞ্চুরি।"

"তুমি কি একশত ভাগ নিশ্চিত?"

"হ্যা।"

ড্রামের শব্দ শোনা গেলো। সঠিক জবাব লেখাটি ভেসে উঠলো পর্দায়।

"একদম সঠিক। একশত ভাগ সঠিক জবাব। শচীন মালভাঙ্কার এ পর্যন্ত মোট ৩৬টি টেস্ট সেঞ্চুরি করেছেন। তুমি এক মিলিয়ন রুপি জিতে গেছো। লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলমেন, এখন আমরা ছোট্ট একটা বিরতিতে যাবো।"

"কাট!" আমি বললাম।

ট্র্যাজেডি কুইন

একটি পারিবারিক ড্রামা, যার সাথে কমেডি আর অ্যাকশনের মিশ্রণ আছে সেটা প্রকারান্তরে ট্র্যাজেডিতেই রূপান্তরিত হলো। ছবির ভাষায় এভাবেই নিলীমা কুমারির সাথে আমার অতিবাহিত সময়টা বর্ণনা করা যেতে পারে। তিনি একজন অভিনেত্রী ছিলেন। আমি তার জুহু ভিলে পার্লের ফ্ল্যাটে তিন তিনটি বছর কাজ করেছি।

মামানের ওখান থেকে আমি আর সেলিম যে রাতে পালিয়ে আসি সে রাতেই এই গল্পের শুরু। একটা লোকাল ট্রেনে ক'রে আমরা জুহুতে এসে পৌছাই। হেটে নিলীমা কুমারির ফ্ল্যাটে গিয়ে তার দরজায় বেল বাজিয়ে অপেক্ষা করি আমরা দু'জন।

অনেকটা সময় পর দরজা খোলা হলো। "হ্যা?" দেখলাম আমাদের সামনে এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। রাধে নামের খোঁড়া ছেলেটা ঠিকই বলেছিলো। মহিলা বেশ লম্বা আর সুন্দর। একেবারে সিনেমার নায়িকাদের মতোই। খালি বয়সটা একটু বেশি। সেলিম তার পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। "আরে!" সঙ্গে সঙ্গে পিছু হটে গেলেন মহিলা। "তোমরা দু'জন আবার কারা? এতো রাতে আমার বাড়িতে কীজন্যে এসেছো?"

"আমরা রাধের বন্ধু," বুকের কাছে দুই হাত ভাঁজ ক'রে আমি বললাম। "সে বলেছে আপনার নাকি একজন চাকরের দরকার। আমরা সেজন্যেই এসেছি। আমরা জানি আপনি খুবই দয়ালু একজন। আমাদের খাবার আর মাথা গোঁজার আশ্রয় দরকার। এর বিনিময়ে যা করতে বলবেন তাই আমরা করবো।"

"হ্যা, আমার কাজের ছেলের দরকার আছে। কিন্তু এতো অল্প বয়সী ছেলে আমি রাখবো না।"

"ম্যাডাম, আমরা দেখতে ছোটো হলেও চারজন লোকের কাজ একাই করতে পারি। আমি ইংরেজিতেও কথা বলতে পারি। আমাদেরকে একবার কাজে নিয়েই দেখেন না।"

"কিন্তু আমার তো দু'জন ছেলের দরকার নেই। আমার এখানে মাত্র একজন থাকার মতো জায়গা রয়েছে।"

আমি আর সেলিম একে অন্যের দিকে তাকালাম। "তাহলে আমাদের একজনকে অন্তত কাজে নিন," আমি বললাম।

"তোমার নাম কি?" মহিলা সেলিমকে জিজ্ঞেস করলেন।

"সেলিম।"

"ওহ্, তুমি তো মুসলিম, তাই না?"

সেলিম মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"দ্যাখো, আমি দুঃতি। আমার বৃদ্ধ মা আবার মুসলমানদের ছোঁয়া জিনিস স্পর্শ করে না। আমি অবশ্য এসব ফালতু জিনিসে বিশ্বাস করি না। কিন্তু কী আর করবো?" মহিলা কাঁধ ঝাঁকালেন। কথাটা শুনে মলিন হয়ে গেলো সেলিমের মুখ।

এরপর মহিলা আমার দিকে ফিরে বললেন, "তোমার নাম কি?"

"রাম," তাকে বললাম আমি।

কাজটা আমিই পেয়ে গেলাম। আর ঠিক তখনই আমি জানতে পরলাম বাইরে থেকে যতোটা মনে হয় আসলে চিত্রতারকাদের জীবন ততোটা গ্ল্যামার সর্বস্ব নয়। তাদেরকে মেকআপ ছাড়া দেখলে আটদশ জন সাধারণ মানুষের মতোই লাগে। সাধারণ মানুষের মতোই তারা উদ্বিগ্নতা আর নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। একমাত্র পার্থক্য হলো আমরা সাধারণেরা টাকা নিয়ে বেশি মাথা ঘামাই আর তারা প্রধানত খ্যাতি নিয়ে চিন্তিত থাকে। অথবা খ্যাতিহীনতায়।

তারা বাস করে ফিশ বোলে। প্রথমে তারা এটাকে ঘৃণা করে, তারপর জনপ্রিয়তা আর খ্যাতি বাড়তে থাকলে তারা এটাকে ভালোবাসতে শুরু করে। লোকজন যখন তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তখন তারা পানি শুকিয়ে মারা যায়।

নিলীমা কুমারির ফ্ল্যাটটা বিশাল আর আধুনিক। দামি দামি সব আসবাব আছে, দেয়াল জুড়ে আছে মূল্যবান কার্পেট আর পেইন্টিং। পাঁচটা বেডরুমের মধ্যে সবচেয়ে বড় বেডরুমটার সাথে আছে এটাচ বাথরুম। ওটা ব্যবহার করেন নিলীমা কুমারি নিজে। এরপর যেটা বড় সেটাতে থাকেন তার মা। আমি যতোটুকু জানতে পেরেছি, নিলীমার আর কোনো আত্মীয়স্বজন নেই।

নিলীমার শোবার ঘরটি ফ্ল্যাটের সবচাইতে সেরা ঘর। ঘরের মাঝখানে বিশাল একটা পালঙ্ক রয়েছে, যেটাতে রয়েছে মখমলের চাদর। ঘরের দেয়াল

কাঁচের টাইল্‌সে মোড়ানো। ফলে যেখানে তাকাবেন আপনি নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পাবেন—হাজার হাজার। ড্রেসার ভর্তি বোতল আর পারফিউম। সেটার পাশেই আছে উনত্রিশ ইঞ্চির রঙ্গিন সনি টিভি, ভিসিআর আর নতুন একটা ডিভিডি প্লেয়ার। ঘরের ছাদ থেকে দামি একটা ঝালর বাতি ঝুলছে। শব্দহীন এসি ঘরটাকে ঠাণ্ডা ক'রে রাখে সব সময়। দেয়ালে কাঁচের সেল্‌ফ বিভিন্ন পুরস্কার আর ট্রফিতে পরিপূর্ণ। আরেকটা কাঁচের সেলফে রাখা আছে বিভিন্ন ম্যাগাজিন। সবগুলোর প্রচ্ছদেই নিলীমা কুমারির ছবি। এসব দেখে এখানে কাজ করতে পেরে নিজেকে খুব ভাগ্যবান বলে মনে হলো আমার। তার নিজের সময়ে নিলীমা কুমারি নিশ্চয় ভারতের সবচাইতে সেরা আর জনপ্রিয় অভিনেত্রী ছিলেন।

নিলীমার মা আস্ত একটা সমস্যা। তার বয়স আশির মতো হলে কি হবে, তার গায়ে চল্লিশ বছর বয়সী মহিলার শক্তি, আর সেই শক্তি তিনি ব্যয় করেন আমার পেছনে লেগে থেকে। বাড়িতে আমিই হলাম একমাত্র সার্বক্ষণিক কাজের লোক। মহারাষ্ট্রের এক ব্রাহ্মণ মহিলা এসে রান্নার কাজ করে দিয়ে যায়, সেই সাথে ডিশ ধোয়ামোছার কাজও। আর অন্য আরেকজন মহিলা যাবতীয় কাপড় ধুয়ে দিয়ে যায়। বাকি সব কাজ করি আমি। ঘরদোড় সাফ করা থেকে শুরু করে বিকেলে চা বানানো সবই আমাকে করতে হয়। বাড়ির বাইরে গিয়ে জিনিসপত্র কেনা আর বিদ্যুৎ, পানি, ফোনের বিল দেয়াটা আমার কাজের মধ্যেই পড়ে। কিন্তু নিলীমার মা কখনই সন্তুষ্ট হন না। যদিও আমি তাকে সম্মান করে 'মা'জি' বলে ডাকি। "রাম, তুমি আমার দুধ নিয়ে আসো নি," তিনি বলবেন। "রাম, তুমি আমার বিছানার চাদর ইস্ত্রি ক'রে রাখো নি...রাম, এই ঘরটা ভালো মতো ঝাড়ামোছা করো নি...রাম, তুমি আবারো সময় নষ্ট করছো...রাম, আমার চা'টা ভালোমতো গরম করো নি।" তার বকবকানিতে এতোটাই অতীষ্ঠ আমি যে, পারলে তার মুখে টেপ লাগিয়ে দিই।

অবশ্য নিলীমা কুমারি খুব বেশি খাটায় না আমায়। তিনি চাইতেন আমি তার বাড়িতেই থাকি। ফ্ল্যাটে অনেক ঘর খালি পড়ে আছে। যে কোনো একটাতে আমি অনায়াসেই থাকতে পারি। কিন্তু তার মা বাড়িতে একজন 'মরদ' রাখতে নিষেধ করেছেন। তাই আমি ঘাটকোপারে একটা চাউলে ঠাঁই করে নিলাম, সেখান থেকেই কমিউটার ট্রেনে ক'রে প্রতি দিন তার ফ্ল্যাটে এসে কাজ করি আমি। নিলীমা আমার চাউলে থাকার ভাড়ার টাকা দিয়ে থাকেন। এক দিক থেকে এটা আমার জন্যে ভালোই, কারণ আমার সাথে সেলিমও থাকতে পারে।

আমি নিলীমার সাথে শপিংয়ে বের হয়েছি। তার নিজের কোনো গাড়ি নেই তাই আমরা একটা ট্যাক্সি নিয়েছি। তার সাথে বাইরে যেতে আমার ভালো লাগে না। তিনি সব সময় শুধুমাত্র কসমেটিকস আর জামাকাপড় কিনে থাকেন, আর সেই ভারি ব্যাগটা বহন করতে হয় আমাকেই। ম্যাকডোনাল্ড কিংবা পিজা হাটে কখনই তিনি যান না। আমাকে কখনই তিনি কিছু কিনে দেন নি।

আজ আমরা কাফ প্যারাডে নামের একটা ব্যয়বহুল শপে এসেছি। এরা দামি দামি শাড়ি বিক্রি ক'রে থাকে। দু'ঘণ্টা ধরে তিনি শত শত শাড়ি দেখে গেলেন, তারপর পঞ্চাশ হাজার রুপি দিয়ে তিনটি শাড়ি কিনলেন যা কিনা আমার দু'বছরের বেতনের চেয়েও বেশি। সেই শপ থেকে বের হতেই স্কুলের পোশাক পরা এক দল মেয়ে আমাদের কাছে ছুটে এলো। তারা খুবই উত্তেজিত। "এক্সকুইজ মি। আপনি কি অভিনেত্রী নিলীমা কুমারি না?" তাদের মধ্যে একজন জানতে চাইলো।

"হ্যা," বললেন নিলীমা। তাকে দেখে খুব খুশি মনে হলো।

"দেখলি," মেয়েটা তার বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বললো। "বলেছিলাম না ইনি সেই নিলীমা কুমারি।" তারপর আবারো সে আমাদের দিকে ফিরলো। "নিলীমাজি, আমরা আপনার ভক্ত। আপনাকে দেখে আমাদের স্বপ্ন যেনো সত্যি হলো। আমরা সাথে ক'রে আমাদের অটোগ্রাফ-বুক নিয়ে আসি নি। আপনি কি আমাদের এক্সারসাইজ বুকে অটোগ্রাফ দেবেন?"

"অবশ্যই। আনন্দের সাথে," কথাটা বলেই নিলীমা কুমারি ব্যাগ থেকে একটান কলম বের ক'রে একে একে সব মেয়ের নাম জিজ্ঞেস ক'রে তাদের নাম উল্লেখ করেই অটোগ্রাফ দিলেন। মেয়েরা এটা দেখে খুশিতে আটখানা।

নিলীমা তার এই ভক্তদের উচ্ছ্বাসে আনন্দিত হলেন। এই প্রথম আমি দেখলাম কেউ তাকে স্বীকৃতি দিলো। হঠাৎ করেই তিনি আমার দিকে খেয়াল করলেন। আমার তখন ঘামে ভিজে ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। হাতে ভারি ব্যাগ ধরে আছি। "রাম, তোমার নিশ্চয় খুব ক্ষিদে পেয়েছে। চলো আইসক্রিম খাই," কথাটা তিনি বললে আমি খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেলাম।

মাঝে মাঝে নিলীমা আমাকে সিনেমা বানানোর শিল্পটি শেখানোর চেষ্টা করতেন। সিনেমা বানাতে যে অসংখ্য টেকনিশিয়ান লাগে সে কথাও আমাকে জানাতেন তিনি। "লোকে মনে করে সিনেমা বুঝি শুধু অভিনেতা-অভিনেত্রী আর ডিরেক্টররাই বানায়। কিন্তু পর্দার আড়ালে থাকা হাজার হাজার লোকের কথা তারা জানে না। তাদের ছাড়া কখনই কোনো সিনেমা বানানো সম্ভব হবে

না। তারা সবকিছু করার পরই ডিরেক্টর কৃতিত্ব নিতে পারেন।

"আজকাল যেসব ছবি হয় আমি সেগুলো ঘৃণা করি। সব কিছু একসাথে দেবার চেষ্টা করে তারা—ট্র্যাজেডি, কমেডি, অ্যাকশন আর মেলোড্রামা। না। ভালো ছবি হতে হলে নির্দিষ্ট একটা ধরণ থাকতে হবে। আমি সব সময়ই বেছে বেছে ছবি হাতে নিতাম। আমাকে কখনই তুমি দেখবে না এক দৃশ্যে নাচছি গাইছি তো পরের দৃশ্যেই মরে যাচ্ছি করুণভাবে। না, রাম। চরিত্রকে ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। একজন ভালো অভিনেতা অভিনেত্রী কেবল নির্দিষ্ট ধরণের ছবিতে অভিনয়ই করবেন না বরং তিনি নিজেও একটা ধরণ তৈরি করবেন। তুমি কি *টাইমস্ অব ইন্ডিয়ার* ঐ ফিল্ম রিভিউটা পড়েছো? রিভিউয়ার লিখেছেন পূজা নামের অভিনেত্রী মৃত্যুর দৃশ্যে একেবারে যা তা ধরণের অভিনয় করেছে। 'নিলীমা কুমারি থাকলে ছবিতে ঐ দৃশ্যটা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারতেন। তার মতো কিংবদন্তী অভিনেত্রীদের কাছ থেকে আজকালকার নতুন অভিনেত্রীরা অনেক কিছু শিখতে পারে।' লেখাটা পড়ে আমি খুব আপ্লুত হয়েছি। এরকম প্রশংসাই হলো একজন অভিনেত্রীর সবচাইতে বড় অর্জন। নিজের একটা ইউনিক স্টাইল তৈরি করাটাই অভিনেতা অভিনেত্রীদের আজীবন স্বপ্ন। রিভিউটা আমি ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখবো।"

"আপনার ইউনিক স্টাইল কোন্‌টা?"

তিনি হেসে ফেললেন। "আমি জানি তোমার বয়স কম। সুতরাং তুমি বুঝবে না লোকে কেন নিলীমা কুমারিকে ট্র্যাজেডি কুইন নামে ডাকে। তোমাকে একটা জিনিস দেখাচ্ছি।"

আমাকে তার শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে লোহার একটা আলমিরা খুললেন তিনি। পুরো আলমিরাটা ভিডিও ক্যাসেটে ভরা। এটা দেখে তো আমার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেলো। "তুমি কি জানো এইসব ক্যাসেটে আমার সবগুলো ছবি আছে?"

"সত্যি? তাহলে এখানে কয়টা ক্যাসেট আছে?"

"একশ' চৌদ্দটা। বিশ বছরে আমি এতোগুলো ছবিতে অভিনয় করেছি।" প্রথম সারির দিকে ইঙ্গিত ক'রে তিনি বললেন, "এগুলো আমার প্রথম দিককার ছবি। বেশিরভাগই হাল্কা কমেডি ধাঁচের। আমি নিশ্চিত তুমি জানো কমেডি ছবি কাকে বলে, ঠিক?"

আমি জোরে জোরে মাথা নাড়ালাম। "হ্যা। গোবিন্দ যে ধরণের ছবি করে।"

নিলীমা পরের দুটো সারির দিকে ইঙ্গিত করলেন এবার। "এগুলো আমার মাঝামাঝি সময়ের করা ছবি। বেশির ভাগই ফ্যামিলি ড্রামা। তবে আমি

মার্ডারার আর *থার্টি ইয়ারস ল্যাটার* নামের বিখ্যাত থ্রিলার ছবিও করেছি।"

শেষে তিনি বাকি চার সারির দিকে ইঙ্গিত করলেন। "এগুলো সবই ট্র্যাজেডি ফিল্ম। আমার ঘরে যে সব পুরস্কার আর ট্রফি দেখেছো সেসব এই ছবিগুলো ক'রে পেয়েছি। আমার সবচাইতে প্রিয় হলো এটা," একটা ক্যাসেটে টোকা মেরে তিনি বললেন। ওটার গায়ে লেখা আছে *মুমতাজ মহল*। "এই ছবিতে আমি সম্রাট শাহজাহানের স্ত্রী মুমতাজের ভূমিকায় অভিনয় করেছি। এটা আমার জীবনের সবচাইতে স্মরণীয় ঘটনা। এই ছবিতে অভিনয় করেই আমি জাতীয় পুরস্কার পাই। ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে সেই পুরস্কার আমি নিয়েছিলাম।"

"তাহলে ম্যাডাম, এটাই কি আপনার জীবনে করা সবচাইতে সেরা অভিনয়?"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। "এটা ভালো অভিনয় ছিলো তাতে কোনা সন্দেহ নেই। তবে আমার মনে হয় আমি এখনও আমার জীবনে সেরা অভিনয়টা করতে পারি নি।"

নিলীমার মার শরীর খুব একটা ভালো যায় না। খুব বেশি কাশে আর আহ্ উহু করে সারাক্ষণ। তার বকবকানি একেবারে অসহ্য হয়ে উঠলো। নিজের অসুস্থতার ব্যাপারে সব সময় তিনি অভিযোগ করতেন। এ ক্ষেত্রে নিলীমাকেও তিনি ছাড়তেন না। বার বার তাকে মনে করিয়ে দিতেন যার মাধ্যমে দুনিয়াতে এসেছে তার প্রতি কর্তব্য পালনে যেনো ব্যত্যয় না ঘটে। আমার মনে হয় নিলীমাও তার ব্যাপারে একটু বিরক্ত হয়ে উঠেছে। বাড়ির অন্যসব কাজ রেখে মা'জির জন্যে ওষুধ কিনতে আর সেগুলো তিনি ঠিকমতো খাচ্ছেন কিনা সেটার দেখভাল করতেই আমার সময় চলে যেতো।

ফ্ল্যাটে খুব উত্তেজনা। আজ রাতে দূরদর্শনে নিলীমা অভিনীত *লাস্ট ওয়াইফ* সিনেমাটি দেখাবে। এটা তার বিখ্যাত ট্র্যাজেডি ফিল্ম। তিনি আমাদের সবাইকে নিয়ে ড্রইং রুমে বসে ছবিটা দেখবেন বলে জানিয়েছেন। রাত আটটা বাজে আমরা সবাই জড়ো হলাম তার ড্রইং রুমের টিভির সামনে। বাবুর্চি, কাজের বুয়া আর আমি বসলাম কার্পেটে। মা'জি নিলীমার পাশে সোফায় বসে দেখলেন। ছবি শুরু হলো। এটা আমার দেখা ছবির মতো নয়। দরিদ্র আর নিম্নবিত্তের দুঃখকষ্টে জর্জরিত একটি কাহিনী। জীবনের একেবারে বাস্তব চিত্র দেখানো হলো ছবিতে। আমার মনে হয় এধরণের ছবি বানানোটা হাস্যকর। বাড়ির পাশে কোনো ঘটনা, তোমার চিরচেনা প্রতিদিনকার গল্প সিনেমার পর্দায়

দেখার মধ্যে কি এমন যুক্তি থাকতে পারে? অবশ্য নিলীমাকে ছবিতে খুবই কম বয়সী আর সুন্দর দেখাচ্ছে। অভিনয়ও করছেন তিনি ভালো। ছবির নায়িকার পাশে বসে তারই ছবি দেখাটা অদ্ভুত একটি ব্যাপার। নিজেকে টিভি পর্দায় দেখে নিলীমার নিজের কেমন লাগে ভাবলাম। তার এই ছবির শুটিং চলার সময় যেসব স্পটবয়, লাইটম্যান আর টেকনিশিয়ানরা কাজ করেছিলো পর্দার অন্তরালে তাদের কথা কি তার মনে পড়ে যাচ্ছে এখন?

জ্বালাময়ী এক ডায়লগ দিয়ে নিলীমা ছবির শেষে মারা গেলেন। আমরা দাঁড়িয়ে হাত-পা ছুঁড়ে আড়মোড়া ভাঙলাম। খেয়াল করলাম নিলীমা কাঁদছে। "ম্যাডাম," আমি চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে? আপনি কাঁদছেন কেন?"

"কিছু না, রাম। ছবিতে নিজের চরিত্র দেখে একটু ইমোশনাল হয়ে পড়েছিলাম। এই যে দ্যাখো, এখন আমি হাসছি।"

"আপনারা অভিনেতা অভিনেত্রীরা কিভাবে এখন হাসেন তো পর মুহূর্তেই আবার কাঁদতে পারেন?"

"এটাই তো মহান অভিনেতার বৈশিষ্ট। তুমি কি জানো তারা আমাকে কেন ট্র্যাজেডি কুইন বলে ডাকে?"

"কেন, ম্যাডাম?"

"কারণ ছবিতে কান্নার সময় আমি চোখে কখনই গ্লিসারিন ব্যবহার করতাম না। আমি এমনিতেই চোখে পানি আনতে পারতাম।"

"এটা আর এমন কি কঠিন কাজ? আমিও তো কান্নার সময় কখনও চোখে গ্লিসারিন ব্যবহার করি না," নিলীমা চলে গেলে আমি কাজের বুয়াকে বললাম।

নিলীমা কুমারিকে যতোই আমি দেখতে লাগলাম ততোই বুঝতে শুরু করলাম লোকে কেন তাকে ট্র্যাজেডি কুইন বলে। তার হৃদয়ের গভীরে এক ধরণের বিষন্নতা রয়েছে। এমনকি তার হাসিতেও আমি দুঃখের আভাস দেখতে পেতাম। তার অতীত জীবন নিয়ে ভাবতাম, তিনি কেন বিয়ে করেন নি। তার কোনো সত্যিকারের বন্ধু নেই। কিন্তু মাঝেমধ্যেই বাড়ি থেকে বাইরে যান তিনি, ফিরে আসেন রাতে। কার সাথে দেখা করতে যান সেটা ভাবতাম। সন্দেহ করতে শুরু করলাম তার ছেলে বন্ধু কিংবা প্রেমিকই হবে। কারণ তাকে কখনই হাসিখুশি অবস্থায় ফিরে আসতে দেখা যেতো না। ক্লান্ত শ্রান্ত শরীরে ফিরে এসে তিনি সোজা শোবার ঘরে চলে যেতেন। এই রহস্যটা ভেদ করার ইচ্ছে জাগলো এক দিন।

তার সৌন্দর্য নিয়ে যে মোহ সেটাও আমি ভাবতাম। শারিরীক সৌন্দর্যের

কথা বলছি। দেখতে খুব সুন্দর হলেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে আয়নার সামনে বসে মেকআপ করতে ব্যস্ত থাকেন তিনি। তার ড্রেসিং টেবিল নানান ধরণের প্রসাধনীতে ভরা। তার কাছে তার মা'র চেয়েও বেশি ওষুধ আছে। হিউম্যান গ্রোথ হরমোন, ব্রেস্ট ফার্মিং ক্রিম, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ইত্যাদি।

এক দিন তাকে আমি বলেই ফেললাম, "ম্যাডাম, আপনি যদি কিছু মনে না করেন তো একটা প্রশ্ন করতে চাই। আপনি এতো মেকআপ দিয়ে কী করেন? আপনি তো আর এখন ছবিতে অভিনয় করেন না।"

আমার চোখের দিকে তাকালেন তিনি। "আমরা যারা ফিল্মে কাজ করি তারা মেকআপে এতোটাই অভ্যস্ত হয়ে পড়ি যে, মেকআপ ছাড়া আমরা আমাদের নিজেদের সত্যিকারের মুখটা আয়নায় দেখার সাহস হারিয়ে ফেলি। মনে রেখো, একজন অভিনেতা সারাজীবনই অভিনেতা। ছবির পাট হয়তো চুকিয়ে যাবে কিন্তু শো ঠিকই চলতে থাকবে।"

আমি ভাবলাম এটা কি তার মনের কথা নাকি কোনো ছবির ডায়লগ বলে দিলেন।

আজ সত্যি চমৎকার একটা ব্যাপার ঘটে গেছে। ঘুমের মধ্যে মা'জি মারা গেছেন। একাশি বছর বয়সে। অল্প একটু কেঁদেই নিলীমা সৎকারের কাজে নিমে পড়লেন। মনে হলো পুরো চলচ্চিত্র জগতটিই তার বাড়িতে এসে তাকে সান্ত্বনা দিতে চাচ্ছে। সাদা শাড়ি আর হালকা মেকআপ নিয়ে তিনি তার ড্রইং রুমের সোফায় বসে থাকলেন। আগত লোকজনের অনেককেই আমি চিনতে পারলাম। অভিনেতা, অভিনেত্রী, ডিরেক্টর, প্রডিউসার, গায়ক-গায়িকা এমনকি কিছু গীতিকারও এলেন। পুরো ফ্ল্যাটটা এই সব লোকজনে পূর্ণ। আমি তাদের দেখতেই বেশি ব্যস্ত। আমার সাথে যদি সেলিম থাকতো তবে সে পাগল হয়ে যেতো। তবে আশাহতও হোতো। কারণ অনেককেই সামনাসামনি পর্দার মতো অতো গ্ল্যামারাস দেখায় না।

আমি জানি না নিলীমা কিভাবে তার মায়ের মৃত্যুটাকে নিলেন। তবে আমার কাছে মা'জির প্রস্থান মানে বিরক্তিকর একটা ছবি দেখার হাত থেকে বেঁচে যাওয়া।

মা'জির মৃত্যুর এক মাস বাদে নিলীমা আমাকে তার ফ্ল্যাটে থেকে যাবার প্রস্তাব করলেন। তিনি জানতেন সেলিম আমার সাথে চাউলে থাকে। তাই সেলিমের জন্যে তিনি চাউলের ভাড়া দিয়ে যেতে লাগলেন। তার ফ্ল্যাটে চলে

এলাম আমি। কিন্তু আমাকে চারটা শোবার ঘরের কোনোটাই দেয়া হলো না। আমাকে থাকতে বলা হলো কাপড় ইস্ত্রি করার ঘরে। খেয়াল করলাম মা'জির মৃত্যুর পর নিলীমা বাড়ির বাইরে আরো ঘন ঘন যেতে শুরু করলেন। এমনকি কখনও কখনও রাতে বাড়িতেও ফিরে আসতেন না। ভাবলাম, খুব সম্ভবত শীঘ্রই বিয়ের অনুষ্ঠান হবে বোধহয়।

ড্রইং রুম থেকে একটা শব্দ শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেলো। শব্দটা খুব মৃদু হলেও আমার ঘুমে ব্যঘাত ঘটানোর জন্যে যথেষ্ট। দু'চোখ ঘষে আমার পাশে রাখা অ্যালার্ম ঘড়িটার দিকে তাকালাম। আড়াইটা বাজে। রাতের এই সময়ে নিলীমা তার ঘরে কী করছে! হঠাৎ করেই আমার মনে হলো হয়তো তার প্রেমিক এসেছে, আর সে উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। পা টিপে টিপে আমি ড্রইং রুমের দিকে গেলাম।

ঘরটা অন্ধকার হলেও একটা লোক আছে সেখানে। তাকে দেখে আমার প্রেমিক ব'লে মনে হলো না। মুখে কালো একটা মুখোশ পরে আছে সে। কেবল চোখ দুটোই দেখা যাচ্ছে। তার বাম হাতে কালো রঙের একটা ঝোলা। ডান হাতে একটা টর্চলাইট, সেটা ভিসিআর-এর দিকে তাক্ করা। ভিসিআরটার ক্যাবল খুলে সে দ্রুত ঝোলার মধ্যে ঢুকিয়ে ফেললো। এবার বুঝতে পারলাম প্রেমিক নয় বাড়িতে একজন চোর ঢুকেছে। জোরে চিৎকার দিলাম। আমার চিৎকারে বিদীর্ণ হলো রাতের স্তব্ধতা। নিলীমা কুমারি ঘুম থেকে জেগে উঠে দৌড়ে ড্রইং রুমে চলে এলেন। ঘাবড়ে গিয়ে চোরের হাত থেকে ঝোলা আর টর্চলাইট দুটো মেঝেতে পড়ে গেলো। দু'হাতে সে নিজের দু'কান ধরে তীক্ষ্ম শব্দটা থেকে বাঁচার চেষ্টা করলো নিজেকে। তার অসর্তকতায় কাঁচের একটা টেবিলও ভেঙে গেলো।

"কি হয়েছে?" নিলীমা কুমারি দম নিতে নিতে জানতে চাইলেন। ড্রইং রুমের বাতি জ্বালিয়ে দিলেন তিনি। তারপর চোরটাকে দেখে তিনিও বিকট একটা চিৎকার দিলেন। চোরের অবস্থা এবার একেবারেই নাজুক। নিলীমা কুমারির পায়ে পড়ে অনুনয় করতে লাগলো সে। "ম্যাডাম, দয়া ক'রে বোঝার চেষ্টা করেন আমি কোনো চোর নই। আমি কেবল আপনার বাড়িটা একটু দেখতে এসেছি।"

"রাম, ফোনটা নিয়ে আসো। এক্ষুণি পুলিশকে ডাকছি," নিলীমা আমাকে বললেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি তার কর্ডলেস ফোনটা নিয়ে এলাম।

চোর তার মুখোশ খুলে ফেললো। অল্প বয়সী ছাগলা দাড়িওয়ালা এক

ছেলে। "প্লিজ ম্যাডাম। দয়া ক'রে পুলিশ ডাকবেন না। আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। আমি কোনো চোর নই। সেন্ট জেভিয়ারের ফাইনাল ইয়ারের একজন ছাত্র আমি। আমি আপনার একজন বিরাট ভক্ত। আপনাকে দেখতে এসেছি আমি।"

এ কথা শুনে নিলীমা কিছুটা নরম হয়ে যাচ্ছেন দেখতে পেলাম। "ম্যাডাম, তার কথা বিশ্বাস করবেন না," আমি সতর্ক ক'রে দিয়ে বললাম। "এই ছেলেটা চোর। সে যদি আপনার ভক্তই হবে তবে কেন আপনার ভিসিআরটা নেবে?"

"আমি বলছি কেন, নিলীমাজি। আপনার অভিনীত ১৪৪টি ছবির সবগুলোরই ক্যাসেট আমি কিনেছি। প্রতি দিন আপনার একটা ছবি হলেও আমি দেখি। এভাবে দেখতে দেখতে আমার সস্তা ভিসিআরটা নষ্ট হয়ে গেছে। ওটা ঠিক করতে হবে। কিন্তু আমি তো আপনার ছবি না দেখে থাকতে পারি না। তাই ভাবলাম আপনার ভিসিআরটা নিয়ে যাই। আপনার ভিসিআর-এ ছবি দেখছি এটা ভাবেতই অন্যরকম লাগবে আমার। পরে আমারটা ঠিক হয়ে গেলে আপনার ভিসিআরটা আবার ফেরত দিয়ে যেতাম। ম্যাডাম, আমার কথা বিশ্বাস করেন। আমি আমার মরা বাপের কসম খেয়ে বলছি।"

"ম্যাডাম, এটা একেবারেই মিথ্যে কথা," চিৎকার ক'রে বলাম আমি। "আপনি বরং পুলিশকে ফোন করুন।"

"না, রাম," নিলীমা কুমারি বললেন। "আগে আমাকে পরীক্ষা করতে দাও সে আসলেই আমর ভক্ত কিনা। সে যদি আমার ১৪৪টি ছবি দেখে থাকে তবে কিছু প্রশ্নের জবাব তার পক্ষে দেয়া সম্ভব। ঠিক আছে, এবার বলো কোন্ ছবিতে আমি গ্রামের মেয়ে চাঁদনি চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম?"

"এটা আমি কি ক'রে ভুলবো, নিলীমাজি? এটা তো আমার প্রিয় ছবির একটি। ছবিটার নাম *ব্যাক টু ভিলেজ*, ঠিক না?"

"ঠিক। কিন্তু এটা খুব সহজ ছিলো। এবার বলো কোন্ ছবিতে অভিনয় করে ১৯৮২ সালে ফিল্ম ফেয়ার পুরস্কার পেয়েছিলাম?"

"এটা আগেরটার চেয়েও সহজ। *ডার্ক নাইট*-এর জন্যে।"

"হায় ঈশ্বর! তোমর কথাই তো ঠিক। আচ্ছা বলো তো, মনোজ কুমারের সাথে আমি কোন্ ছবিতে অভিনয় করেছিলাম?"

"এটা দেশপ্রেমের একটা ছবি। *দ্য ন্যাশন কলস্*।"

"ওহ্, তুমি এটাও দেখেছো?"

"আমি তো বলেছিই। আপনার সব ছবি আমি দেখেছি। আমি আপনার অনেক বড় একজন ভক্ত। আচ্ছা বলুন তো, আপনি কেন *এভারলাস্টিং লাভ*

ছবিতে ঐ দুই সিকোয়েন্সর চরিত্রে অভিনয় করতে গেলেন? আমার সব সময় মনে হয় ডিরেক্টর আপনাকে অপব্যবহার করেছে।"

"তুমি এ ছবির কথা বলছো দেখে আমি খুব অবাক হচ্ছি। আমার নিজেরও মনে হয় এ ছবিতে অভিনয় না করলেই ভালো হোতো। ছবির সমস্ত কৃতিত্ব চলে গিয়েছিলো শর্মিলার কাছে।"

"কিন্তু *রেইনিং ওভার বম্বে* ছবিতে আপনাকে দারুণ লেগেছে। এর জন্যে আপনাকে পুরস্করা দেয়া উচিত ছিলো কিন্তু তার বদলে তারা *ওম্যান* ছবিতে আপনাকে পুরস্কারটা দিলো।"

"হ্যা। তুমি ঠিকই বলেছো। এই দুটো ছবির মধ্যে আমাকে বেছে নিতে বলা হলেও আমি *রেইনিং ওভার বম্বেটাই* বেছে নিতাম। বলতেই হচ্ছে তুমি অনেক ছবি দেখেছো। তোমর নাম কি?"

"আমার নাম রণজিৎ মিস্ত্রি। আমার বয়স চব্বিশ। আপনাকে *মুমতাজ মহল*-এর ব্যাপারে প্রশ্ন করতে চাই। আমার মতে ওটা আপনার সেরা ছবি। দিলীপ সাহেবের সাথে আপনার রোমান্টিক দৃশ্যটি অসাধারণ ছিলো।"

"দারুণ। তুমি দেখি বেশ ভালো সিনেমা দ্যাখো। আচ্ছা, তুমি মেঝেতে বসে আছো কেন? সোফায় এসে বসো। রাম, ফোন হাতে তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি করছো? তুমি কি দেখতে পাচ্ছো না বাড়িতে একজন মেহমান এসেছে? যাও, দু'কাপ চা আর বিস্কিট নিয়ে এসো। তো তোমাকে বলি, *মুমতাজ মহল* ছবির কথা যখন..."

চা আর বিস্কিট নিয়ে যখন আমি ফিরে এলাম দেখি নিলীমা আর চোরটা হাসি ঠাট্টা করছে। যেনো তারা অনেক দিনের পরিচিত বন্ধু। অবিশ্বাসে আমি মাথা ঝাঁকালাম। এই লোকটা বাড়িতে চুরি করতে এসেছে অথচ নিলীমার ছবির একজন ভক্ত ব'লে তাকে আদর করে এখন চা-বিস্কিট দিয়ে আপ্যায়ন করা হচ্ছে!

থৃলার হিসেবে শুরু হওয়া একটা ঘটনা শেষ হচ্ছে পারিবারিক ড্রামা হিসেবে।

এক রাতে আমাকে ডেকে নিলীমাজি বললেন, "রাম, আমি চাই তুমি আগামীকাল চাউলে শিফট করো। মাত্র দু'দিনের জন্যে। বাড়িতে আমার একটু প্রাইভেসির দরকার আছে।"

"কিন্তু কেন ম্যাডাম?"

"কোনো প্রশ্ন কোরো না," বিরক্ত হয়ে তিনি বললেন। "যা বললাম তাই

করো।"

এই ধরণের নির্দেশ পরবর্তী তিন মাসে তিন তিনবার দেয়া হলো আমাকে। আমি বুঝতে পারলাম আমি বাড়িতে না থাকলে তার প্রেমিক বাড়িতে আসে। আর আমি এ ব্যাপারটা জেনে যাই সেটা তিনি চান না। তো এরপর আমাকে যখন ঐ একই নির্দেশ দিলেন আমি সেটা পুরোপুরি পালন করলাম না। রাতে আমি ঘাটকোপারে চলে গেলাম ঠিকই কিন্তু সকাল সাতটা বাজে ফ্ল্যাটে না গিয়ে পরদিন ভোর পাঁচটা বাজে চলে এলাম। ফ্ল্যাটের আশেপাশে থাকলাম, ভেতরে ঢুকলাম না। ঠিক ছয়টা বাজে এক লোক দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো। লম্বা, দেখতে সুন্দর কিন্তু চোখ দুটো লাল টকটকে। মাথার চুল এলোমেলো। সাদা শার্ট আর নীল রঙের জিন্স পরে আছে সে। ডান হাতে এক বান্ডিল টাকা আর বাম হাতে সদ্য জ্বালানো একটা সিগারেট এবং গাড়ির চাবির রিং। তাকে দেখে খুব চেনা চেনা লাগলেও আমি ধরতে পারলাম না লোকটা কে। চলে যাবার সময় সে আমাকে খেয়ালই করলো না। ঠিক সাতটা বাজেই আমি ফ্ল্যাটে ঢুকলাম।

ড্রইং রুমের অবস্থা দেখে আমি বিরাট একটা ধাক্কা খেলাম। সিগারেটের ফিল্টার আর ছাই পড়ে আছে সর্বত্র। সেন্ট্রাল টেবিলে একটা গ্লাস উল্টে পড়ে আছে। তার পাশে আছে খালি দু'বোতল হুইস্কি।

দ্বিতীয় যে জিনিসটা আমাকে ভড়কে দিলো সেটা হলো নিলীমা কুমারির সারা মুখে আঘাতের চিহ্ন। চোখের নিচে কালচে দাগ। "হায় ঈশ্বর! ম্যাডাম, আপনার কি হয়েছে?" আমি চিৎকার ক'রে বললাম।

"কিছু না, রাম। আমি বিছানা থেকে পড়ে ব্যাথা পেয়েছি। চিন্তার কিছু নেই।"

আমি জানি উনি মিথ্যে বলছেন। যে লোকটাকে ভোর বেলায় ফ্ল্যাট থেকে বের হতে দেখেছি সে-ই এ কাজ করেছে। আর এর বিনিময়ে কিনা নিলীমা তাকে সিগারেট, হুইস্কি আর টাকা-পয়সা দিয়েছে! আমার খুব রাগ হলো, কষ্টও হলো তার জন্যে, কিন্তু তাকে রক্ষা করার ব্যাপারে আমি একেবারেই অসহায়।

ঐ দিন থেকে নিলীমার মধ্যে বেশ পরিবর্তন দেখা গেলো। আরো বেশি আত্মকেন্দ্রিক আর উদাস হয়ে গেলেন তিনি। আমার মনে হয় তিনি হুইস্কি খেতেও শুরু করেছেন কারণ তার মুখ থেকে প্রায়ই আমি মদের গন্ধ পাই।

এক সকালে আবারো তার চোখের নিচে আমি কালো দাগ দেখতে পেলাম। হাতে সিগারেটের পোড়া দাগও। আর সহ্য হলো না। "ম্যাডাম, আপনার এই অবস্থা দেখে আমার খুব খারাপ লাগছে। কে এসব করেছে?" তাকে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

উনি হয়তো বলতে পারতেন, "এটা তোমার ব্যাপার নয়, রাম," কিন্তু

তার মন মেজাজ একটু অন্য রকম ছিলো। "জানো রাম, কেউ একজন বলেছিলো ভালোবাসা না পাওয়ার চেয়ে পেয়ে হারানো অনেক ভালো। কখনও কখনও আমার মনে হয় এটা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে আমিও ভালোবাসা পেয়েছি। আমি জানি না সেই ভালেবাসা আমি এখনও হারিয়ে ফেলেছি কিনা তবে যন্ত্রণা পাচ্ছি ঠিকই। আমার জীবনে একজন পুরুষ আছে। কখনও কখনও আমার মনে হয় সে আমাকে ভালোবাসে। আবার কখনও মনে হয় সে আমাকে ঘৃণা করে। তিলে তিলে সে আমাকে শেষ ক'রে দিচ্ছে।"

"তাহলে তাকে ছেড়ে দিচ্ছেন না কেন?" আমি চিৎকার ক'রে বললাম।

"এটা এতো সহজ নয়। যন্ত্রণার মাঝেও এক ধরণের সুখ আছে। মাঝে মধ্যে আমার মনে হয় যন্ত্রণাই যদি এতো মধুর হয় মৃত্যু না জানি কতো মধুর হবে। সে যখন সিগারেটের আগুন দিয়ে আমাকে পোড়ায় আমি চিৎকার করতে চাই না। তখন আমার সেরা ছবি *ওম্যান* থেকে অবিস্মরণীয় একটি ডায়লগ আওড়াতে ইচ্ছে করে। 'হে জীবন। কতো নাজুক তুমি। মৃত্যুই হলো আমার আসল প্রেমিক। আমার সার্বক্ষণিক সঙ্গী। আসো মৃত্যু, আমাকে গ্রহণ করো। দু'হাত বাড়িয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরো। কানে কানে তোমার নীরব সুমধুর কথাগুলো বলো। আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাও শাশ্বত প্রেমের জগতে।' "

"কিন্তু এটা তো ছবি, ম্যাডাম," আমি অনুনয় ক'রে বললাম।

"আহ্! তুমি কি ভুলে গেছো এক দিন তোমাকে কী বলেছিলাম? একজন অভিনেত্রী চিরকালই অভিনেত্রী। ভুলে যেয়ো না আমি চিরকাল একজন ট্র্যাজেডি কুইন হিসেবেই থাকতে চাই। আর সেটা কেবল স্ক্রিপ্ট দেখে দেখে ডায়লগ বলে হতে চাই না। আমি বাস্তবেও সেটা হতে চাই। মীর্জা গালিব কেবল কাগজে কবিতা লিখেই মহান ট্র্যাজিক কবি হন নি। তোমাকে যন্ত্রণা অনুভব করতে হবে। সেই অভিজ্ঞতা নিতে হবে। নিত্যদিনকার জীবনে এটা আত্মস্থ করতে হবে নইলে তুমি ট্র্যাজিক কুইন হতে পারবে না।"

"এটাই যদি নিয়ম হয় তাহলে আমি কি ট্র্যাজেডি কিং হতে পারবো?" বারো বছরের নিষ্পাপ ছেলের বিস্ময় নিয়ে আমি কথাটা বললাম।

উনি কোনো জবাব দিলেন না।

স্টারবার্স্ট-এর এক সাংবাদিককে ড্রইং রুমে নিলীমা ইন্টারভিউ দিচ্ছেন। গুলাব জামুন আর সমোচা নিয়ে আমি ঘরে ঢুকলাম।

"ঠিক আছে নিলীমাজি। আমরা তো অতীত নিয়ে অনেক কথা বললাম। এবার বর্তমানে আসি। আপনি ছবি ছেড়ে দিলেন কেন?"

আমি সাংবাদিক মেয়েটিকে দেখলাম। অল্পবয়সী আর দেখতে খুব সুন্দর। ধবধবে ফর্সা গায়ের রঙ। কালো রঙের প্যান্ট আর ছাপার কুর্তা পরে আছে সে। পায়ে হাইহিল।

"কারণ আগের মতো আর ছবি তৈরি হচ্ছে না। যে প্যাশন আর কমিটমেন্ট আগে ছিলো সেটা আর এখন নেই। আজকালকার অভিনেতা অভিনেত্রীরা তোতাপাখির মতো সংলাপ আওড়ায়। তাদের মধ্যে কোনো গভীরতা নেই। আমরা এক সময় একটাই ছবি করতাম। এখন একজন এক দিনেই তিনটি ছবিতে কাজ করে। এটা তো হাস্যকর," নিলীমা হাত নেড়ে বললেন।

"কথাটা বলার জন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন। শুনেছি আপনাকে কেউ ছবিতে ডাকে না দেখেই আপনি এ জগত ছেড়ে দিয়েছেন।"

তার চোখে মুখে রাগের বর্হিপ্রকাশ দেখা গেলো। "কে তোমাকে এ কথা বলেছে? এটা একদম মিথ্যে কথা। অনেক অফার পেলেও আমি ফিরিয়ে দিয়েছি ঐসব ছবি হিরোইন প্রধান নয় বলে।"

"মানে বলতে চাচ্ছেন আপনাকে তারা নায়িকার চরিত্রে আর নিতে চায় না। বড়বোন কিংবা মা-খালার চরিত্রে অভিনয় করতে বলে?"

"কতো বড় আস্পর্ধা তোমার! আমার সামনে এ কথা বলছো? বলতে বাধ্য হচ্ছি, আজকালকার সাংবাদিকেরাও কী করে ভদ্রভাবে কথা বলতে হয় জানে না। আমার ঘরে ট্রফি আর পুরস্কারগুলো কি তোমার চোখে পড়ে নি? তোমার কি ধারণা এসব আমি অভিনয় না করেই পেয়েছি? তুমি কি মনে করো আজকালকার এক্সট্রাতুল্য দু'পয়সার নায়িকাদের মতো বনে বাদারে গান গেয়ে ট্র্যাজেডি কুইন খেতাব পেয়েছি আমি?"

"কিন্তু...আমরা তো আপনার অতীত ক্যারিয়ার নিয়ে কথা বলছি না—"

"আমি জানি তুমি কি নিয়ে কথা বলছো। প্লিজ, আমর এখান থেকে চলে যাও। রাম, এই মেয়েটাকে দরজা দেখিয়ে দাও। আর কখনও তাকে এ বাড়িতে ঢুকতে দেবে না।" সোফা থেকে উঠে অন্য ঘরে চলে গেলেন তিনি। আমি দরজা পর্যন্ত হতবাক হওয়া সাংবাদিককে পৌছে দিলাম।

বুঝতে পারলম না এটা কি কমেডি, ড্রামা নাকি ট্র্যাজেডি।

নিলীমার ফ্ল্যাটে অনেক ছবির ফ্রেম আছে। কিন্তু সবই তার নিজের ছবির। পুরস্কার নিচ্ছেন, অভিনয় করছেন, সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। অন্য কোনো নায়ক-নায়িকার ছবি তার ঘরে নেই, কেবল শোবার ঘরে দুটো ছবি

ছাড়া। দু'জন অপূর্ব সুন্দরী মহিলার ছবি। একজন শ্বেতাঙ্গ আর আরেকজন ভারতীয়।

"এই মহিলা দু'জন কারা?" একদিন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম।

"বাম দিকেরটা মেরিলিন মনরোর আর ডান দিকেরটা মধুবালার।"

"তারা আবার কারা?"

তারা দু'জনেই খুব বিখ্যাত অভিনেত্রী। অল্প বয়সে মারা গেছেন।"

"তাহলে আপনি এদের ছবি রেখেছেন কেন?"

"কারণ আমিও অল্প বয়সে মরে যেতে চাই। বুড়ো বয়সে হতশ্রী অবস্থায় আমি মরতে চাই না। *ফিল্ম ডাইজেস্ট* পত্রিকায় এ সপ্তাহে অভিত্রেী শাকিলার ছবিটা দেখেছো? পঞ্চাশের দশকে উনি খুব জনপ্রিয় ছিলেন। এখন তার বয়স নব্বইয়ের মতো হবে। তাকে দেখতে কেমন বৃদ্ধ আর কুৎসিত লাগে দেখেছো? কিন্তু মেরিলিন মনরো আর মধুবালাকে লোকে সব সময় তরুণী হিসেবেই মনে রাখবে, কারণ তারা তরুণী হিসেবেই মারা গেছেন। আমিও তাদের মতো অল্প বয়সে মরে যেতে চাই। সবার মনে যেনো আমার অল্প বয়সের ছবিটাই গেঁথে থাকে। নব্বই বছর বয়সে আমি মরতে চাই না। ইচ্ছে করে সময়টা থামিয়ে দেই। প্রতিটি আয়না ভেঙে ফেলি। আমার যৌবনের ছবিটাই যেনো স্থির হয়ে থাকে সব সময়।"

এ কথা শুনে আমার মধ্যে অদ্ভুত এক দুঃখবোধের সৃষ্টি হলো। এক দিক থেকে নিলীমাও এতিম। ঠিক আমার মতো। তবে আমার মতো তিনি একেবারে একা নন। তার রয়েছে বিশাল একটা পরিবার—তার ভক্তকূল আর ডিরেক্টররা। তাদের জন্যে তিনি সব কিছু বলি দিয়েছেন।

এই প্রথম আমি কোনো চলচ্চিত্র তারকা নই বলে নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান মনে করলাম।

বাড়িতে একজন বিখ্যাত প্রযোজক এসেছেন। নিলীমা খুবই খুশি। আনন্দে উদ্বেলিত। তার বিশ্বাস তাকে ভালো একটা ছবিতে অফার দেয়া হবে, আবারো তিনি চলচ্চিত্র জগতে পদার্পন করবেন। সারাটা দিন তিনি মেকআপ আর বিভিন্ন পোশাক পরে দেখলেন কোন্‌টাতে তাকে মানায়।

রাতের বেলায় প্রযোজক সাহেব এলেন। ছোটোখাটো আর টেকো মাথার ভূড়িসর্বস্ব এক লোক। আমাকে গুলাব জামুন, সমোচা আর শরবত নিয়ে আসতে বলা হলো।

"...রোলটা আপনার জন্যে খুবই ভালো হবে, নিলীমাজি," প্রযোজক

বললেন। "আমি তো সব সময়ই আপনার একজন ফ্যান। আপনার *ওম্যান* আমি পঞ্চাশ বার দেখেছি। মৃত্যুর দৃশ্যটা। হায় ঈশ্বর! ওটা দেখলে আমি...কী আর বলবো। এজন্যেই তো আমি ঠিক করেছি আপনাকে আবার ছবির জগতে ফিরিয়ে আনবো। এই ছবিটা হবে নারী কেন্দ্রিক। পরিচালকও বেশ ভালো নিয়েছি। আপনাকে আমি অসাধারণ একটি রোল অফার করছি।"

"আপনি কোন্ ডিরেক্টরকে নিয়েছেন?"

"চিম্পু ধাওয়ান।"

"কিন্তু সে কি কমেডিয়ান ছবির পরিচালক না?"

"তাতে কি? ছবিতে কিছু কমেডি তো আছেই। লিড রোলের জন্যে শাহরুখ খান আর টাবুকে নিয়ে নিয়েছি।"

"বুঝতে পারলাম না। আপনি এরইমধ্যে একজন হিরোইনও ঠিক ক'রে ফেলেছেন। তাহলে কি আপনার ছবিতে দু'জন হিরোইন?"

"না। তা হবে কেন।"

"তাহলে টাবু কি করবে?"

"ও-ই তো হিরোইন।"

"আর আমি?"

"ওহ্ আপনি বুঝতে পারেন নি? আমি আপনাকে শাহরুখ খানের মায়ের চরিত্রে অফার করছি।"

সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রযোজককে ঝেটিয়ে বিদায় করলেন তিনি।

প্রযোজক গালি দিতে দিতে চলে গেলেন। "বুড়ি মাগি। নিজেকে কী ভাবিস? আরে, বুড়ি দেখি এখনও নিজেকে হিরোইন ভাবে! আয়নায় নিজের মুখ দেখিছিস? তোর ভাগ্য ভালো আমি তোকে দাদীর রোল করতে বলি নি। হাহ্!"

আমি ভাবলাম এটা খুব ভলো একটি কমেডি সিন।

তার প্রেমিক আবারো তার বাড়িতে এলো। কিন্তু এবার অবস্থা আগের চেয়েও গুরুতর। তার বাম চোখের নিচে গভীরভাবে কেটে গেছে। তার চোয়ালও ফুলে আছে। কথা বলতে খুব কষ্ট হচ্ছে তার।

"আমাদের পুলিশ ডাকা উচিত, ম্যাডাম। ঐ শূয়োরটাকে গ্রেফতার করা দরকার," তার ক্ষতস্থানে অ্যান্টিসেপটিক লাগাতে লাগাতে আমি বললাম।

"না, রাম। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"আরে, অন্তত ওর নামটা তো আমাকে বলবেন।"

উন্মাদের মতো হেসে ফেললেন তিনি। "তাতে কী আর এমন লাভ হবে? চিন্তা কোরো না। ঐ লোক আর এখানে আসবে না। আমি তার সাথে সব ধরণের সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলেছি। এজন্যেই তো সে আমার সাথে এ রকম করেছে। আবার যদি সে আমার কাছে আসে আমি তার মুখে থুতু দিয়ে দেবো।"

"আপনি আর কতো দিন নীরবে এসব সহ্য ক'রে যাবেন? দেখেন আপনার মুখের কী করেছে সে।"

"নীরবে সব সহ্য ক'রে যাওয়টা হলো মেয়েদের নিয়তি। আমার শরীরের কি অবস্থা সে করেছে সেটার সাথে তুলনা করলে আমার মুখের আঘাতকে সামান্যই বলতে হবে। তুমি কি সেটা আসলেই দেখতে চাও? তাহলে দ্যাখো।" ব্লাউজ খুলে তিনি ব্রাটাও খুলে ফেললেন এক ঝটকায়। আমি আমার জীবনে এই প্রথম কোনো মহিলার নগ্ন বুক দেখলাম। স্তন দুটো বিশাল, একটু ঝুলে আছে যেনো। কিন্তু সমগ্র বুকে সিগারেটের অসংখ্য পোড়া চিহ্ন দেখে আমি আৎকে উঠলাম। কাঁদতে শুরু করলাম আমি।

নিলীমা কুমারিও কাঁদতে লাগলেন। "আমি আর মুখোশ পরে থাকতে চাই না। অনেক ফেসলিফট করেছি। অনেক কিছু করেছি সৌন্দর্য ধরে রাখার জন্যে। একবারের জন্যে আমি এই জীবনে সত্যিকারের নারী হতে চাই। আমার বুকে আসো, বাবা," কথাটা বলেই তিনি আমাকে নিজের বুকে টেনে নিলেন।

আমি জানি না নিলীমা কুমারি যখন আমাকে তার বুকে টেনে নিলেন তখন তিনি কী ভাবছিলেন। হতে পারে তিনি আমাকে তার সন্তান কিংবা প্রেমিকের মতো দেখেছেন। হতে পারে তিনি নিজের যন্ত্রণা ভুলে থাকার জন্যে একটু সস্তা রোমাঞ্চ পেতে চাইছিলেন। কিন্তু তার বুকে মাথা রেখে আমি এই দিন দুনিয়ার সব ভুলে গেলাম। বলা যায় আমি জ্ঞান হারালাম। আর প্রথমবারের মতো নিজেকে কোনো এতিম ব'লে মনে হলো না আমার। মনে হলো আমার সত্যিকারের একজন মা রয়েছে, যার চেহারা আমি নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছি। যার শরীরের স্পর্শ আমি অনুভব করতে পারছি। আমার নোনা চোখের জলের সাথে তার বুকের সুঘ্রাণ মিশে এমন একটা ঘ্রাণের সৃষ্টি হলো যা আমার তেরো বছরের জীবনে সবচাইতে সেরা অভিজ্ঞতা বলা চলে। জীবনের সমস্ত দুঃখকষ্ট আর অপমানের কথা ভুলে গেলাম এক মুহূর্তে। সময়কে থামিয়ে দিয়ে সেই মুহূর্তটাকে চিরস্থায়ী করার ইচ্ছে জাগলো আমার। সত্যিকারে এক আবেগের মধ্যে ডুবে রইলাম আমরা। এখানে কোনো অভিনয় নেই। কোনো অভিনয় শিল্পী এটাকে অনুকরণও করতে পারবে না।

এজন্যেই আমি এই এপিসোডটাকে কোনো ড্রামা, ট্র্যাজেডি কিংবা থ্রিলার হিসেবে সংজ্ঞায়িত করবো না। এটা এসবের একেবারে উর্ধ্বে।

নিলীমা আর আমি সেই সকালের ব্যাপার নিয়ে আর কখনই কথা বলি নি। সেরকম ঘটনা আর কখনও ঘটলোও না। কিন্তু আমরা এটা জানতাম যে, আমাদের দু'জনের জীবনই চিরকালের জন্যে বদলে গেছে।

নিজের মুখোশ খুলে ফেলতে চাইলেও সেই মানসিক শক্তি তার নেই। আমার কাছ থেকে কোনো সাহায্য নিতেও অস্বীকার করলেন তিনি। আগের চেয়ে আরো বেশি বিষন্ন হয়ে পড়লেন। এতো বেশি মদ পান করতে শুরু করলেন যে, সারা দিন বেহুশের মতো পড়ে থাকেন। বাড়ির অন্যান্য কাজের লোক আর বাবুর্চিকে মানা ক'রে দিলেন। কেবল আমিই রয়ে গেলাম তার ফ্ল্যাটে। এরপরই তিনি নিজের জীবনের সবচাইতে সেরা ভূমিকায় অভিনয়ের জন্যে প্রস্তুত হলেন।

আমাকে তিনি তার সমস্ত ম্যাগাজিনগুলো একটা বান্ডিল ক'রে রাখতে বললেন। নিজের হাতেই সমস্ত ট্রফি আর পুরস্কারগুলো সাজালেন। সবচাইতে দামি শাড়ি আর গয়না পরলেন বেশ সুন্দর ক'রে। আয়নার সামনে বসে তিন ঘণ্টা ধরে সুন্দর ক'রে সাজালেন নিজেকে। সাজগোজের পর সমস্ত কসমেটিক্স টয়লেটে নিয়ে গিয়ে ফ্লাশ ক'রে দিলেন। ফেলে দিলেন ম্যাডিসিন ক্যাবিনেটে রাখা সব ধরণের বিউটি এইডও। তারপর তার মায়ের জন্যে রাখা পেইনকিলার ট্যাবলেটগুলো একে একে খেয়ে ফেললেন। আমি জানি না সংখ্যায় কতোগুলো ছিলো।

শেষে বেডরুমে গিয়ে ভিসিআর-এ তার *মুমতাজ মহল* ছবির ক্যাসেটটা ঢুকিয়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। ছবি শুরু হয়ে গেলে আমাকে বাজার থেকে শাকসব্জি কিনে আনতে বললেন নিলীমা কুমারি।

বাজার থেকে রাতের বেলায় ফিরে এসে দেখি একেবারে নববধূর মতো বিছানায় ঘুমিয়ে আছেন তিনি। কিন্তু তিনি যে মারা গেছেন সেটা বোঝার জন্যে আমাকে তার হিমশীতল গায়ে হাত দিয়ে দেখতে হলো না। তার হাতে একটা ট্রফি ধরা। ওটাতে লেখা আছে 'মুমতাজ মহল ছবিতে অভিনয়ের স্বীকৃতিস্বরূপ সেরা অভিনেত্রীর জন্যে ১৯৮৫ সালের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার দেয়া হলো নিলীমা কুমারিকে।'

নিলীমা কুমারির মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম না কী করবো।

একটা ব্যাপারই কেবল বুঝতে পারলাম, কোনোভাবেই পুলিশের কাছে যাওয়া যাবে না। তারা আমাকে আসামী বানিয়ে হত্যাকাণ্ডের জন্যে অভিযুক্ত করতে একটুও দ্বিধা করবে না। তাই আমি যৌক্তিক একটা কাজ করলাম। পালিয়ে গেলাম ঘাটকোপারের চাউলে।

"তুই এখানে এসেছিস কেন?" সেলিম আমাকে জিজ্ঞেস করলো।

"অন্যান্য কাজের লোকদের মতো আমাকেও ম্যাডাম ডিসমিস ক'রে দিয়েছেন।"

"তাহালে এখন কী করবি? এই চাউলের ভাড়া কিভাবে দিবি?"

"চিন্তা করিস না। আগামী দু'মাসের ভাড়ার টাকা তিনি দিয়ে দিয়েছেন। এই সময়ের মধ্যে আমি একটা নতুন কাজ জুটিয়ে নিতে পারবো।"

চাউলে থাকার সময় প্রতি দিন আমি পুলিশের জিপ এসে আমাকে ধরে নিয়ে যাবে ব'লে ভয়ে অস্থির থাকতাম। তবে সেরকম কিছুই ঘটলো না। পত্রপত্রিকায়ও নিলীমা কুমারির মৃত্যুর কোনো সংবাদ বেরোলো না। কিছু দিন পরই আমি ভট্টিখানায় একটা কাজ পেয়ে গেলাম।

এক মাস পরে তারা তার মৃতদেহ আবিষ্কার করলো। প্রতিবেশীদের একজন দুর্গন্ধের জন্যে অভিযোগ জানালেই কেবল পুলিশ এসে তার ঘরের দরজা ভেঙে তার লাশ খুঁজে পায়। তারা ড্রইংরুম আর প্রথম শোবার ঘরে কিছুই পায় নি। এরপর মাস্টার বেডরুমে নিলীমা কুমারির এক মাসের গলিত লাশ খুঁজে পায় পুলিশ। এতোটাই গলে গিয়েছিলো যে তার লাশ শনাক্ত করা হয় তার দাঁতের রেকর্ড দেখে। পত্রিকায় নিলীমা কুমারির সেই বীভৎস গলিত মৃত দেহের ছবিই প্রকাশ হলো। লেখা হলো 'বিগত দিনের বিখ্যাত অভিনেত্রী ট্র্যাজেডি কুইন নিলীমা কুমারি আত্মহত্যা করেছেন। তার বয়স হয়েছিলো চৌচোল্লিশ। এক মাসে পর তার গলিত লাশ আবিষ্কার করেছে পুলিশ।'

এটাকে আমি আসলেই একটা ট্র্যাজেডি বলবো।

স্মিতা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। "ফিল্মস্টাররা যে বিকারগ্রস্ত হয়ে থাকে তাতে অবাক হবার কিছু নেই! জানো, আমিও *মুমতাজ মহল* দেখেছি। তাকে দারুণ লেগেছে ঐ ছবিতে।"

"দুঃখজনক। এখন আমরা কি নিলীমা কুমারির কথা বলবো নাকি কুইজ

শোতে ফিরে যাবো?"

একান্ত অনিচ্ছায় স্মিতা রিমোটের 'প্লে' বাটনে চাপ দিলো।

স্টুডিওর ভেতরে তুমুল উত্তেজনা আর ফিসফাস চলছে। আমরা লম্বা একটা বিরতিতে আছি। মেয়েদের মতো কিংবা রকস্টারের মতো লম্বা চুলের প্রযোজক সাহেব প্রেম কুমারের সাথে এক কোণে কথা বলছে। সে চলে যাবার পর প্রেম কুমার আমাকে আমার সিটে বসার ইশারা করলো।

"দ্যাখো মিঃ টমাস," প্রেম কুমার বললো, "তুমি এ পর্যন্ত শোতে দারুণ পারফর্মেন্স করেছো। ইতিমধ্যে তোমার পকেটে এক মিলিয়ন রুপি চলে এসেছে। এখন আমাকে বলো তুমি কী করতে চাও?"

"মানে, কী বলতে চাচ্ছেন?"

"এখন কিন্তু এমন একটা স্টেজ যাকে আমাদের বলে প্লে অর পে। এই রাউন্ডে খেলতে চাইলে তোমাকে শেষ প্রশ্ন পর্যন্ত খেলতেই হবে। না হলে তুমি এখান থেকে কুইট ক'রে মিলিয়ন রুপি নিয়ে চলে যেতে পারো।"

"তাহলে আমি চলে যাচ্ছি। এখন পর্যন্ত আমি ভাগ্যের জোরে এতোদূর পর্যন্ত এসেছি। এখন হয়তো আর ভাগ্য আমার সহায় হবে না।"

"তাহলে তো খুব দুঃখের কথা। মিঃ টমাস, আমরা মনে করি তুমি এই দুনিয়ার সবচাইতে বড় কুইজ শো জিতে ইতিহাস তৈরি করতে পারবে। আমাদের তরুণ প্রজন্মের কাছে তুমি হতে পারো একজন রোল মডেল। তাই আমরা ঠিক করেছি তোমার জন্যে সামনের প্রশ্ন তিনটি একটু সহজ ক'রে দেবো। মনে আছে তো, আমি তোমাকে দ্বিতীয় প্রশ্নটার ব্যাপারে সাহায্য করেছিলাম? তখন যদি আমি প্রশ্নটা বদলে না দিতাম তবে তুমি খালি হাতে ফিরে যেতে। বাকি তিনটি প্রশ্নের বেলায়ও আমি তোমাকে একইভাবে সাহায্য করবো। তোমাকে কথা দিচ্ছি, তুমি যদি এখন খেলতে রাজি থাকো তবে আমরা তোমাকে বিজয়ী হতে সাহায্য করবো। এটা হলে আমাদের শো'য়ের জন্যেও ভালো হবে। চার দিকে সাড়া পড়ে যাবে।"

"এরপর কী ধরণের প্রশ্ন করবেন?"

"তাতে কিছু যায় আসে না। কারণ আগেভাগেই গোপনে আমরা তোমাকে জবাবটা জানিয়ে দেবো। তুমি যদি আমাকে দু'নাম্বার প্রশ্নের সময় বিশ্বাস ক'রে থাকো তবে আমি বলবো দশ, এগারো আর বারো নাম্বার প্রশ্নের বেলায়ও তোমার তাই করা উচিত। তো আমরা কি একটা চুক্তিতে আসতে পারি?"

"আপনি যদি আমার বিজয়ের ব্যাপারে এরকম নিশ্চয়তা দেন তো আমি

না করি কিভাবে। তাহলে আমাকে বলুন পরের প্রশ্নটা কি?"

"দারুণ!" প্রেম কুমার হাত তালি দিলো। "বিলি," প্রযোজককে ডেকে বললো সে, "মিঃ টমাস খেলা চালিয়ে যেতে রাজি হয়েছে।" আমার দিকে ফিরে আবার বললো সে, "ঠিক আছে, পরের প্রশ্ন কি হবে আমি তোমায় বলে দিচ্ছি। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করবো ইন্ডিয়া আর শ্রীলংকার মাঝখানে পাক প্রণালীর দৈর্ঘ কতো? চয়েজগুলো হবে, এ) ৬৪ কিমি, বি) ৯৪ কিমি, সি) ১৩৭ কিমি এবং ডি) ২০৯ কিমি। সঠিক জবাব হবে সি। ১৩৭ কিমি। বুঝতে পেরেছো?"

"কিন্তু আমি কি করে নিশ্চিত হবো এটাই সঠিক প্রশ্ন?"

"ওহ্ তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছো না, মিঃ টমাস? অবশ্য আমি তোমাকে দোষ দেবো না। হাজার হোক বিলিয়ন রুপির ব্যাপার। তাহলে তোমাকে প্রমাণ দিতে হবে। এই যে, এই বইটায় দ্যাখো। আমি নিশ্চত তুমি পড়তে পারছো।" একটা ডায়রি বের করলো সে যার পাতার পর পাতা জুড়ে আছে অসংখ্য প্রশ্ন আর উত্তর। একটু আগে করা প্রশ্নটার দিকে সে ইঙ্গিত করলো। জবাবের জায়গায় লেখা আছে ১৩৭ কিমি।

"এবার তো তুমি সন্তুষ্ট হয়েছো?"

"ঠিক আছে। আমরা তাহলে সিটে ফিরে যাই।"

সিগনেচার টিউনটা বাজতে শুরু করলে প্রেম কুমার দর্শকদের উদ্দেশ্যে বললো, "লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলমেন। আমরা ইতিহাস সৃষ্টি করতে যাচ্ছি। আমাদের এই প্রতিযোগী ইতিমধ্যে মিলিয়ন রুপি জিতে গেছে। এবার তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে সে কি সর্বোচ্চ পুরস্কারের জন্যে খেলবে নাকি এক মিলিয়ন রুপি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে। মিঃ টমাস, এবার তোমার সিদ্ধান্ত নেবার পালা। তুমি কি ঠিক করলে?" আমার দিকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গীতে হেসে বললো সে।

"আমি খেলবো," আস্তে ক'রে বললাম আমি।

"কী বললে?" প্রেম কুমার বললো। "আরেকটু জোরে বলবে কি?"

"আমি খেলবো," আমি দৃঢ়ভাবে এবং বেশ জোরেই বললাম।

দর্শকদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গে। "হায় ঈশ্বর!" আরেকজন বললো, "কী বোকা রে বাবা!"

"এটাই কি তোমার ফাইনাল কথা?" আমার দিকে হেসে প্রেম কুমার বললো।

"হ্যা," বললাম আমি।

"তাহলে আমরা ইতিহাস সৃষ্টি করতে যাচ্ছি।" প্রেম কুমার খুশিতে বলে উঠলো। "আমারা এমন একজন প্রতিযোগীকে পেয়েছি যে কিনা এতো বড় ঝুঁকি নিতে রাজি হয়েছে। এখন দেখবো মিঃ টমাস ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারে কিনা। তাহলে তুমি রেডি? দর্শক হাত তালি দিয়ে তাকে উৎসাহ দিন।"

ড্রাম বাজতে শুরু করলো। পর্দায় ভেসে উঠলো 'প্লে অর পে' লেখাটি। উত্তেজনায় দর্শক দাঁড়িয়ে পড়লো।

মিউজিক থেমে গেলে প্রেম কুমার আমার দিকে তাকালো।

"ঠিক আছে, মিঃ টমাস। তুমি এবার যে রাউন্ডে এসেছো সেটাকে আমরা বলি প্লে অর পে। তো প্রশ্ন নাম্বার দশ, দশ মিলিয়ন রুপির জন্যে। ট্র্যাজেডি কুইন নিলীমা কুমারি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার—?"

"কিন্তু এটা তো প্রশ্ন হবার—"

"প্লিজ, মিঃ টমাস। প্রশ্ন করার সময় কোনো কথা বলবে না। প্রশ্নটা আমাকে আবার করতে দাও," খুব দৃঢ়ভাবেই সে কথাটা বললো। "তো বলছিলাম, নিলীমা কুমারি কতো সালে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেছিলেন? এ) ১৯৮৪, বি) ১৯৮৮, সি) ১৯৮৬ নাকি ডি) ১৯৮৫?"

আমি প্রেম কুমারের দিকে তাকালাম। আমার দিকে চেয়ে মুচকি হাসছে সে। এবার তাকে আমি ঝুঝতে পারলাম। বিরতিতে সে আমাকে যা বলেছে সেটা আসলে পরবর্তী রাউন্ডে খেলার জন্যে টোপ দেবার জন্যে বলেছিলো। কিন্তু সে আমার ভাগ্যকে থামানোর ক্ষমতা রাখে না। সেটা এখনও আমার পক্ষে আছে।

"আমি জবাবটা জানি। এটা ডি। ১৯৮৫।"

"কি?" প্রেম কুমার বজ্রাহত কণ্ঠে বললো। সে এতোটাই অবাক হয়েছে যে, ভুলে গেছ আমি একশত ভাগ নিশ্চিত কিনা। সঠিক জবাবের লেখাটা পর্দায় ভেসে উঠলো।

প্রেম কুমার যেনো চোখের সামনে ভুত দেখছে। "মিঃ...টমাস...দশ মিলিয়ন রুপি জিতে গেছে," যন্ত্রের মতো বললো কথাটা।

দর্শকরা উন্মাদের মতো আচরণ করতে শুরু করলো। হাত তালি আর শিষ বাজানো যেনো থামাতেই চাইছে না তারা। কেউ কেউ তো নাচতে শুরু করলো রীতিমতো। প্রেম কুমার কপালের ঘাম মুছে এক ঢোক লেমনেড পান করলো।

যেটা হবার কথা ছিলো ট্র্যাজেডি সেটা কিনা হয়ে গেলো একটা বিপর্যয়।

একটি প্রেম কাহিনী

খাদ্য। আমি কেবল চোখের সামনে খাদ্যই দেখতে পাচ্ছি। এই জনাকীর্ণ রেলস্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি সূতির শার্ট আর লেভি জিন্স পরে। প্রায় দু'ঘণ্টা হতে চললো। বেশিক্ষণ ক্ষিদে থাকলে ক্ষিদে মরে যায়। কিন্তু লম্বা সময় ধরে কিছু না খেলে—গতকাল থেকে আমি কিছু খাই নি—চোখে উল্টাপাল্টা দৃশ্য দেখতে শুরু করবে তুমি। যেমন দেখছি আমি। চারপাশে সবাইকে খেতে দেখছি। আমার জিভে পানি এসে যাচ্ছে। কিন্তু আমার পকেটে মাত্র একটা কয়েন। গতরাতে পঞ্চাশ হাজার রুপি খোয়ানোর পর এটাকে আর সৌভাগ্যের কয়েন ব'লে মনে হচ্ছে না আমার কাছে। তাই উপরের নিচে ঠোঁট চেটে নিজের ক্ষুধা নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলাম।

আমি আমার ক্যাসিও হাতঘড়িটা বিক্রি করতে যাবো অমনি আমার নজরে একটা সাইনবোর্ড পড়লো। এতে বলা আছে 'M—মাত্র এক কিলো মিটার পরেই।' সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেলাম কোথায় গেলে খাবার পাবো আমি। একেবারে বিনে পয়সায়!

আগ্রা রেলস্টেশন থেকে বের হয়ে বড় লাল অক্ষরের M লেখাটা খুঁজতে শুরু করলাম। লোকজনকে জিজ্ঞেস ক'রে খুব সহজেই পৌছে গেলাম ম্যাকডোনাল্ডে। ওখানকার স্মার্ট পোশাক পড়া ওয়েটাররা আমার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালেও আমাকে তাড়িয়ে দিলো না। লেভি জিন্স পরা কাস্টমারকে কেউ তাড়াতে পারে না, দেখতে যতো দীনহীনই মনে হোক না কেন। কাঠের বিনের পাশে আমি একটা সিটে বসলাম। যখন দেখলাম কেউ আমাকে লক্ষ্য করছে না তখন বিনে হাত ঢুকিয়ে ওখানে ফেলে দেয়া যে কয়টা বাদামি রঙের ব্যাগ পেলাম হাতে নিয়ে টয়লেটে গিয়ে মুখটা পরিস্কার ক'রে বের হয়ে এলাম সেখান থেকে।

সফলভাবেই আমি বিনে পয়সায় খবার সংগ্রহ করতে পারলাম। বাইরের একটা বেঞ্চে বসে প্যাকেট থেকে আধখাওয়া ভেজিটেবল বার্গার, কিছু চিকেন ফ্রাই আর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খেয়ে নিলাম। এক ক্যান সেভেন আপও ছিলো ব্যাগে।

খাওয়া শেষে সেটাও গলাধকরণ করলাম। এভাবে উচ্ছিষ্ট খাবার খাওয়াটা পথঘাটের শিশুদের জন্যে বেঁচে থাকার অন্যতম একটি অবলম্বন। তবে আমি মনে করি সবচাইতে সহজ উপায়ে বিনে পয়সায় খাবার খাওয়ার জায়গা হলো বিয়ে বাড়ি। সেলিম এ ব্যাপারে বেশ দক্ষ ছিলো। এতে কেবল ভালো জামা-কাপড় আর জুতা পরলেই চলে। ছেলেপক্ষ ভাববে তুমি মেয়েপক্ষের, আর মেয়েপক্ষ তোমাকে ছেলে পক্ষ হিসেবে ধরে নেবে। ইচ্ছে মতো যতো খুশি খাও, কেউ কিছু বলবে না। সেলিম আবার সঙ্গে ক'রে কিছু কাটলারিও নিয়ে আসতো। তবে নরিমান পোর্টে এক বিয়ের দাওয়াতে গিয়ে সেলিম বিপদে পড়ে যায়। কি একটা বিষয় নিয়ে ছেলেপক্ষ আর মেয়েপক্ষের মধ্যে তুমুল মারামারি শুরু হলে সেলিম উভয় পক্ষের হাতেই মার খায়।

আমার ক্ষুধা মিটে গেলে ঠিক করলাম এই অচেনা শহরটা একটু ঘুরে দেখি। জনাকীর্ণ মানুষের ভীড় আর রিক্সার সারি অনুসরণ ক'রে এগোতে লাগলাম। পথের দু'পাশে নক্সা করা *হাভেলি*গুলো খুব সুন্দর। রাস্তার পাশে কাবাবের দোকান থেকে ঘ্রান ভেসে আসছে। জায়গায় জায়গায় বড় বড় পোস্টার লাগানো। হয় নতুন কোনো ছবি দেখার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে নয়তো কেউ হাতজোর ক'রে ভোট ভিক্ষা চাইছে। পথেঘাটে বৃদ্ধ কারিগররা মার্বেল খোদাই ক'রে নক্সা করছে। আর অত্যাধুনিক এসি দোকানে মোবাইল ফোনসেট বিক্রি হচ্ছে দেদারসে। আমি আবিষ্কার করলাম আগ্রার ধনীরা দিল্লি আর মুম্বাইর ধনীদের চেয়ে আলাদা কিছু নয়। তাদের সবার বাড়িই দেখতে একই রকম। আবার গরীবেরাও প্রায় সবখানে এক রকম। নোংরা বস্তিগু আর ছাপড়া ঘরে থাকে তারা। তাদের বাচ্চা-কাচ্চাদের উদাম গা আর ফোলা ফোলা পেট।

হাটতে হাটতে আমি আচম্‌কা একটা নদীর তীরে এসে পড়লাম। নদীর পানি হলুদ রঙের। কাদার মতো। পানির স্তর দেখে বুঝতে পারলাম বর্ষাকাল এখনও আসে নি। নদীর পানিতে প্লাস্টিক পলিথিন আর বিভিন্ন ধরণের প্যাকেট ভেসে বেড়াচ্ছে। এক জায়গায় তো পানিতে মরা লাশ পর্যন্ত দেখতে পেলাম। পচে গলে সেটা ফুলে উঠেছে। কিন্তু না। এখন সেটা দেখার সময় নেই। আমার চোখ স্থির হয়ে আছে নদীর ওপাড়ে। সাদা একটা মিনারের মতো ভবন। গম্বুজটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সূর্যের অলোয় চকচক করছে সেটা। যেনো পুরো ভবনটা হাতির দাঁতে তৈরি। এর সৌন্দর্য আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেললো।

কিছুক্ষণ পর আমি এক বৃদ্ধ পথচারীকে জিজ্ঞেস করলাম, "একটু শুনুন তো, আপনি কি বলতে পারেন নদীর ওপাড়ে ঐ দালানটা কি?"

সে আমার দিকে এমনভাবে তাকালো যেনো আমি একটা উম্মাদ। "আরে তুমি যদি নাই জানো ঐটা কি তাহলে আগ্রায় এসেছো কেন? গদর্ভ! ওটা হলো তাজমহল।"

তাজমহল। পৃথিবীর অষ্টমাশ্চার্য। এটার কথা আমি শুনেছি কিন্তু কখনও কোনো ছবি দেখি নি। মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম। এরপর কোথায় ঘুমাবো, কি খাবো, পুলিশে ধরা পড়ার ভয়, সবই ভুলে গেলাম। ঠিক করলাম আজকেই আমি তাজমহল দেখতে যাবো।

নদীর পার দিয়ে ত্রিশ মিনিট বিক্ষিপ্ত হাটার পর লাল রঙের একটা প্রবেশদ্বারের সামনে এসে উপস্থিত হলাম। বিশাল সাদা রঙের এক বোর্ডে লেখা তাজমহলের প্রবেশমূল্য ভারতীয় ২০ রুপি, বিদেশী নাগরিক ২০ ডলার। সোমবার বন্ধ, শুক্রবার সর্বসাধারণের জন্যে বিনামূল্যে প্রবেশ।

আমি আমার ক্যাসিও হাতঘড়িতে তাকালাম। শুক্রবার, ১২ই জুন। মনে হচ্ছে আজ আমার ভাগ্য ভালো। আমি মেটাল ডিটেক্টর পেরিয়ে লাল বালির প্রাঙ্গনটা অতিক্রম করলাম। আমার সামনে তাজমহল তার সমস্ত সৌন্দর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিকেলের আলোতেও জ্বলজ্বল করছে সেটা। তাজমহলের সামনের ফোয়ারা আর বাগানটা ঘুরে দেখলাম। খেয়াল করলাম পুরো এলাকাটি লোকজনে পরিপূর্ন। যুবা-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ আর দেশী-বিদেশী লোকে একেবারে গিজগিজ করছে। ছবি তুলছে তারা। আর লাঠি হাতে পুলিশ সবাইকে সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে। ফ

অধঘণ্টা এলোমেলো ঘুরে খেয়াল করলাম একদল পশ্চিমা পর্যটককে বয়স্ক এক গাইড কী সব বর্ণনা ক'রে যাচ্ছে। চুপিসারে আমিও তাদের সাথে যোগ দিলাম। গাইড বলেছে "আমি আপনাদেরকে লালবালির প্রাঙ্গন আর *চৌকি-জিলো-খানার* কথা বলেছি। এবার আমি আপনাদেরকে সংক্ষেপে তাজমহলের ইতিহাস জানাবো।

"মুঘল সাম্রাজ্যের যুবরাজ খুর্‌রম ১৬০৭ সালের কোনো এক দিন দিল্লির মিনাবাজারে ঘোরাঘুরি করছিলেন। সেই সময় তার চোখ পড়ে কাঁচের তসবিহ্ আর রেশমি কাপড় বিক্রি করা এক মেয়ের উপর। মেয়েটির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তখনই তার প্রেমে পড়ে যান শাহজাদা খুর্‌রম। তবে ঐ মেয়েটিকে বিয়ে করতে তাকে আরো পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিলো। তার আসল নাম ছিলো আরজুমান বানু। তবে বিয়ের পর শাহ্‌জাদা তার নতুন নাম দেন মুমতাজ মহল। তার বয়স ছিলো তখন উনিশ আর শাহ্‌জাদা খুর্‌রমের বিশ।

মুমতাজ ছিলো জাহাঙ্গীরের স্ত্রী নুরজাহানের ভাইয়ের মেয়ে। ১৬১২ সালে মুমতাজ খুর্‌রমের বিয়ে হয়। এরপর তাদের বিয়ের আঠারো বছরে জন্ম হয় চৌদ্দটি সন্তানের। মুমতাজ ছিলো তার স্বামীর ঘনিষ্ঠ সহচর, বন্ধু এবং প্রেমিকা। শাহ্‌জান যেখানেই যেতেন সঙ্গে থাকতো মুমতাজ। যুদ্ধ-বিগ্রহ, ভ্রমণ, সবখানে সঙ্গী হোতো প্রাণপ্রিয় স্ত্রী মুমতাজ মহল। স্বামীকে গরীব দুঃখী মানুষের জন্যে দানখয়রাত করতে উদ্বুদ্ধ করতেন তিনি। ১৬৩০ সালে ৭ই জুন বাচ্চা জন্ম দিতে গিয়ে তিনি বুরহান পুরে মারা যান। এর ঠিক তিন বছর আগে শাহ্‌জাদা খুর্‌রম সিংহাসনে অধিষ্টিত হয়েছিলেন। মৃত্যুর আগে স্বামীকে চারটা কাজ করার কথা বলে যান মুমতাজ : প্রথম, তার সৌন্দর্যের সাথে মিল রেখে একটা স্মৃতিসৌধ বানাতে হবে; দ্বিতীয়, তিনি আর বিয়ে করবেন না; তৃতীয়, সন্তানদের প্রতি স্নেহশীল থাকবেন; চতুর্থ, তার মৃত্যুবার্ষিকীতে তিনি সেই সৌধ পরিদর্শন করবেন। মুমতাজের মৃত্যুতে সম্রাট এতোটাই ভেঙে পড়েন যে, একরাতেই তার সব চুল পেকে সাদা হয়ে যায়। এরপর সম্রাট স্ত্রীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই তাজমহল বানান। এর কাজ শুরু হয় ১৬৩১ সালে। বিশ বছর লাগে পুরো কাজ শেষ হতে। মোট শ্রমিকের সংখ্যা ছিলো বিশ হাজারেরও বেশি। পারস্য, অটোমান এমনকি ইউরোপ থেকেও কারিগর আনা হয়েছিলো। তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যা দাঁড়ালো তা তো নিজের চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই তাজমহলকে বর্ণনা করেছেন, 'সময়ের গালে অশ্রুবিন্দু বলে।'

শর্টপ্যান্ট পরা এক তরুণী হাত তুলে বললো, "এক্সকিউজ মি, এই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরটা আবার কে?"

"ওহ্, তিনি আমাদের সবচাইতে বিখ্যাত কবি, নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তাকে তুলনা করা যেতে পারে আপনাদের উইলিয়াম ওয়ার্ডসওর্থের সাথে," গাইড বললো।

"উইলিয়ামটা আবার কে?"

"বাদ দিন। এবার আমি সব সময় যেমনটা বলি, তাজমহলের স্থাপত্যিক এলাকাটি পাঁচ ভাগে বিভক্ত—দারওয়াজা, বাগিচা, মসজিদ, নাক্কারখানা, মানে বিশ্রামকক্ষ আর রওজা, অর্থাৎ সমাধি। আসল সমাধিটা তাজমহলের ভেতরে অবস্থিত। কিছুক্ষণ পরই আমরা সেটা দেখতে যাবো। মুমতাজের সমাধিতে আল্লাহ্‌র নিরানব্বইটি নাম আপনাদেরকে আমি দেখাবো। আরো দেখাবো শাহ্‌জাহানের সমাধিতে পেনবক্সটা। এগুলো সবই মুঘল ঐতিহ্য। উপরের পাথরের সমাধির বেশ নিচে আছে সত্যিকারের কবরগুলো। পুরো সমাধিটা ৫৭ বর্গমিটারের। মাঝখানের বড় গম্বুজটি ২৪.৫ মিটার উঁচু আর ১৭.৭ মিটার

পরিধির। চারপাশের মিনার চারটির উচ্চতা ৪০ মিটার। আপনারা দেখতে পাবেন কাজগুলো কতো নিখুঁতভাবে করা হয়েছে। এমনকি ৩ সেন্টি মিটার জায়গায় ৫০টি পাথর বসানো হয়েছে কোথাও কোথাও।

"ভালোবাসার সৌধ হিসেবে তাজমহল সৌন্দর্য পিপাসুদের কাছে নতুন মাত্রায় উপস্থিত হয়। আপনারা হয়তো খেয়াল করেছেন তাজমহলের আয়তক্ষেত্রের বেইজটা। এটা আসলে কোনো সুন্দরী মেয়েকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখার প্রতীকধর্মী উপস্থাপন বলতে পারেন। মেইন গেটটা মেয়েটির নেকাব বা ঘোমটা। যা বাসর রাতে স্বামী কর্তৃক আস্তে আস্তে তোলা হয়ে থাকে। পূর্ণিমার রাতে তাজমহল দ্যুতি ছড়ায়। এর শ্বেত পাথরে চাঁদের আলো এসে পড়লে অসাধারণ দৃশ্যের অবতারণা হয়। বিভিন্ন সময় তাদের এই বিভিন্ন রূপ নাকি নারীর মেজাজ-মর্জিকে রূপক অর্থে তুলে ধরার জন্যে। এখন আপনাদেরকে আমি সমাধির ভেতরে নিয়ে যাবো। দয়া ক'রে সবার জুতা খুলে ফেলুন।"

জুতা খুলে পর্যটকেরা সমাধির ভেতরে চলে গেলেও আমি বাইরে রয়ে গেলাম। নিলীমা কুমারির বিভিন্ন মেজাজের সাথে তাজের কোনো মিল পাই কিনা দেখার চেষ্টা করলাম আমি।

কে যেনো আল্‌তো ক'রে আমার কাঁধে টোকা মারলো। ঘুরে দেখি বউ বাচ্চাসহ এক বিদেশী। তার কাছে ক্যামেরা, ক্যামকর্ডার, ডিস্ক প্লেয়ার সবই আছে। "তুমি কি ইংরেজিতে কথা বলতে পারো?" ইংরেজিতেই জানতে চাইলো লোকটি।

"হ্যা," আমি জবাব দিলাম।

"তাহলে তাজমহল সম্পর্কে কিছু বলতে পারো আমাদেরকে? আমরা জাপান থেকে এসেছি। এ শহরে আমরা একেবারে নতুন। আজকেই এসেছি এখানে।"

ইচ্ছে করলো বলি, আরে বাবা, আমিও তো এ শহরে নতুন। আমিও তোমাদের মতো আজ এখানে এসেছি। কিন্তু তার আগ্রহী মুখটা দেখে সেটা বললাম না। এইমাত্র দেখা গাইডের মতো ভঙ্গী ক'রে বললাম, "তাজমহল বানিয়েছেন সম্রাট খুর্‌রম, তার প্রাণপ্রিয় স্ত্রী নুরজাহানের জন্যে, যার আরেক নাম হলো মুমতাজ বেগম। ১৫৩১ সালে এটা বানানো হয়। বাগানে যখন হাতের বালা বিক্রি করছিলো তখন স্ত্রীর সাথে তার পরিচয় হয়। তবে উনিশ বছর পর তারা বিয়ে করে। এরপর সে তার স্বামীর সাথে সব ধরণের যুদ্ধ-বিগ্রহ করে আর চৌদ্দবছরে জন্ম দেয় আঠারোটি সন্তান।"

জাপানি আমার কথার মাঝখানে বাধা দিলো। "চৌদ্দ বছরে আঠারোটি বাচ্চা? তুমি নিশ্চিত?" সন্দেহের সুরে জানতে চাইলো সে।

"অবশ্যই," আমি আমার কথায় অটল। "বেশ কয়েকটা জমজ বাচ্চা ছিলো, বুঝলেন। কিন্তু উনিশতম সন্তান জন্ম দেবার সময় সুলতান পুরে মুমতাজ মারা যায়। সেটা জুন মাসের ষোলো তারিখের ঘটনা। মৃত্যুর আগে সম্রাটকে চারটি প্রতীজ্ঞা করায় মুমতাজ এক, তাজমহল বানাতে হবে, দুই, বাচ্চাদের কোনো রকম পিটুনি দেয়া যাবে না। তিন, সম্রাটের নিজের সব চুল সাদা ক'রে ফেলতে হবে। আর চার, মনে পড়ছে না। তবে সেটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু না। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তাজমহলের একটা প্রবেশদ্বার, বাগান, গেস্টহাউজ আর কবর রয়েছে।"

জাপানি সজোরে মাথা দোলালো। "হ্যা, হ্যা। আমরা প্রবেশদ্বার আর বাগান দেখতে পাচ্ছি। কবরটাও দেখতে পাচ্ছি এখন। কিন্তু গেস্টহাউজটা কোথায়?"

আমি বিরক্ত হয়ে তাকালাম তার দিকে। "আপনাদেরকে কি আমি বলি নি, আসল কবরগুলো সব মাটির নিচে আছে? সেজন্যে মাটির উপরে পুরো জায়গাটিই গেস্টহাউজ হিসেবে ধরে নিতে হবে। এবার ভেতরে গেলে দেখতে পাবেন মুমতাজ আর সম্রাটের কবর দুটো। নিরানব্বইটি পাথর বসানো পেন বক্সটি দেখতে ভুলবেন না। আর প্রতি তিন সেন্টি মিটারে দেখতে পাবেন আল্লাহ্তালার পঞ্চাশটির মতো নাম খোদাই করা আছে। মনে রাখবেন, গম্বুজটি ১৬০ মিটার উঁচু আর মিনারগুলো একেকটি সতেরো মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট। তাজমহলকে যদি বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে দেখেন তো বাসর রাতে নববধূকে ভিন্ন ভিন্ন ঘোমটায় দেখতে পাবেন। দেখুন। একবার গিয়ে দেখে আসুন। ভুলে যাবার আগে আপনাদের একটা কথা বলা দরকার। আমাদের বিখ্যাত নোবেলজয়ী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাজমহলের উপর কবিতা লিখে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। কবিতাটির নাম ছিলো, 'উইলিয়াম ওয়ার্ডসওর্থের গালে একটা থাপ্পর'।"

"সত্যি? ওয়াও। খুব মজার তো। গাইড বুকে তো এসব কথা লেখে নি।" বউয়ের সাথে জাপানি ভাষায় অনর্গল কথা বললো সে, তারপর অনুবাদ ক'রে আমাকে জানালো কী বলেছে। "বউকে বললাম, দামি গাইড না নিয়ে ভালো কাজই করেছি। তুমি আমাদেরকে সব কিছু খুব সুন্দর করেই বলেছো। আরিগাতো।" বাও ক'রে আমার হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিলো জাপানি লোকটা। তারা চলে যেতেই হাত খুলে দেখি পঞ্চাশ রুপির একটা কড়কড়ে নতুন নোট। মাত্র পাঁচ মিনিটের কাজের জন্যে!

এবার আমি দুটো বিষয় জানতে পারলাম : আমি তাজমহলের এই শহরে থাকতে চাই, আর একজন টুরিস্ট গাইড হতে আমার কোনো সমস্যা হবে না।

রাত নেমে এলে আমার দরকার পড়লো মাথা গোজার একটা ঠাঁই। পথে এক অল্প বয়সী ছেলের সাথে আমার দেখা হলো। আমার বয়সীই হবে সে। সাদা শার্ট, ধূসর প্যান্ট আর হাইওয়াই চপ্পল পায়ে। রাস্তায় মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে কী যেনো দেখছে। আমি তার কাঁধে আল্‌তো ক'রে টোকা দিয়ে বললাম, "আচ্ছা, আমি এই শহরে নতুন এসেছি। আমাকে কি বলতে পারো কোথায় থাকতে পারি?" তার চোখ দেখে আমার কাছে খুব বন্ধুত্বপূর্ণ ব'লে মনে হলো।

মাথা নেড়ে ছেলেটা বললো, "উহ্-অ্যা-ই!"

"কী বললে?" আমি জানতে চাইলাম।

"উহ্-অ্যা-ই-হু-হু," আবারো বললো সে। হাত ছুড়তে লাগলো এবার।

"আমি তো তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। তোমাকে কষ্ট দেবার জন্যে ক্ষমা চাইছি। অন্য কাউকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখি।"

"হু-হু-অ্যা," আমার হাতটা ধরে টানতে টানতে একটা মার্কেটের দিকে নিয়ে যেতে লাগলো সে। তার চোখেমুখে আন্তরিকতা দেখে আমি আর কিছু বললাম না। তার সাথে চলতে লাগলাম। তার হাটা খুবই অদ্ভুত। পা টিপে টিপে হাটে। অলিগলি পেরিয়ে পনেরো মিনিট বাদে একটা বড় দালানের সামনে এসে দাঁড় করালো আমাকে। বাড়িটার নাম 'স্বপ্না প্যালেস'। পিতলের নেমপ্লেটে সেটা লেখা আছে। ছোটো একটা দরজা খুলে আমাকে নিয়ে সে ভেতরে ঢুকে পড়লো। বাড়ির ভেতরটাতে খোলা একটা লন আছে। মাঝখানে আছে একটা ছোট্ট ফোয়ারা। লনে দু'জন লোককে কাজ করতে দেখলাম। পুরনো একটা গাড়ির পাশে পোশাক পরা শফার দাঁড়িয়ে আছে। আমার বন্ধুটিকে এই বাড়ির সবাই বেশ ভালো করেই চেনে, কারণ কেউ তাকে কোনো প্রশ্ন করছে না। লন পেরিয়ে একটা নক্সা করা কাঠের দরজার কাছে এসে সে বেল বাজালো। অল্পবয়সী কালো বর্ণের এক কাজের মেয়ে দরজা খুলে বললো, "ওহ্ শংকর। এখানে তুমি বার বার কেন আসো? তুমি তো জানোই তোমার এখানে আসাটা ম্যাডাম পছন্দ করেন না।"

শংকর আমার দিকে ইশারা ক'রে বললো, "অ্যা-অ্যা-হু।"

মেয়েটা আমাকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিলো। "ওহ্, তাহলে শংকর তোমাকে নতুন ভাড়াটিয়া হিসেবে নিয়ে এসেছে? আমার মনে হয় না বাড়িতে খালি কোনো ঘর আছে। ম্যাডামকে ডেকে দিচ্ছি আমি।" মেয়েটি বাড়ির ভেতর চলে গেলো।

দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো মাঝবয়সী এক মহিলা। দামি সিল্কের শাড়ি আর কয়েক মন সোনার গয়না পড়ে আছে সে। মুখে কড়া মেকআপ। যৌবনে মহিলা সুন্দরী ছিলো বোঝা যাচ্ছে। তবে নিলীমা কুমারির মতো বয়সকালে

আর সেটা ধরে রাখতে পারে নি। তাছাড়া ঠোঁটে ফুটো ক'রে রিং পরাতে তাকে বিশ্রী দেখাচ্ছে। মহিলাকে আমার মোটেও ভালো লাগলো না।

মহিলাকে দেখে শংকর খুব উত্তেজিত হয়ে উঠলেও মহিলা তাকে পাত্তাই দিলো না। "তুমি কে?" আমাকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে বললো। "শংকরের সাথে কেন এসেছো?"

"আমার নাম রাজু শর্মা," বললাম তাকে। এই শহরে আমার আসল নাম বলার কোনো মানেই হয় না। বিশেষ ক'রে ট্রেনে এক লোককে হত্যা করার পর।

"ওহ্, তাহলে তুমি একজন ব্রাহ্মণ?" কথাটা বলে আমার দিকে আরো বেশি সন্দেহের চোখে তাকালো মহিলা। কালো বর্ণের ব্রাহ্মণ তো সন্দেহের বস্তুই।

"হ্যা, আমি আগ্রায় নতুন এসেছি। এখানে কোনো ঘর খালি আছে কিনা জানতে এসেছি আমি।"

"বাইরের দিকে আমাদের একটা বাড়ি আছে সেখানে আমরা ভাড়াটিয়া রাখি।" খেয়াল করলাম মহিলা আমরা শব্দটি ব্যবহার করেছে। "তবে এখন আর কোনো ঘর খালি নেই। এক সপ্তাহ অপেক্ষা করলে ঘর পেতে পারো। মাসে চারশ রুপি লাগবে ভাড়া হিসেবে। প্রথম মাসের ভাড়া অগ্রীম দিতে হবে। যদি তোমার মনঃপুত হয় তাহলে লাজওয়ান্তি তোমাকে বাইরের ঘরটা দেখিয়ে দেবে। কিন্তু আবারো বলছি, এক সপ্তাহ তোমাকে অন্য কোথাও থাকতে হবে।"

"থ্যাংক ইউ, ম্যাডাম," ইংরেজিতে বললাম আমি। "ঘরটা আমি নেবো। আপনাকে অগ্রীম চারশ টাকাও দিয়ে যাবো।"

ইংরেজিতে কথা বলায় মহিলা আমার দিকে আবারো ভালো ক'রে তাকালো। মনে হলো একটু নরম হলো সে। "তুমি শংকরের সাথে এই একটা সপ্তাহ থাকতে পারো। লাজওয়ান্তি, ওকে ঘরটা দেখিয়ে দে তো।"

দরজার সামনে অনুষ্ঠিত ইন্টারভিউয়ের এভাবেই পরিসমাপ্তি ঘটলো।

লাজওয়ান্তি আমাকে বাড়ির পেছনে ছোট্ট একটা দালানে নিয়ে গেলো। সেটাকে উত্তর ভারতের চাউলের মতো কিছু একটা বলেই মনে হলো আমার। বাড়িটার সামনে পাথর বিছানো বড় একটা আঙিনা আছে। সেই আঙিনার চারপাশে লাগোয়া কতোগুলো চালাঘর। মোট ত্রিশটির মতো হবে। প্রায় মাঝখানের ঘরটাই শংকরের। দরজা খুললে আমরা ভেতরে ঢুকলাম। একটামাত্র বিছানা আর দেয়াল আলমিরা রয়েছে ঘরে। তার পাশে লাগোয়া একটা রান্নাঘর। ঠিক ঘাটকোপারের চাউলের মতো। আঙিনার শেষ মাথায়

টয়লেটগুলো অবস্থিত। গোসলের কাজ সারতে হবে আঙিনায় মাঝখানে মিউনিসিপ্যালের কলের কাছেই। ভাড়াটিয়াদের সবার সামনেই কাজটা করতে হবে। লাজওয়ান্তি তার নিজের ঘরটা দেখালো। শংকরের আটটা ঘর আগে সেটা অবস্থিত। আর এক সপ্তাহ পর আমি যে ঘরটা ভাড়া নেবো সেটা শংকরের চারটা ঘর পরে।

লাজওয়ান্তি মূল বাড়িতে ফিরে যাবার আগে আমি তাকে দ্রুত একটা প্রশ্ন করলাম। "আচ্ছা, শংকর ছেলেটা কে? তার সাথে তাজমহলের কাছে আমার দেখা হয়েছে একটু আগে।"

মেয়েটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। "ও একজন এতিম ছেলে, এখানেই থাকে। আমরা সবাই তাকে খুব পছন্দ করি। ছেলেটার মাথায় কী যেনো একটা সমস্যা আছে তাই ঠিকমতো কথা বলতে পারে না। কী সব হাবিজাবি বলে। সারাদিন সে শহরে ঘুরে বেড়ায়। ম্যাডাম দয়া ক'রে তাকে বিনা পয়সায় এখানে থাকতে দিয়েছে। তাকে উল্টো টাকা দেয়া হয় খাবার কিনে খাওয়ার জন্যে। তা না হলে পাগলা গারদের লোকজন ওকে ধরে নিয়ে যেতো সেই কবে।"

আমি খুব মর্মাহত হলাম। শংকরকে আমার বেশ বুদ্ধিমান বলেই মনে হয়েছে। কেবল কথা বলতে পারে না, এই যা। সম্ভবত ম্যাডাম সম্পর্কে আমার ধারণাও ভুল। তাকে দেখে যেমনটি মনে হয়েছে আসলে মানুষটি সেরকম নয়। শংকরকে এতো সুবিধা তো সে-ই দিয়েছে। "আর ম্যাডামের সম্পর্কে আমাকে আরো কিছু বলো তো," লাজওয়ান্তিকে বললাম।

একজন ইতিহাসবিদের মতো লাজওয়ান্তি তার মালেকীনের বংশ সম্পর্কে বলতে শুরু করলো। "উনার নাম রাণী স্বপ্না দেবি। তবে আমরা তাকে ম্যাডাম অথবা রাণী সাহেবা বলে ডাকি। তার বাবা ছিলেন জামগড়ের রাজা। নাম রাজা শিবনাথ সিং, রাঠোর রাজ পরিবারের প্রধান ছিলেন তিনি। তার মায়ের দিকে নানা ছিলেন রাজা রবি প্রতাপ সিং, আগ্রার কাছেই ধারেলার রাজা ছিলেন তিনি, এই বাড়ির আসল মালিকও তিনিই ছিলেন। বিশ বছর বয়সে স্বপ্না দেবি ভাদোহির রাজা কুনওয়ার প্রতাপ সিংকে বিয়ে করেন। তারা ছিলো গৌতম রাজপরিবারের লোক। বিয়ের পর বেনারসে চলে যায় তারা। ওখানে তাদের বিরাট প্রাসাদ আছে। দুভার্গ্যজনকভাবে তার স্বামী অল্পবয়সেই, বিয়ের মাত্র দু'বছর বাদে মারা যান। এরপর তিনি আর বিয়ে করেন নি। ওখানে স্বামীর মৃত্যুর পরও তিনি আরো বারো বছর ছিলেন। এরপর তার নানা রাজা রবি প্রতাপ সিং মারা গেলে আগ্রার এই *হাভেলিতে* এসে পড়েন তিনি। বিগত দশ বছর ধরে তিনি আগ্রাতেই বাস করছেন।"

"বাচ্চাকাচ্চা নেই?" আমি জানতে চাইলাম।

মাথা দোলালো লাজওয়ান্তি। "না, তার কোনো সন্তানসন্ততি নেই। তাই

তিনি সমাজসেবা আর দানখয়রাত ক'রে ব্যস্ত রাখেন নিজেকে। সম্ভবত তিনি আগ্রার সবচাইতে ধনী মহিলা, উঁচু মহলে তার ভালো যোগাযোগ রয়েছে। পুলিশ কমিশনার আর ডিসি সাহেব প্রতি সপ্তাহে তার বাড়িতে দাওয়াত খান। সুতরাং তার ভাড়ার টাকা নিয়ে টালবাহানা করার কথা চিন্তাও করবে না। একটু দেরি হলেই সোজা ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দেয়া হবে। কথাটা মনে রেখো।"

রাতে শংকর আমার জন্যে খাবার রান্না করলো। নিজের বিছানায় আমাকে জোর ক'রে শুতে দিয়ে সে ঘুমালো মেঝেতে। তার এই আদর-যত্ন আর খাতির দেখে আমার দু'চোখ বেয়ে অশ্রব গড়িয়ে পড়লো। সেও আমার মতো এতিম এক ছেলে, এই কথাটা জানার পর তার প্রতি এক ধরণের টান তৈরি হয়ে গেলো আমার। এক ধরণের নৈকট্য অনুভব করতে শুরু করলাম। তার আর আমার মধ্যে এমন একটা বন্ধন টের পেলাম যা বন্ধুত্ব কিংবা সঙ্গীর চেয়েও বেশি কিছু। শব্দ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না সেটা।

সেই রাতে আগ্রায় তুমুল বৃষ্টি হলো।

সাত দিনের মধ্যে আমাকে চারশ রুপি ম্যাডামের কাছে দিতে হবে তাই আমি আমার সদ্য বেছে নেয়া পেশা সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণে নেমে পড়লাম। আমার কাছে থাকা পঞ্চাশ রুপি আর শংকরের কাছে থেকে ধার নেয়া দশ রুপি দিয়ে সেই তিন দিন তাজমহলে ঢোকার ব্যবস্থা করলাম। পশ্চিমা পর্যটকদের গাইড কি কি বলে সব শুনে মুখস্ত করার চেষ্টা করলাম আমি। যতোদূর সম্ভব তথ্য মনে রাখার চেষ্টা করলাম। কাজটা আমার জন্যে খুব একটা কঠিন মনে হলো না কারণ তাজমহলকে আমি জনাকীর্ণ বাসে পকেটমারের মতো ব্যাপার হিসেবে ধরে নিলাম। সম্ভবত এটা আমার রক্তেই আছে। মুমতাজ মহল হতে পারে আমার মায়ের বংশের কেউ। কিংবা আমার বাবা হয়তো মুঘল বংশেরই কেউ ছিলেন। যাইহোক, চতুর্থ দিনের মধ্যেই আমি তাজমহল সম্পর্কে এতো কিছু জেনে গেলাম যে, আগ্রার লাইসেন্সবিহীন একশ রুপির গাইড হিসেবে নিজেকে উন্নীত করতে সক্ষম হলাম। আমি তাজমহলের প্রবেশদ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে পশ্চিমা পর্যটকদের অফার করতে শুরু ক'রে দিলাম আমাকে তাদের গাইড হিসেবে নেবার জন্যে। আমার প্রথম ক্লায়েন্ট হলো ইংল্যান্ড থেকে আগত একদল কলেজ ছাত্রির দল। যাদের পোশাক বেশ সংক্ষিপ্ত হলেও পকেটে মোটা অংকের ট্রাভেলার্স চেক ছিলো। তারা আমার সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলো, কোনো কঠিন প্রশ্ন করলো না। প্রচুর ছবি তুলতে ব্যস্ত থাকলো

পুরো দলটি। কাজ শেষে আমার হাতে দশ পাউন্ডের একটা নোট ধরিয়ে দিলো। টাকাটা যখন ভাঙিয়ে দেশী মুদ্রায় রূপান্তরিত করলাম তখনই বুঝতে পারলাম তারা আমাকে সাড়ে সাতশ রুপি দিয়েছে। আগামী মাসের ভাড়া দিয়েও বেশ কিছু টাকা থেকে যাবে!

এক সপ্তাহ পরে আমি আমার নিজের ভাড়া করা ঘরে উঠে গেলাম। কিন্তু এই সাত দিনে শংকর সম্পর্কে জেনে গেলাম অনেক কিছু। আবিষ্কার করলাম তার বলা কথাগুলো আদতে একেবারে অর্থহীন কিছু না। যদিও শুনতে তেমনই লাগে। আরো জানতে পারলাম শংকরের প্রিয় খাবার হলো চাপাতি আর আলুভাজি। খেলনার প্রতি তার কোনো আগ্রহ নেই। স্মৃতি থেকে সে যেকোনো মানুষের ছবি নিখুঁতভাবে দক্ষ শিল্পীর মতো এঁকে দিতে পারে। আমার মতো সেও তার মাকে স্বপ্নে দেখে। দু'রাতে আমি তাকে ঘুমের মধ্যে চিৎকার ক'রে বলতে শুনেছি, "মা, মা।" আমি আরো জানতে পালাম তার ভেতরের সত্তাটি খুব ভালো মতোই কথা বলতে সক্ষম। তার সাথে বাস করার ফলে আমার মধ্যেও মানসিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলো। কারণ আমার স্বপ্নের সাদা শাড়ি পরিহিত মহিলা বাচ্চা কোলে নিয়ে স্বপ্নে বলতে লাগলো, "জি-অ্যা-উ-ই!" বাচ্চাটা এ কথা শুনে মাহিলার হাত থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়লো। আমি ঘুম থেকে উঠে চেক ক'রে দেখলাম আমার জিভটা ঠিক আছে কিনা।

পরবর্তী এক বছরে আমি আগ্রায় থাকাকালীন তাজমহলের উপর অনেক তথ্য জানতে পারলাম। জানতে পারলাম সম্রাজ্ঞী মুমতাজ মহল সম্পর্কেও। যেমন, যে চৌদ্দতম সন্তানটি জন্ম দিতে গিয়ে তিনি মারা যান সেই ছেলের নাম ছিলো গহর। তাজমহলের নির্মাণকালীন সময়ে বিস্তারিত তথ্যও আমার ভাণ্ডারে জমা হলো। রাজকোষ থেকে ৪৬৬.৫৫ কিলোগ্রাম স্বর্ণ বরাদ্দ দেয়া হয় তাজমহলের নির্মাণ খরচ বহন করার জন্যে। আর নির্মাণ শেষে মোট খরচ গিয়ে দাঁড়ায় ৪১৮৮২৬ রুপি, ৭ আনা, ৬ পয়সা। তাজমহলের স্রষ্টা নিয়ে যে বিতর্ক আছে সেটাও আমি জেনে গেলাম। ইতালিয় স্বর্ণকার জেরেনিমো ভেরেলিও দাবি করেছিলেন তিনিই এর নক্সাকার। দ্বিতীয় তাজমহল এবং তাজের নিচে রহস্যময় কক্ষের কথাও আমার জানা হয়ে গেলো। আমি যে অনর্গল ইংরেজিতে কথা বলতে পারি সেটার জন্যে বাড়তি সুবিধা পেলাম শুরু থেকেই। বিদেশী পর্যটকেরা আমার কাছে ভীড় জমাতে শুরু করলো, দ্রুত রাজু গাইডের নাম ছড়িয়ে পড়লো তাজমহলের চৌহদ্দির মধ্যে। তবে এর মানে এই নয় যে, আমি তাজমহলের উপর একজন বড়সড় বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছিলাম।

আমার কেবল তথ্য ছিলো, কোনো জ্ঞান ছিলো না। রাজু গাইড একটা তোতা পাখির চেয়ে বেশি কিছু না, যে কেবল মুখস্ত করা কতোগুলো শব্দ আওড়ায়, সেইসব শব্দের যথাযথ অর্থ না বুঝেই।

আস্তে আস্তে আমি শিখে গেলাম জাপনি পর্যটকদেরকে 'কোনিচাওয়া', রাশিয়ানদের 'ডাসভেডানিয়া', হিসপানিকদের 'মুচাস গ্রাসিয়াস' আর আমেরিকানদেরকে 'হাউডি' বলা। কিন্তু আমার আক্ষেপ গাইড হিসেবে কখনই কোনো অস্ট্রেলিয়ানকে পাই নি। তাহলে হয়তো বলতাম, 'গুডে মেইটে।'

বেশ ভালোই আয় করতাম আমি। মাঝে মাঝে ম্যাকডোনাল্ড আর পিজ্জা হাটে খেতাম। তারপরও বিপদের সময় দরকার পড়বে সেজন্যে কিছু টাকাও জমাতাম। তবে কখন একটা পুলিশের জিপ এসে আমাকে ট্রেনের ডাকাত হত্যা, শান্তারামকে ধাক্কা দেয়া কিংবা নিলীমা কুমারির আত্মহত্যার জন্যে ধরে নিয়ে যাবে সে ভয়ে অস্থির থাকতাম, আর সেজন্যেই দীর্ঘ মেয়াদী কোনো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করতাম না। আমি আমার জীবনের মতোই টাকা পয়সাকে দেখতাম—শুধুই খরচ করার জিনিস। কামাও আর খরচ করো। ফলে এতে অবাক করার কিছু নেই যে, খুব দ্রুতই আমি দিলখোলা একজন হয়ে উঠলাম।

আমাদের ভাড়াটিয়াদের মধ্যে বিভিন্ন পেশার লোক ছিলো : গ্রাম থেকে আসা দরিদ্র কলেজ ছাত্র, সরকারী কেরাণী, যে কিনা নিজের সরকারী বাড়িটি অবৈধভাবে ভাড়া দিয়ে আমাদের সাথে থাকছে বাড়তি আয়ের আশায়। ট্রেন চালক, লন্ড্রির কর্মচারী, মালি, বাবুর্চি, কাঠমিস্ত্রী, এমনকি একজন কবিও। তাও আবার যথারীতি দাড়িওয়ালা। তাদের অনেকেই আমার বন্ধু হয়ে গেলো। তাদের মধ্যে থেকে আমি এটা বুঝতে পারলাম আগ্রায় কেবল মুমতাজ আর শাহ্জাহানের গল্পই একমাত্র গল্প নয়। আরো অনেক গল্প রয়েছে।

লাজওয়ান্তি ছিলো আমাদের অফিসিয়াল খবর সরবরাহকারী। আশেপাশে কি হচ্ছে সবই তার জানা, এমনকি নিজের মালেকীন স্বপ্না দেবির বর্ণিল অতীত সম্পর্কেও তার বেশ জ্ঞান রয়েছে। তার কাছ থেকেই শোনা, স্বপ্না দেবির সাথে নাকি তার দেবরের অবৈধ প্রণয় ছিলো। কিন্তু পরবর্তীতে সেই সম্পর্ক ভেঙে গেলে স্বপ্না দেবি তাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে। গুজব আছে দেবরের সাথে সম্পর্কের ফসল হিসেবে নাকি বেনারসে তার একটি কন্যা সন্তানেরও জন্ম হয়। মেয়েটির কী হয়েছিলো সেটা অবশ্য কেউ জানে না। জানার আগ্রহও দেখায় না।

আমাদের সাথে থাকা দরিদ্র এক ছাত্র শাকিল একদিন রাতে আমার কাছে এলো।

"রাজু ভাই, যদি কিছু মনে না করো আমি কি তোমাকে একটা কথা বলতে পারি?" কাচুমাচু হয়ে বললো সে।

"হ্যা, শাকিল, বলো?" সে কী বলবে সেটা আঁচ করতে পেরেই বললাম আমি।

"আমার বাবা এ মাসে মানিঅর্ডার করতে পারে নি, কারণ গ্রামে খরা চলছে। সোমবারের মধ্যে আমি যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফি দিতে না পরি তবে তারা আমার নাম কেটে দেবে। তুমি কি আমাকে দেড়শ রুপি ধার দিতে পারবে? পরের মাসে মানিঅর্ডার এলেই তোমার টাকাটা দিয়ে দেবো।"

"অবশ্যই শাকিল। আমি তো এরই মধ্যে আমাদের বিখ্যাত কবি নাজমীকে পঞ্চাশ রুপি ধার দিয়েছি, একশ দিলাম গোপালকে। আর নতুন একটা শার্ট কেনার জন্যে একশ রুপি তো এখনও আমার কাছে আছে। তবে তোমার প্রয়োজনটা আমার চেয়েও অনেক বড়। সুতরাং টাকাটা তুমি পাচ্ছো।"

শংকর আর আমি লাজওয়ান্তির ঘরে এসেছি ডিনারের দাওয়াতে। সে অবিবাহিত, একাই থাকে তবে তার ছোটো বোন থাকে আগ্রা থেকে ত্রিশ কিলোমিটার দূরের এক গ্রামে। প্রথমেই খেয়াল করলাম লাজওয়ান্তির ঘরটা অসম্ভব পরিস্কার আর গোছানো, আমার জীবনে আমি এতো পরিস্কার ঘর দেখি নি। এক বিন্দু ময়লাও কোথাও নেই। ঝকঝকে তক তকে। এমনকি তার রান্নাঘরটাও পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন, আমার তো মনে হলো তার রান্নাঘরের চুলাটাও বোধহয় কালো না হয়ে সাদাই হবে। আমি আর শংকর চেয়ারে বসলাম, লাওয়ান্তি বসলো বিছানায়। সে পরে আছে গোলাপি রঙের শাড়ি। তার বোন লক্ষ্মীর জন্যে বর খোঁজার ব্যাপারে সে খুব উত্তেজিত হয়ে আছে। তার বোনের বয়স উনিশ।

"কিন্তু তোমার কি হবে?" আমি তাকে বললাম। "বড় বোনদেরই তো আগে বিয়ে করার কথা?"

"হ্যা, তা ঠিক। কিন্তু আমি তো লক্ষ্মীর কেবল বড় বোনই না, আমি তার বাবা-মাও। পাঁচ বছর আগে আমাদের বাবা-মা মারা যাবার পর থেকে আমিই তো তার অভিভাবক। একবার তার বিয়ে দিতে পারলে আমার দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে তখন আমি আমার রাজপুত্তুর খুঁজে নিতে পারবো।"

"তাহলে তুমি যোগ্যপাত্র কিভাবে খুঁজবে?"

"আমি দৈনিক *উজালায়* একটা বিজ্ঞাপনে দিয়েছিলাম দু'মাস আগে। মা দূর্গার আশীর্বাদে বেশ ভালো সাড়া পাওয়া গেছে।" একগাদা চিঠির বান্ডিল থেকে সে ছয়টা ছবি বের করলো। "এখন আমাকে বলো, লক্ষ্মীর সঙ্গে কোন্ ছেলেটা পাত্র হিসেবে বেশি মানাবে?"

আমি আর শংকর পাত্র বাছাইয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। প্রায় সবারই খুঁত ধরতে লাগলাম আমরা। একজন খুব বেশি বয়স্ক তো অন্যজনের হাসি খারাপ; এর চেহারা দেখতে কদাকার। ওর চেহারায় কাটা দাগ আছে। আরে, একে দেখে তো দাগী অসামীর মতো মনে হচ্ছে। কেবল একটা ছবিই আমাদের মনঃপুত হলো। সুন্দর মুখশ্রীর এক তরুণের ছবি। "হ্যা, এই ছেলেটাই সেরা," আমি লাজওয়ান্তিকে বললাম।

শংকরও তার ভাষায় সম্মতি জানিয়ে বললো, "জি-উ-অ্যা-ই!"

আমাদের পছন্দ দেখে লাজওয়ান্তিও খুশি।

"সেও আমার পছন্দের। ও শুধু দেখতেই না, বেশ যোগ্য পাত্রও বটে, তার পরিবারও খুব সম্ভ্রান্ত। তুমি জানো, সে একটা সরকারী পদে কাজ করছে?"

"তাই নাকি? সে কি করে?"

"সে এই জেলার সুগারকেইন অফিসার। তার সাথে লক্ষ্মী রাণীর মতো জীবন কাটাবে। তাহলে কি তার পরিবারের সাথে আমি কথাবার্তা বলবো? দূর্গার আশীর্বাদে কি শুভকাজ শুরু করবো?"

"অবশ্যই। আর দেরি কেন।"

সেই রাতে লাজওয়ান্তি আমাদের অনেক মুখরোচক খাবার খাওয়ালো। আমি তাকে জিজ্ঞেস না ক'রে পারলাম না। "লাজওয়ান্তি, তোমার ঘর এতো পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকে কি ক'রে? তোমার কি কাজের লোক আছে?"

"ঠাট্টা কোরো না। কাজের লোক হয়ে আমি কিভাবে কাজের লোক রাখবো? আরে আমিই তো রাণী সাহেবার পুরো বাড়ি ঝকঝকে তকতকে রাখি। ছোটোবেলা থেকেই এটা আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। বাড়িঘরে ময়লা থাকলে আমি স্বস্তিতে থাকতে পারি না। কেমন জানি অস্থির অস্থির লাগে। আমার মা বলতেন, 'লাজওয়ান্তি গাছ থেকে পাতা ঝরে পড়াটাও সহ্য করতে পারে না।' এজন্যেই তো রাণী সাহেবা আমার উপর খুব খুশি। আমি শুনেছি তিনি অন্য কাউকে বলছেন, আমি তার সেরা কাজের লোক। আমার মতো কাজের লোক নাকি তিনি জীবনেও পাবেন না।" তার চোখে মুখে গর্ব দেখতে পেলাম আমি।

"হ্যা, আমিও তাতে একমত। তুমি সম্ভবত এ দুনিয়ার সবচাইতে সেরা কাজের লোক। কিন্তু আমার ঘরে কখনও ঢুঁ মেরো না। যদি মারো তো অসুস্থ হয়ে পড়বে।"

শংকরও আমার কথার সাথে একমত হলো। "জি-অ্যা-উ-হি-হি!" দাঁত বের ক'রে হেসে বললো সে।

আজকে আমার শেষ ক্লায়েন্ট হলো দিল্লি থেকে আগত চারজন ধনী কলেজ ছাত্র। তারা বয়সে তরুণ, জিন্স আর সানগ্লাস পরে আছে। তাজমহল সম্পর্কে তারা হালকা ধরণের কিছু মন্তব্য করলো। অশ্লীল সব জোক বলে হেসে গড়াগড়ি খেলো কিছুক্ষণ পরপরই। কাজ শেষে তারা কেবল আমাকে ফি'র টাকাই দিলো না, সেই সাথে দিলো মোটা অঙ্কের বখশিস। এরপর আমাকে তারা তাদের সাথে মিনিভ্যানে ক'রে সারা রাত ঘোরার আমন্ত্রণও জানালো। ঐ মিনিভ্যানটা তাদের নিজেদের, ড্রাইভারও আছে সঙ্গে। "রাজু গাইড, আমাদের সাথে আসো, জীবনের সেরা রাত উপভোগ করবে তুমি।" আমাকে তারা বললো। বলা ভালো টোপ দিলো। প্রথমে রাজি না হলেও তাদের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত যেতে রাজি হলাম।

প্রথমে আমরা গেলাম প্যালেস হোটেলে। এটাই আমার প্রথম কোনো ফাইভস্টার হোটেলে যাওয়া। জমকালো এক হোটেল। আমাকে এক ছেলে মেনু দিয়ে বললো, "তোমার যা খুশি অর্ডার দাও, রাজু।" মেনুতে চোখ বুলিয়ে আমার তো দম বন্ধ হবার অবস্থা। এক প্লেট বাটার চিকেনের দাম কিনা ছয়শ' রুপি? আরে আমাদের বাড়ির সামনে রাস্তার পাশে এরকম জিনিস পঞ্চাশ রুপিতেই পাওয়া যায়। তবে এও বুঝতে পারলাম এখানে এরা কেবল খাবারই বিক্রি করে না, সেই সাথে বিক্রি করে আভিজাত্য। ছেলেগুলো মেনুর প্রায় সব খাবারই অর্ডার দিলো। শেষে দু'বোতল স্কচ হুইস্কি।

আমি চারপাশে তাকিয়ে অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম। মুম্বাইতে আমি আর সেলিম বড় লোকের বিয়ের দাওয়াত খেয়েছি, কিন্তু তাদের সম্পদ কতো সেটা কখনও বুঝতে পারি নি। কিন্তু এইসব ধনী কলেজ ছাত্রদেরকে কাগজের মতো টাকা খরচ করতে দেখে আমার মধ্যে অন্যরকম একটা ধারণা তৈরি হলো। আমি যে কতো নগন্য সেটা যেনো স্পষ্টত চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। আমার খামতিগুলো সুঁইয়ের মতো খোঁচাতে লাগলো আমাকে। আমার ক্ষিদে একেবারে উধাও হয়ে গেলো। সামনে পড়ে রইলো মজার মজার সব খাবার। বুঝতে পারলাম আমি বদলে গেছি। আমি ভাবলাম সমস্ত আকাঙ্খা মেটানোর

পর আর কোনো আকাঙ্খা অবশিষ্ট না থাকলে কেমন লাগে? আকাঙ্খা ছাড়া কোনো অস্তিত্ব কি কাম্য? আমি এসব প্রশ্ন করলেও কোনো সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারলাম না।

খাওয়াদাওয়া শেষে ছেলেরা আমাকে তাদের মিনিভ্যানে আবারো উঠতে বললো আমাকে।

"এবার কোথায় যাবো?" আমি জানতে চাইলাম।

"গেলেই দেখতে পাবে," কথাটা বলেই হেসে ফেললো তাদের একজন।

মিনিভ্যানটা অলিগলি পেরিয়ে আগ্রার উপকণ্ঠে বাসাই মহল্লা নামক একটি আজব এলাকায় এসে পড়লো। একটা বিলবোর্ডে লেখা আছে 'রেড লাইট এলাকায় নিজ দায়িত্বে প্রবেশ করুন। মনে রাখবেন, কনডম ব্যবহার করলে এইডস থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে দীর্ঘ জীবন লাভ করতে পারবেন।' রেডলাইট কথাটার অর্থ আমি বুঝতে পারলাম না। যতো দূর চোখ গেলো কোনো লালবাতি তো চোখে পড়ছে না। কয়েকটি ট্রাক পার্ক করা আছে। খালি গায়ের কিছু বাচ্চা ছেলেও ঘুরছে আশেপাশে। তাদের মায়েদের কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। হালকা সঙ্গীতের মূছর্না শোনা যাচ্ছে।

কলেজ ছাত্ররা তাদের গাড়ি থেকে নেমে একগুচ্ছ দালানের দিকে এগিয়ে গেলো। তাদের সাথে এগিয়ে গেলাম আমিও। এবার প্রচুর লোক সমাগম দেখতে পেলাম। মহিলারা উৎকট মেকআপ আর শাড়ি গয়না পরে আছে। কেউ কেউ 'আসো-আমার কাছে' ধরণের চাহ্নি দিচ্ছে। চোখেমুখে আমন্ত্রণের ভাষা। এবার বুঝতে পারলাম রেডলাইট মানে কি। এখানে পতিতারা কাজ করে। আমি এসব জায়গার নাম শুনলেও এর আগে কখনও আসি নি। আগ্রাতে এরকম জায়গা আছে সেটাও জানাতাম না। আজকের রাতটা আসলেই আমার জীবনের একটা নতুন অভিজ্ঞতা।

ছেলেরা আমাকে নিয়ে দোতলার একটা বাড়িতে ঢুকলো। একটা ফয়ার পেরিয়ে সংকীর্ণ করিডোর দিয়ে ছোটো ছোটো কয়েকটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম আমরা।

কুটিল চাহ্নির অল্পবয়সী এক লোক এলো। "স্বাগতম বন্ধুরা, আপনারা একেবারে সঠিক জায়গাতে এসেছেন। আমাদের কাছে আগ্রার সবচাইতে সেরা আর অল্পবয়সী মেয়ে আছে," বললো সে।

ছেলেরা তার সাথে দরদাম ঠিক ক'রে কিছু টাকা তার হাতে ধরিয়ে দিলো। "রাজু, আমরা তোমার জন্যেও টাকা দিয়েছি। এবার এনজয় করো," তারা বললো। তারপর একে একে ছোটো ঘরগুলোতে ঢুকে পড়লো তারা।

আমি করিডোরে দাঁড়িয়ে থাকলাম। এক বয়স্ক মহিলা পান চিবোতে

চিবোতে আমার কাছে এসে আমার হাত ধরে একটা ঘরের কাছে নিয়ে গেলো। দরজার সামনে রেখে ইশারা ক'রে চলে গেলো সেই মহিলা।

আমি ঘরে ঢুকবো নাকি মিনিভ্যানে ফিরে যাবো বুঝতে পারলাম না। একটু কৌতুহল হচ্ছে ভেতরে ঢুকে দেখার জন্যে। হিন্দি ছবিতে পতিতা নায়িকারা খুব ভালো হয়। তাদেরকে সব সময়ই জোর ক'রে এ কাজে বাধ্য করা হয়। শেষের দিকে ছবিতে প্রায়ই তারা বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে। আমি ভাবতে লাগলাম আমার জন্যে সেরকম কোনো নায়িকা অপেক্ষা করছে কিনা। আমি কি সেই নায়ক যে মেয়েটিকে রক্ষা করবে? আমি তার শেষ পরিণতি আত্মহত্যা করা থেকে তাকে বিরত রাখতে পারবো কিনা।

দরজা ঠেলে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লাম। ছোট্ট একটা ঘর। মাঝখানে একটা খাট। তবে সেটার চারপাশে কি আছে আমি মোটেও লক্ষ্য করলাম না। গোলাপী রঙের শাড়ি পরা বিছানায় বসা এক মেয়ের দিকে আমার চোখ আঁটকে গেলো। দেখতে কালো হলেও মেয়েটি খুব সুন্দর। কাজল দেয়া চোখ। ঠোঁটে কড়া লিপটিক। কালো চুলে ফুল গোঁজা। হাতে-পায়ে-গলায় অলংকার পরে আছে সে।

"হ্যালো," মেয়েটি বললো, "আসো, আমার সাথে বিছানায় বসো।" তার কথাগুলো যেনো সুমধুর সঙ্গীত।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি তার দিকে এগিয়ে গেলাম। আমার হতভম্ব ভাব দেখে হেসে ফেললো সে। "ভয় পেয়ো না, আমি তোমাকে কামড় দেবো না।"

তারপাশে গিয়ে বসলাম আমি।

"তুমি নতুন," মেয়েটি বললো, "তোমার নাম কি?"

"রাম মোহাম্মদ টম—না, না, রাজু শর্মা।" থতমত খেয়ে বললাম।

"মনে হচ্ছে তুমি তোমার নামটাও ভুলে গেছিলে।"

"না, তা নয়। তোমার নাম কি?"

"নিতা।"

"নিতা কি?"

"মানে জানতে চাইছো?"

"তোমার পুরো নামটা জানতে চাইছি। তোমার কি পদবী নেই?"

মেয়েটা তাচ্ছিল্যভরে হেসে ফেললো। "তুমি একটা বেশ্যাপাড়ায় এসেছো, সাহেব। কোনো ম্যারেজ বুরোতে নয়। পতিতাদের কোনো পদবী থাকে না। যেমন থাকে না বাড়ির পোষা কুকুর-বিড়ালের।" কোনো রকম রাগ বা ক্ষোভ থেকে নয়, কথাগুলো সে স্বাভাবিক কণ্ঠেই বললো।

"ওহ্ তাহলে তুমি একজন বেশ্যা?"

আবারো হেসে ফেললো মেয়েটি। "তুমি তো খুব অদ্ভুত। আরে বাবা, তুমি যখন বাসাই মহল্লাতে এসেছো তখন তো আর মা বোনদের সাথে দেখা করতে আসো নি। তুমি এসেছো পতিতাদের কাছে।"

"তোমার বয়স কতো?"

"এটা হলো আসল প্রশ্ন। আমার বষয় সতেরো। আমাকে আবার বোলো না এরচেয়েও কমবয়সী মেয়ের দরকার তোমার। দেখে তো মনে হয় না তোমার বয়স ষোলোর বেশি হবে।"

"আমার বয়সও সতেরো। কতোদিন ধরে এখানে কাজ করছো তুমি?"

"তাতে কি এসে যায়? তুমি তো জানতে চাইছো আমি কুমারি কিনা। না, আমি কুমারি নই। আমার মতো একজন কুমারি মেয়েকে পেতে চাইলে তোমাকে চারগুন টাকা দিতে হবে। তবে আমাকে ক'রে দ্যাখো, একজন কুমারির চেয়েও আমাকে ক'রে বেশি আনন্দ পারে। তুমি অখুশী হবে না।"

"তুমি মরণঘাতি রোগ এইডসের ভয় পাও না?"

মেয়েটা আবারো হেসে ফেললো। এবার তার হাসির মধ্যে করুণ রস আছে। "এটা আমার পেশা। শখ ক'রে আমি এখানে আসি নি। এতে আমার পুরো পরিবারের অন্ন সংস্থান হয়। আমি যদি এ কাজ না করতাম, আমার পুরো পরিবার না খেয়ে মারা যেতো। আমরা এইডস সম্পর্কে জানি। কিন্তু ভবিষ্যতে এইডসের ফলে মারা যাবার চেয়ে আজকের ক্ষুধাটাই আমাদের কাছে বেশি জরুরি। এখন বলো, তুমি শুধু প্রশ্নই করবে নাকি কাম-টাম কিছু করবে? পরে তোমার সময় শেষ হয়ে গেলে আমাকে দোষ দিতে পারবে না। শ্যাম আবার পরের কাস্টমারকে পাঠিয়ে দেবে। আমার কিন্তু খুব ডিমান্ড আছে।"

"শ্যাম কে?"

"আমার দালাল। তুমি তো তাকেই টাকা দিয়েছো। এবার আসো তো, আমি আমার শাড়ি খুলে ফেলছি।"

"না। দাঁড়াও। আমি তোমাকে আরো কিছু প্রশ্ন করতে চাই।"

"আরে তুমি কি করতে এসেছো নাকি কথা বলতে এসেছো? তুমি তো দেখছি সেই ফিরিঙ্গি রিপোর্টারের মতো, ক্যামেরা আর টেপ রেকর্ডার নিয়ে এসে বলে একটা রিসার্চ করতে এসেছে। আমার সাথে কোনো কাম-টাম করবে না। কিন্তু যেই না আমি ব্লাউজ খুললাম সব ধরণের রিসার্চের কথা ভুলে গেলো সে। তার টেপরেকর্ডে শুধু একটা শব্দই রেকর্ড হলো—সেটা তার নিজের শিৎকার আর গোঙানির। দেখি, তুমিও তার মতো কিনা।" এক ঝটকায় সে তার ব্লাউজটা খুলে ফেললো। কোনো ব্রা পরে নি। দুটো স্তন বের হয়ে এলো, যেনো বাদামী রঙের তাজমহলের দুটো গম্বুজ। নিঁখুত গোল। আর

স্তনবৃন্ত দুটো তীরের মতো খাড়া হয়ে আছে। আমার মুখ শুকিয়ে এলো। বুক ধরফর ক'রে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে। আমার বুকে হাত রেখে ব্যাপারটা বুঝতে পারলো সে। "তোমরা পুরুষেরা সব একরকম। মেয়েদের দুধের বোটা দেখলে সমস্ত নীতি উধাও হয়ে যায়। একেবারে জানালা দিয়ে পালায় তারা। আসো।" আমাকে টেনে কাছে নিলে অসাধারণ এক অনুভূতিতে আক্রান্ত হলাম। সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেলো। কাঁপতে শুরু করলাম আমি।

কাজশেষে আমরা বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে আছি। আমি চেয়ে আছি ছাদের সিলিং ফ্যানটার দিকে।

"তুমি আমাকে বলো নি কেন এটা তোমার প্রথম?" মেয়েটা বললো। "তাহলে আমি আরো আস্তেধীরে করতাম। এখন চলে যাও। তোমার সময় শেষ হয়ে গেছে।" বিছানা থেকে উঠে সে শাড়ি পরতে শুরু করলো। তার এই ব্যবহার হতাশ করলো আমাকে। পাঁচ মিনিট আগেও আমি ছিলাম তার প্রেমিক। আর এখন কিনা আমি নিতান্তই একজন কাস্টমার। যার আবার সময় ফুরিয়ে গেছে।

আমিও বিছানা থেকে উঠে কাপড়চোপড় পরতে শুরু করলাম।

"আমার বখশিস দেবে না?" ব্লাউজ পরতে পরতে বললো সে।

মানিব্যাগ থেকে পঞ্চাশ রুপির একটা নোট বের ক'রে তার হাতে দিলাম। টাকাটা ব্লাউজের ভেতর রেখে দিলো সে।

"তুমি কি এনজয় করেছো? আবার আসবে কি?" মেয়েটি জানতে চাইলো।

কোনো জবাব না দিয়ে আমি তড়িঘড়ি বের হয়ে এলাম।

পরে, মিনিভ্যানে ক'রে শহরে ফিরে আসার সময় তার প্রশ্নটা নিয়ে ভাবলাম। আমি কি এনজয় করেছি? হ্যা, করেছি। আবারো যাবো তার কাছে? হ্যা। যাবো। অদ্ভুত এক শিহরণ আমার মধ্যে বইছে। লোভি ক'রে তুলছে আমাকে। এটাই কি ভালোবাসা? নিজেকে সুধালাম আমি। কিন্তু এর জবাব আমার জানা নেই। তবে আমি এটা জানি—আমি রেডলাইট এলাকায় নিজ দায়িত্বে গিয়েছি। এক পতিতার সাথে প্রথম বারের মতো সঙ্গম করেছি। এখন আমি একজন পতিত ব্যক্তি।

শহরে জলাতঙ্ক রোগের ভীতি ছড়িয়ে পড়েছে। সংক্রমিত কুকুরের কামড়ে অনেক বাচ্চাই মারা যাচ্ছে। স্বাস্থ্য বিভাগ সবাইকে সতর্ক থাকতে পরামর্শ দিয়েছে, নিতে বলেছে বাড়তি সতকর্তা। শংকরকে আমি সাবধান ক'রে

দিলাম। "বাইরে গেলে সাবধানে থাকবে। কোনো কুকুরের ধারে কাছেও যাবে না। বুঝেছো?"

শংকর মাথা নেড়ে সায় দিলো।

এবার বিহারি মুচির পালা। এখন পর্যন্ত সে আমার কাছ থেকে কোনো টাকা পয়সা ধার নেয় নি। "রাজু, আমার বাচ্চাটা খুবই অসুস্থ, হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ডাক্তার বলেছে এক্ষুণি ওষুধ লাগবে। কিন্তু তার জন্যে অনেক টাকার দরকার। এপর্যন্ত আমি চারশ' টাকা জোগার করেছি। তুমি কি আমাকে কিছু টাকা ধার দিতে পারো? আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি।"

বিহারিকে আমি দুশ' রুপি দিয়ে দিলাম। জানতাম টাকাগুলো আর কখনও ফেরত পাবো না। তারপরও সে ওষুধ কিনতে সক্ষম হলো না। দু'দিন পর তার ছয় বছরের বাচ্চাটা এক ক্লিনিকে মারা গেলো।

সেই রাতে বিহারি তার মৃত সন্তানকে সাদা কাপড়ে মুড়িয়ে আমাদের ভাড়া করা ঘরে এলো। মদ খেয়ে মাতাল হয়ে আছে সে। মৃতদেহটা পাথর বিছানো আঙিনায় পানির কলের সামনে রেখে দিলো। আমাদের সবাইকে ডেকে এক মনে নিজের সমস্ত ক্ষোভ ঝড়তে শুরু করলো সে। ধনীদের গালাগালি করলো, যারা কিনা দামি দামি বাড়িতে থাকে, গরীব মানুষকে মোটেও পরোয়া করে না। নাদুস নুদুস ডাক্তারদের মা-বাপ তুলে গালি দিলো, যারা কিনা রোগির কাছ থেকে টাকা খসাতেই বেশি মনোযোগী, সরকারের বিরুদ্ধেও সে নালিশ জানালো। কেবল কাগজে কলমে আর বক্তৃতায় জনগণের কথা বলে। আদতে কিছুই করে না। আমরা সবাই নীরব দর্শক হয়ে দেখছি বলেও ক্ষোভে ঝাড়লো। নিজের সন্তানেরা কেন এই পিশাচ দুনিয়াতে জন্মালো সেটাও তার ক্ষোভের বিষয়। সে নিজে বেঁচে আছে এটাও তার রাগের কারণ। শেষে ঈশ্বরকে গালাগালি করলো অন্যায় আর অবিচারের এক দুনিয়া সৃষ্টি করার জন্যে। তাজমহল, শাহ্জাহান, ইলেক্ট্রিক বাল্ব এমনকি পানির কলের উপরেও সে মহাক্ষ্যাপা। "শালার বানচোত কল। যখন তোকে দরকার হয় এক ফোঁটা পানিও দিস্ না। কিন্তু আমার ছেলেটা যখন তোর কাছে এলো পানি দিয়ে তাকে ভাসিয়ে দিলি। তখন তোর আর পানি সংকট থাকলো না। আমার ছেলেটা ভিজে ভিজেই তো নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত হলো। তোকে খুব জলদি আমি উপড়ে ফেলুম, পাঠিয়ে দিমু জাহান্নামে।" সজোরে কলে একটা লাথি মেরে বিড় বিড় করতে করতে অজ্ঞান হয়ে গেলো সে।

এক সপ্তাহ পর আমি আবারো নিতার কাছে গেলাম। এবার আমাকে আমার পকেট থেকেই টাকা দিতে হলো। তিনশ রুপি নগদ। তার বিছানায় তার সাথে সঙ্গম ক'রে শুয়ে শুয়ে তার নোংরা কাথাবার্তা শুনছি।

"তাহলে পতিতা হতে তোমার ভালোই লাগে?" আমি তাকে বললাম।

"কেন? এতে সমস্যা কি? এটা তো আমার পেশা। আর সবার মতোই।"

"কিন্তু তুমি কি এটা পছন্দ করো?"

"হ্যা, অচেনা মানুষের সাথে সেক্স করতে আমার ভালো লাগে। যেমন, তোমার সাথে করছি। এতে আমি বেশ ভালো টাকা কামাই। আমার পরিবারের ভরণপোষণ করতে পারি। প্রতি শুক্রবার আমি নতুন নতুন সিনেমাও দেখতে পারি। এর চেয়ে বেশি আর কি চাইতে পারে একজন মেয়েমানুষ?"

আমি তার চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম সে মিথ্যে বলছে। সে একজন অভিনেত্রী যে কিনা একটা ভূমিকায় অভিনয় করছে। কেবল নিলীমা কুমারির মতো সে অভিনয় ক'রে কোনো পুরস্কার পায় না।

নিতাকে যতোই রহস্যময়ী মনে হতে লাগলো, তার সম্পর্কে জানার জন্যে ততোই আমি মরিয়া হয়ে উঠতে লাগলাম। আমার মধ্যে এক ধরণের ক্ষিদে তৈরি করলো সে। আমি হয়তো তার দেহে প্রবেশ করেছি, কিন্তু এবার আমি তার হৃদয়ের গভীরেও প্রবেশ করতে চাইলাম। তাই প্রতি সোমবার তাজমহল যখন বন্ধ থাকে আমি তার কাছে চলে যেতে শুরু করলাম। অবশেষে তার ভেতরে প্রবেশ করতে সক্ষম হলাম আমি।

সে আমাকে জানালো মধ্যপ্রদেশের ভিন্দ জেলার বেদিয়া গোষ্ঠীর মেয়ে সে। তার বাবা-মা দু'জনেই বেঁচে আছেন। তার এক বোন আর ভাই বিয়েশাদি ক'রে সুখেই আছে। তাদের গোষ্ঠীতে প্রতি পরিবারের একজন মেয়েকে ঐতিহ্য অনুযায়ী পতিতা হতে হয়। তাদেরকে বলে *বেদনি*। এই মেয়ে পুরো পরিবারের জন্যে উপার্জন করে। আর তাদের গোষ্ঠীর পুরুষেরা মদ খেয়ে কার্ড খেলে সময় কাটায়। "এজন্যেই আমাদের সম্প্রদায়ে কন্যা শিশু জন্মালে উৎসব করা হয়। বরং ছেলে জন্মালে তারা অসুখি থাকে। কারণ ছেলে সন্তান বোঝা ছাড়া আর কিছু না। এই বেশ্যা পাড়াতেও তুমি আমাদের গ্রামের অনেক *বেদনি*কে খুঁজে পাবে। তারা সবাই নিজেদের শরীর বিক্রি করছে প্রতিদিন।"

"কিন্তু তোমার মা তোমাকে বেছে নিলো কেন? তোমার বোনকেও তো বেছে নিতে পারতো।"

নিতা একটা দুঃখের হাসি হাসলো। "কারণ আমার রূপই আমার শত্রু। কোন্ মেয়েকে বিয়ে দেবে আর কোন্ মেয়েকে পতিতা বানানো হবে সেই সিদ্ধান্ত আমার মায়ের। আমাকেই *বেদনি* হিসেবে তিনি বেছে নেন। হয়তো

আমি আমার বোনের মতো অতো সুন্দরী না হলে আমাকে তারা এখানে বিক্রি ক'রে দিতো না। আমি হয়তো স্কুলে যেতাম, বিয়েশাদি ক'রে বাচ্চা-কাচ্চার মা হতাম। কিন্তু আমি এলাম এই বেশ্যাপাড়ায়। সুন্দরী হবার মূল্য চুকাতে হচ্ছে আমাকে। সুতরাং আমাকে সুন্দরী বোলো না।"

"কতোদিন ধরে তুমি এখানে কাজ করছো?"

"কৈশোরের পর থেকেই। নাকের নোলক খুলে ফেলার *নাথনি উথারনা* অনুষ্ঠান আর মাথায় ঘোমটা দেবার সূচনামূলক অনুষ্ঠান *সার ঢাকওয়ানা* হবার পর থেকেই কাউকে মেয়ে হিসেবে গণ্য করা হবে। তো, বারো বছর বয়সেই আমার কুমারিত্বকে নিলামে তোলা হলো। সর্বোচ্চ দাম যে হাঁকলো তার হয়ে গেলাম আমি। তারপর আমাকে এই বেশ্যাপাড়ায় বেঁচে দেয়া হয়।"

"কিন্তু এটা তো ঠিক, চাইলে তুমি যে কোনো সময় এ পেশা ছেড়ে বিয়েশাদি করতে পারো, পারো না?"

"আমাকে কে বিয়ে করবে? আমি তো পতিতা। আমাদের শরীর যতোদিন আছে, আর যতোদিন রোগেশোকে মারা না যাচ্ছি আমাদেরকে এই কাজই করতে হবে।"

"আমি জানি তুমি একদিন তোমার স্বপ্নের রাজপুত্র ঠিকই খুঁজে পাবে," অশ্রুসজল চোখে আমি কথাটা বললাম।

ঐ দিন সে আর আমার কাছ থেকে কোনো বখশিস নিলো না।

পরে নিতার সাথে আমার কাথাবার্তার ঘটনাটা মনে করলে অবাক হয়ে ভাবলাম আমি তাকে মিথ্যে বললাম কেন। আমি তো চাই না সে অন্য কোনো রাজপুত্র খুঁজে নিক। কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমি তার প্রেমে পড়ে গেলাম।

এর আগ পর্যন্ত ভালোবাসার ব্যাপারে আমার সমস্ত ধারণা তৈরি হয়েছে হিন্দি সিনেমা দেখে দেখে। নায়ক-নায়িকার চোখাচোখি হতেই তারা অদ্ভুত এক শিহরণে আক্রান্ত হয়। শুরু হয়ে যায় গান। তারা দু'জনে তখন সুইজারল্যান্ডের কোনো গ্রামে গিয়ে নাচতে থাকে, গাইতে থাকে। আমার মনে হয় ওরকম প্রেম আমার প্রথম হয়েছিলো ট্রেনের সেই নীল সালোয়ার কামিজ পরা মেয়েকে দেখে। তবে সত্যিকারের প্রেম এসেছে আগ্রায়। বুঝতে পারলাম সিনেমার চেয়ে বাস্তব জীবন একেবারেই আলাদা। ভালোবাসা মুহূর্তে ঘটে না। আস্তে আস্তে এটা তোমাকে গ্রাস করে, তারপর তোমাকে একেবারে ওলট পালট ক'রে দেয়। তোমার দু'চোখে রঙ্গীন স্বপ্ন দেখানোর পাশাপাশি তীব্র আর মধুর যন্ত্রণাও বয়ে আনে ভালোবাসা। এ বেদনা মিষ্টি মধুর অত্যাচার। নিতার সাথে দেখা করা আর তার সাথে সময় কাটানোর মধ্যেই আমার জীবন স্থির

হয়ে গেলো। আমার সাথে অদ্ভুত জায়গায় আর অদ্ভুত সময়ে নিতা দেখা করতে শুরু করলো। গাইডের কাজ করার সময়ও আমার চোখের সামনে নিতার মুখটা ভেসে উঠতো। এমনকি টয়লেটে বসেও আমি তার শরীরের সুঘ্রাণ পেতাম। বাজার থেকে আলু পটল আর টমেটো কেনার সময় তার সাথে সঙ্গমের কথা ভাবতে ভাবতে হোচট খেতাম। আমি বুঝে গেলাম সে-ই আমার রাজকন্যা। তাকে বিয়ে করাটাই আমার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে উঠলো। কিন্তু আমার দুশ্চিন্তা ছিলো, সে এতে রাজি হবে কিনা।

চালাঘরের সামনে একটা জিপ এসে থামলে এক ইন্সপেক্টর আর দুই কনস্টেবল জিপ থেকে নেমে এলে ধক্ ক'রে উঠলো আমার বুক। গলা আঁটকে এলো ভয়ে। অবশেষে বুঝি আমি ধরা পড়েই গেলাম। এটাই আমার জীবনের নিয়তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। যখনই আমি আমার সেরা সময়ে উপনীত হই তখনই দুর্ভাগ্য নেমে আসে। সব ওলট পালট ক'রে দেয়।

ইন্সপেক্টর একটা হ্যান্ড মাইক দিয়ে ঘোষণা দিলো। মনে করলাম সে বলবে, "রাম মোহাম্মদ টমাস, ছদ্মনাম রাজু শর্মা, হাত উপরে তুলে বাইরে বেরিয়ে আসবে কি?" কিন্তু না। সে বললো, "ঘর থেকে সব লোকজন বের হয়ে আসুন। আগ্রার এক ব্যাংকে ডাকাতি হয়েছে। আমাদের কাছে তথ্য আছে, ডাকাত এখানেই লুকিয়ে রয়েছে।"

কথাটা শুনে আমি হাপ ছেড়ে বাঁচলাম। এতোটাই খুশি হলাম যে, ইন্সপেক্টরকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করলো।

প্রতিটি ঘর তল্লাশী করতে শুরু করলো কনস্টেবল দু'জন। একে একে তারা তল্লাশী করতে করতে শংকরের ঘরে এসে পড়লো।

"তোমার নাম কি?" শংকরের কাছে ইন্সপেক্টর জানতে চাইলো।

"জি-অ্যা-ই-উহ্," শংকর জবাবে বললো।

"কি? আবার বলো তো?"

"জি-জি-অ্যা!"

"বানচোত। আমার সাথে তামাশা করছিস?" রেগেমেগে ইন্সপেক্টর হাতের লাঠি তুলতে উদ্যত হলো।

সঙ্গে সঙ্গে আমি বাঁধা দিয়ে বললাম, "ইন্সপেক্টর সাহেব, শংকরের মাথায় গোলমাল আছে। সে কথা বলতে পারে না।"

"তাহলে আগে সে কথা বলো নি কেন?" কনস্টেবলদের দিকে ফিরে বললো, "পরের ঘরে যাও। পাগল-ছাগলকে তল্লাশী ক'রে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না।"

তিন ঘণ্টা ধরে আমাদের ত্রিশটি ঘর তল্লাশী শেষে কবি নাজমীর ঘরে ব্যাংকের নোট খুঁজে পেলো পুলিশ। আমরা সবাই হতভম্ব। দাড়িমুখের কবি, যে কিনা দাবি করে বলিউড ছবিতে গান লেখে, সে ব্যাংক ডাকাতি করেছে! তাহলে এতো দিন ছদ্মবেশে ছিলো সে। তো, আমি খুব একটা অবাকও হলাম না। আমিও তো ছদ্মনামে, পরিচয়ে লুকিয়ে আছি এখানে। তারা যদি আমার অতীত জানতে পারে একই রকম হতভম্ব হবে।

লাজওয়ান্তি পাশের দূর্গা মন্দির থেকে লাড্ডু নিয়ে আমার ঘরে এলো। সে খুব উচ্ছ্বসিত।

"আরে লাজওয়ান্তি, এই লাড্ডু কেন?" আমি জানতে চাইলাম।

"আজ আমার জীবনের সবচাইতে সুখের দিন। মা দূর্গার আশীর্বাদে সুগারকেইন অফিসার অবশেষে লক্ষ্মীকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে। এখন আমি ধুমধাম ক'রে বোনের বিয়ে দেবো।"

"কিন্তু যৌতুকের কি হবে? ছেলেপক্ষ কি কোনো দাবি দাওয়া করে নি?"

"না, তাদের কোনো দাবিদাওয়া নেই। খুব ভালো পরিবার তো। তারা নগদ কোনো টাকাও চায় নি। একেবারে ছোটোখাটো কিছু দাবি আছে তাদের।"

"যেমন?"

"একটা বাজাজ স্কুটার, একটা সামিট মিকচার, পাঁচটা রেমন্ড সুট আর কিছু গয়নাগাটি। সত্যি বলতে কি তারা এগুলো না চাইলেও আমি দিতাম।"

আমি তো অবাক। "কিন্তু লাজওয়ান্তি, এসব দিতে গেলেও তো কমপক্ষে একলাখ রুপি লাগবে। এতো টাকা তুমি কোথায় পাবে?"

"আমি লক্ষ্মীর বিয়ের জন্যে টাকা জমিয়ে রেখেছি। মোট পঞ্চাশ হাজার রুপি হয়েছে। বাকি পঞ্চাশ হাজার টাকা আমি রাণী সাহেবার কাছ থেকে ধার করবো।"

"তুমি নিশ্চিত এতোগুলো টাকা রাণী সাহেবা তোমাকে ধার দেবেন?"

"অবশ্যই দেবেন। আমি তার সেরা কাজের লোক।"

"তো দোয়া করি তোমার ইচ্ছে যেনো পূরণ হয়।"

আমি নিতার সাথে দেখা সাক্ষাত অব্যাহত রাখলাম কিন্তু বেশ্যাপাড়ার পরিবেশ আমাকে অস্বস্তিতে ফেলে দিলো। কুতকুতে চোখের নিতার দালাল শ্যামের মুখোমুখি হতে মোটেও ইচ্ছে করে না। তাই নিতার কথামতো আমরা বাইরে দেখা সাক্ষাত করতে শুরু করলাম। প্রতি শুক্রবার সে একা একা ছবি দেখতে গেলে আমি তার সাথে যোগ দিতাম। পপকর্ন খেতে সে খুব ভালোবাসতো।

আমি তাকে সেগুলো কিনে দিলে বসে বসে সে ছবি দেখতো আর পপকর্ন খেতো। আমি তার পোশাকের নীচ দিয়ে হাত ঢুকিয়ে তার নরম স্তন দুটো মর্দন করতাম। ছবি শেষ হলে দেখা যেতো উত্তেজনায় আমি গরম হয়ে উঠেছি। ঘেমে টেমে একাকার। বুঝতেই পারতাম না এতোক্ষণ আমি পারিবারিক ড্রামা, কমেডি নাকি থৃলার ছবি দেখছিলাম। কারণ আমি কেবল নিতাকে দেখতাম। স্পর্শ করতাম। আমার কাছে মনে হোতো আমরা আসলে কোনো রোমান্টিক ছবিতে ঢুকে পড়েছি।

কাঁদতে কাঁদতে আমার ঘরে ঢুকলো শংকর।

"কি হয়েছে?" জানতে চাইলাম আমি।

সে তার হাটুর দিকে ইঙ্গিত করলো। ওখান থেকে রক্ত পড়ছে। কেটে গেছে হয়তো। আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম।

"কিভাবে এটা হলো, শংকর? তুমি কি পড়ে গিয়েছিলে?"

শংকর মাথা ঝাঁকালো। "জু-জু-অ্যা।"

"বুঝলাম না। তুমি বাইরে গিয়ে দেখাও তো কিভাবে এটা হলো?"

শংকর আমাকে ঘর থেকে মেইন রাস্তায় নিয়ে এলো। রাস্তার এক কোণে একটু উঁচু দেয়াল আছে। ওখান থেকে বাচ্চা ছেলেমেয়েরা জাম্প জাম্প খেলা খেলে।

"জু-জু-অ্যা-ফি-উহ্-অ্যা-জি!" শংকর ঐ জায়গাটা দেখিয়ে তার হাটুর দিকে ইঙ্গিত করলো।

আমি বুঝতে পেরে মাথা নাড়ালাম। নিশ্চয় সে লাফ দিতে গিয়ে হাটুতে ব্যথা পেয়েছে। "আসো, লাজওয়ান্তির কাছে ফার্স্টএইড আছে। সে তোমার হাটুতে ব্যান্ডেজ ক'রে দিতে পারবে।"

আমি দেয়ালের নিচে একটা পাগলা কুকুরকে দেখতে পেলাম না। জিভ বের ক'রে বসে আছে কুকুরটা। মুখ দিয়ে লালা পড়ছে।

নতুন বছর নতুন আশা নিয়ে হাজির হলো। নতুন একটা স্বপ্নেরও হাতছানি দিলো আমাকে। নিতা এবং আমি দু'জনেই আঠারোতে পা দিলাম—বিয়ে করার বৈধ বয়স। প্রথমবার আমি বিশ্বাস করতে শুরু করলাম আমার স্বপ্নের বাস্তবায়ন সম্ভব যদি নিতা আমার পাশে থাকে। লোকজনকে টাকা-পয়সা ধার দেয়া বন্ধ ক'রে দিলাম। আমাকে সঞ্চয় করতে হবে এখন।

আজ শুক্রবার। তার উপর পূর্ণিমা। খুবই বিরল মুহূর্ত সন্দেহ নেই। নিতাকে রাজি করালাম আজ সিনেমা না দেখে তাজমহল যেতে। তাজমহলের সামনে বসে রাতের বেলায় পূর্ণিমার সৌন্দর্য দেখলাম দু'জনে। বলা ভালো পূর্ণিমার সমস্ত সৌন্দর্যকে হরণ ক'রে নিলো তাজমহল। সাদা মার্বেল পাথর এমন দ্যুতি ছড়াতে লাগলো যে, আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলাম। নিতা আর আমি বাকরুদ্ধ হয়ে তাজমহলকে দেখে গেলাম অনেকক্ষণ ধরে। আমাদের সামনে যেনো স্বর্গ নেমে এসেছে। হাতে হাত রেখে সেই স্বর্গ দেখলাম। আমরা ছাড়াও প্রচুর বিদেশী পর্যটক আছে। পূর্ণিমায় তাজমহল দেখতে হলে বিদেশীদের পঞ্চাশ ডলার ক'রে দিতে হয়।

একবার আমি তাজমহলের দিকে তাকাই, আরেকবার তাকাই নিতার মায়াবী মুখের দিকে। আমার দু'চোখ বেয়ে অশ্রুজল গড়িয়ে পড়লো। যেনো আঠারো বছর ধরে আমার বুকের ভেতর জমে থাকা সমস্ত ভালোবাসা উপচে পড়ছে দু'চোখ বেয়ে।

এই মুহূর্তটার জন্যে আমি অপেক্ষা করছিলাম। জেলে যাবার আগে দাড়িওয়ালা কবি নাজমী নিতার জন্যে একটা গজল লিখে গিয়েছিলো। সেটা আমি মুখস্ত ক'রে রেখেছি। এখন ঐ গজলের লাইনগুলো আওড়ালাম :

অসাধারণ তোমার রূপ
যা আমার তুচ্ছ জীবনকে
দিয়েছে প্রাণ।
প্রেমে দিওয়ানা হয়ে আমি মরে যাবো,
কবর থেকে উচ্চস্বরে গাইবো এ গান,
আমার বউ হবে কি প্রিয়?

সিনেমার অনেক রোমান্টিক ডায়লগ আমার জানা আছে। কিন্তু নিতার পাশে বসে এগুলো ভুলে গেলাম। কেবল চেয়ে রইলাম তার দিকে। "আমাকে ভালোবাসো তুমি?" একটামাত্র শব্দেই জবাব দিলো সে, "হ্যা।" এই একটা শব্দ শত শত গান, কবিতা আর ডায়লগের চেয়ে বেশি অর্থপূর্ণ আমার কাছে। শব্দটা শোনামাত্র আমার হৃদয় উথলে উঠলো সুতীব্র আনন্দে। আমার প্রেম ডানা মেলে আকাশে উড়তে লাগলো। তাজমহলকে আমার আর স্মৃতিসৌধ বলে মনে হলো না। মনে হলো জীবন্ত প্রেমের মন্দির। আর আমরা দু'জন সেই মন্দিরের পূজারী।

আমার ঘরে শংকর দৌড়ে এলো। "জি-অ্যা-জি-উহ্!" আমাকে টানতে টানতে লাজওয়ান্তির ঘরে নিয়ে গেলো সে।

বিছানায় বসে লাজওয়ান্তি কাঁদছে।

"কি হয়েছে, লাজওয়ান্তি? তুমি কাঁদছো কেন?" জানতে চাইলাম আমি।

"ঐ কুত্তি স্বপ্না দেবির জন্যে। সে আমাকে টাকা ধার দেবে না। আমি এখন কিভাবে আমার বোনের বিয়ে দেবো?" কথাটা বলে আবারো কাঁদতে লাগলো। এবার আরো জোরে জোরে।

"এতো টাকা তো এখানকার কেউ তোমাকে দিতে পারবে না। ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারবে কি?"

"হাহ্। কাজের লোককে কোন্ ব্যাংক ঋণ দেবে? এখন আমার সামনে একটাই পথ খোলা আছে।"

"কি, কোন্ পথ? তোমার বোনের বিয়ে বাতিল ক'রে দেবে?"

তার চোখে মুখে সুতীব্র ক্রোধ। "না। এটা আমি কখনই করবো না, হয়তো ঐ কবি নাজমী যা করেছে আমিও তাই করবো। টাকা চুরি করবো।"

আমি আৎকে উঠলাম। "পাগল হয়েছো? একথা কখনও স্বপ্নেও ভাববে না। দ্যাখো নি পুলিশ নাজমীকে কিভাবে ধরে নিয়ে গেলো?"

"ঐ নাজমী ছিলো বোকা। আমার কাছে নিখুঁত একটা পরিকল্পনা রয়েছে। সেটা আমি তোমাকে বলবো, কারণ আমি তোমাকে ছোটো ভায়ের মতো দেখি। এ কথা কাউকে বোলো না, এমনকি শংকরকেও না। আমি জানি স্বপ্না দেবি কোথায় তার সমস্ত টাকা-পয়সা রাখে। তার শোবার ঘরে বিশাল একটা পেইন্টিং আছে। সেটার পেছনে আছে একটা সিন্দুক। ম্যাট্রেসের নিচে সেই সিন্দুকের চাবি রাখে স্বপ্না দেবি। সিন্দুকে টাকা-পয়সা আর গয়নাগাটি আছে প্রচুর। আমি টাকা চুরি করবো না, কারণ তাহলে সঙ্গে সঙ্গে মহিলা টের পেয়ে যাবে। একটা নেকলেস সরাবো ভাবছি। ওরকম নেকলেস তার অনেক আছে। ব্যাপারটা সে বুঝতেই পারবে না। তোমার কি মনে হয়?"

"লাজওয়ান্তি, আমার কথা শোনো। তুমি যদি আমাকে তোমার ভাই মনে ক'রে থাকো তবে আমার একটা উপদেশ শোনো। এইসব কথা মুখেও এনো না। আমার কথা বিশ্বাস করো, জীবনে আমি অনেক দেখেছি। কোনো অপরাধই এমনি এমনি পার পায় না। তুমি ধরা পড়ে যাবে। তোমার বোনের বিয়েতে না থেকে চৌদ্দশিকের ভেতর থাকতে হবে তোমাকে।"

"তোমরা পুরুষেরা সব ভীতুর ডিম," তিক্তমুখে বললো সে। "তোমার এসব কথা শুনলে আমার হবে না। আমাকে যা করতে হবে তাই আমি করবো।"

মরিয়া হয়ে আমি আমার লাকি কয়েনটা পকেট থেকে বের করলাম। "লাজওয়ান্তি, তুমি তো ভাগ্যে বিশ্বাস করো, তাই না? এটা হলো আমার জাদুর কয়েন। এটা আমাকে সব সময়ই সঠিক পথ দেখিয়েছে। তো দেখি তোমার বেলায় কি হয়। আমি এটা টস্ করবো। হেড পড়লে তুমি তোমার এই পরিকল্পনা বাদ দেবে। টেইল হলে তোমার যা খুশি তাই করবে। ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে।"

কয়েনটা টস্ করলে হেডই পড়লো। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো লাজওয়ান্তি। "মনে হচ্ছে ভাগ্য আমার পক্ষে নেই। ঠিক আছে। আমি গ্রামে গিয়ে মহাজনদের কাছ থেকে টাকা ধার করার চেষ্টা করবো। তারা তো আমাকে চেনে। তোমাকে যা বলেছি ভুলে যাও।"

তিন দিন পর লাজওয়ান্তি এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে গ্রামে চলে গেলো।

"আমি চাই তুমি এই বেশ্যার কাজ ছেড়ে দাও," নিতাকে আমি বললাম।

নিতাও আমার সাথে এক মত হলো। "আমি রাধার মতো বিশ বছর বয়সে মরে যেতে চাই না। আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও, রাজু।"

"তাই করবো। আমি কি এ ব্যাপারে শ্যামের সাথে কথা বলবো?"

"হ্যা। তাকে রাজি না করাতে না পারলে এটা সম্ভব হবে না।"

আমি দালালের সাথে সেই রাতেই কথা বললাম। "দ্যাখো শ্যাম, আমি নিতাকে ভালোবাসি, তাকে বিয়ে করতে চাই। সে আর এই পতিতালয়ে কাজ করবে না।"

আমার দিকে চোখ কটমট ক'রে তাকালো শ্যাম। যেনো আমি কোনো কীটপতঙ্গ। "আচ্ছা। তাহলে তুই তার মাথাটা খারাপ করেছিস। শোন বানচোত। নিতাকে কেউ কাজ করতে বারণ করতে পারবে না। কেবল আমি এ কথা বলতে পারি। কিন্তু আমি চাই সে কাজ করুক। সে হলো আমার সোনার ডিম পাড়া হাঁস। আর আমি চাই আরো অনেক দিন সে ডিম পেড়ে যাক।"

"তার মানে তুমি তাকে কখনই বিয়ে করতে দেবে না?"

"এক শর্তে তাকে বিয়ে করতে দিতে রাজি হতে পারি। যে লোক তাকে বিয়ে করবে তাকে অনেক টাকা দিতে হবে আমার ক্ষতিপূরণ বাবদ।"

"তাহলে কতো টাকা দিলে তোমার ক্ষতিপূরণ হবে?"

"উমমম...চার লাখ রুপি। এতো টাকা কি তুই দিতে পারবি?" অট্টহাসি হেসে আমাকে চলে যেতে বললো সে।

আমি আমার জমানো টাকা সেই রাতে গুনে দেখলাম। মোট ৪৮০ রুপি।

মাত্র ৩৯৯৫২০ রুপি ঘাটতি রয়েছে!

খুব রাগ হলো আমার। ইচ্ছে করলো নিতার দালালকে গলা টিপে খুন ক'রে ফেলি। "শ্যাম কখনই তোমাকে বিয়ে করতে দেবে না," পরের দিন তাকে কথাটা বললাম। "একমাত্র রাস্তা হলো পালিয়ে যাওয়া।"

"না," ভয়ে বললো নিতা। "পতিতালয়ের লোকজন আমাদেরকে ঠিকই খুঁজে বের করবে। গত বছর চম্পা এক লোকের সাথে ভেগে গিয়েছিলো। তারা তাকে ধরে লোকটার এক পা ভেঙে দেয় আর দশ দিন ধরে না খাইয়ে রাখে চম্পাকে।"

"এমন যদি হয় তো আমি শ্যামকে খুন করবো," খুব দৃঢ়ভাবে কথাটা বললাম আমি।

"না," নিতা খুব উদ্বিগ্ন হয়ে বললো। "আমাকে কথা দাও এটা তুমি কখনও করবে না।"

আমি তো অবাক। "কিন্তু কেন?"

"কারণ শ্যাম আমার ভাই।"

আমাদের চালাঘরের সামনে একটা পুলিশের জিপ এসে থামলো। কনস্টেবল আর ইন্সপেক্টর সেটা থেকে নেমে এলো আমাদের কাছে। এবারের ইন্সপেক্টরটি নতুন। আমাদের সবাইকে ডাকা হলো। "এই যে, হতচ্ছাড়ার দল। খুব মারাত্মক ঘটনা ঘটে গেছে। স্বপ্না দেবির বাড়ি থেকে কেউ তার মহামূল্যবান একটি নেকলেস চুরি করেছে। আমার কাছে যথেষ্ট প্রমাণ আছে কাজটা তোমাদের মধ্যে কেউ করেছে। সুতরাং তোমাদেরকে আমি শেষ একটা সুযোগ দিচ্ছি। ভালোয় ভালোয় স্বীকার করো। না হলে ধরা পড়লে পস্তাতে হবে।"

আমি সঙ্গে সঙ্গে লাজওয়ান্তির জন্যে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। কিন্তু তার ঘরে তালা দেখে বুঝতে পারলাম সে তো অনেক আগেই গ্রামের বাড়িতে চলে গেছে। একটা স্বস্তি নেমে এলো আমার মধ্যে।

একে একে নানান প্রশ্ন করা হলো আমাদের সবাইকে। শংকরের পালা যখন এলো আবারো সেই দৃশ্যের অবতারনা ঘটলো।

"নাম?" ইন্সপেক্টর জিজ্ঞেস করলো।

"জি-অ্যা-জু-ই!" শংকর জবাবে বললো।

"কী বললি?"

"জি-অ্যা-জু-ই-ই!"

"বানচোত! আমার সাথে মশকরা..." রেগেমেগে ইন্সপেক্টর তেড়ে যেতে

উদ্যত হলো। আবারো আমাকেই এগিয়ে আসতে হলো শংকরের সাহায্যে। সব শুনে ইন্সপেক্টর শংকরকে চলে যেতে বললো। এইবার খালি হাতেই ফিরে গেলো পুলিশ। কোনো নেকলেস আর সন্দেহভাজন ছাড়াই।

সেই রাতে তাজমহলের কাছে একটা রোগা কুকুর মারা গেলো। এটা অবশ্য কেউ খেয়াল করলো না।

লাজওয়ান্তি পর দিনই গ্রাম থেকে ফিরে এলে তাকে গ্রেফতার করা হলো। কনস্টেবলরা তাকে টেনে হিচরে নিয়ে গেলেও অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া আমার কিছু করার রইলো না। আমার পাশে স্বপ্না দেবির বাগানের মালি আব্দুল আছে।

"আব্দুল, পুলিশ লাজওয়ন্তিকে কেন ধরে নিয়ে গেলো? রাণী সাহেবা কিছু করছেন না কেন?"

আব্দুল দাঁত বের ক'রে হাসলো। "রাণী সাহেবাই তো পুলিশকে ডেকে এনেছেন।"

"কেন?"

"কারণ লাজওয়ান্তিই নেকলেসটা চুরি করেছে। পুলিশ তার গ্রামের বাড়িতে গিয়ে তল্লাশী ক'রে নেকলেসটা উদ্ধার করেছে আজ।"

"স্বপ্না দেবি কি ক'রে জানলেন নেকলেসটা লাজওয়ান্তিই চুরি করেছে? চুরি যখন হয় তখন তো লাজওয়ান্তি এখানে ছিলো না।"

"লাজওয়ান্তি তার অপকর্মের ছাপ রেখে গেছে। সে কিন্তু সোজা তার গ্রামে যায় নি। আগ্রায় অপেক্ষা করেছে মোক্ষম সময়ের জন্যে। তারপর সুযোগ বুঝে বাড়িতে ঢুকে নেকলেসটা সরিয়ে নিয়েছে। ম্যাডাম তখন একটা পার্টিতে ছিলেন। কিন্তু পার্টিতে যাবার আগে ম্যাডাম চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়ে ছিলেন। তখন বিছানার চাদরে তার কিছু পিন আর ক্লিপ ফেলে গিয়েছিলেন তিনি। রাতে বাড়ি ফিরে ম্যাডাম দেখেন তার পিন আর ক্লিপগুলো সুন্দর ক'রে ড্রেসিং টেবিলে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এটা দেখেই তিনি সন্দেহ করতে শুরু করলেন। সিন্দুক খুলে চেক ক'রে দেখেন একটা নেকলেস নেই। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বুঝতে পারলেন কাজটা লাজওয়ান্তি ছাড়া আর কেউ করে নি।"

আমি আমার কপাল চাপড়ালাম। এমন কি চুরি করতে গিয়েও লাজওয়ান্তি তার স্বভাবের বাইরে যেতে পারে নি!

লাজওয়ান্তির পক্ষ নিয়ে আমি স্বপ্না দেবির কাছে গেলে তিনি শীতল কণ্ঠে আমাকে অনেকটা তিরস্কার করলেন। "আমি কোনো লঙ্গরখানা চালাই না।

তার বোনের জন্যে এতো ধুমধাম ক'রে বিয়ে দেবার দরকারটা কি ছিলো? তোমরা গরীবেরা সীমার মধ্যে থাকলেই ভালো। নিজের আওকাতের মধ্যে থাকো, কোনো সমস্যায় পড়বে না।"

সেই দিন থেকে তার প্রতি আমার ঘৃণা জন্মে গেলো। তবে তার কথাটাও ঠিক। লাজওয়ান্তি নিজের বোনকে ধুমধাম ক'রে বিয়ে দিতে গিয়ে এক ধরণের ভুলই করেছে। যতো বড় স্বপ্ন তুমি দেখবে ততো বড় হতাশায় ভুগবে। এজন্যেই আমার স্বপ্নটা খুব ছোটো। যেমন একজন দালালকে মাত্র চার লাখ রুপি দিয়ে এক পতিতাকে বিয়ে করতে চাইছি!

লাজওয়ান্তির গ্রেফতারে ঘটনা সামলাতে না সামলাতেই আরেকটা ঘটনা আমাকে বিপর্যস্ত ক'রে তুললো।

কাশতে কাশতে আমার ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লো শংকর। তাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। তার সারা শরীরে বিশেষ ক'রে হাটু আর হাতে ব্যথা হচ্ছে। "জি-জ্যা-উহ্-ফি!" সে বললো।

তার কপালে হাত দিয়ে দেখি একটু জ্বর জ্বর লাগছে। "তোমার ঠাণ্ডা লেগেছে, শংকর," তাকে বললাম। "নিজের ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করো। আমি তোমার জন্যে কিছু ওষুধ নিয়ে আসছি।"

আস্তে ক'রে উঠে নিজের ঘরে চলে গেলো সে। তার মধ্যে অস্থিরতা আর ত্যাক্ত বিরক্ত ভাব দেখলাম আমি।

রাতের বেলা আমি শংকরের জন্যে কিছু পেইনকিলার নিয়ে এলাম। কিন্তু এসব ওষুধে তার মধ্যে কোনো উন্নতির লক্ষণ দেখা গেলো না। বরং অবস্থার অবনতি ঘটতে লাগলো দ্রুত। দ্বিতীয় দিন সে অনেকটা হিংস্র হয়ে উঠলো। হাত পা নাড়াতে সক্ষম হলো না। তার জ্বর মেপে দেখি ১০৩ ডিগৃ। সঙ্গে সঙ্গে দেরি না ক'রে আমি ডাক্তারের কাছে ছুটে গেলাম। বাড়িতে এসে রোগী দেখার জন্যে আমার কাছ থেকে আশি টাকা নিলো ডাক্তার। শংকরকে দেখে ডাক্তার আমাকে জিজ্ঞেস করলো কয়েক দিন আগে তার কোনো কাটাছেড়া হয়েছিলো কিনা। আমি তাকে হাটুতে কেটে যাওয়ার কথা বললাম। ডাক্তার মাথা নেড়ে বললো শংকরের জলাতঙ্ক রোগ হয়েছে। পাগলা কুকুর কামড়ালে এ রোগ হয়। তাকে ইনজেকশন দিলে ভালো হয়ে যেতো কিন্তু খুব দেরি হয়ে গেছে। এখন তার মধ্যে জলাতঙ্ক দেখা দেবে। চোখে উল্টাপাল্টা জিনিস দেখবে। কথাবার্তাও বন্ধ হয়ে যাবে। তারপর প্যারালাইজ হয়ে নির্ঘাত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে থাকবে। আর এসবই ঘটবে মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে।

ডাক্তারের কথা শুনে আমি একেবারে মুষড়ে পড়লাম। শংকরের মৃত্যুর কথা ভাবতেই আমার দু'চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়লো। "ডাক্তার, শংকরকে বাঁচানোর কি কোনো রাস্তা নেই?"

"এক মাস আগে অবশ্য আমেরিকার তৈরি একটা ভ্যাকসিন এসে পৌছেছে। এটাকে বলে র‍্যাবকিউর। আমাদের গুপ্তা ফার্মেসিতে এটা পাওয়া যায়।"

"রেকাব গঞ্জের ঐ ফার্মেসিটার কথা বলছেন?"

"হ্যা। কিন্তু আমার মনে হয় না তুমি ওটা কেনার ক্ষমতা রাখো।"

"ওটার দাম কতো?" দুরু দুরু বুকে আমি জানতে চাইলাম।

"প্রায় চার লাখ রুপি।"

আমার কাছে এটাকে নিয়তির পরিহাস বলেই মনে হলো। শংকরের চিকিৎসার জন্যে লাগবে চার লাখ রুপি, আবার নিতার মুক্তির জন্যেও সেই একই পরিমাণ টাকা লাগবে। অথচ আমার কাছে আছে মাত্র চারশ রুপি।

আমি জানি না শংকরের চিকিৎসার জন্যে কোত্থেকে টাকা পাবো। তবে তাকে একা রাখা যাবে না সেটা আমি ভালো করেই বুঝলাম। কোলে ক'রে আমার ঘরে নিয়ে এলাম তাকে। সে আমর বয়সী হওয়া সত্ত্বেও তার ওজন একেবারেই কম মনে হলো। শংকরকে আমার বিছানায় রেখে নিজে শুলাম মেঝেতে। ঠিক একই কাজ দু'বছর আগে শংকর আমার জন্যে করেছিলো। যদিও এখন সেই সময়টাকে বিশ বছর ব'লে মনে হচ্ছে আমার কাছে।

শংকর সারা রাত এপাশ ওপাশ করলো। আমারও রাতে ভালো ঘুম হলো না।

পরের দিন সারাটা সময় শংকর বিছানাতেই কাটালো। তর স্বাস্থ্য দুর্বল থেকে দুর্বল হতে লাগলো ক্রমশ। আমি জানি তার মৃত্যুদণ্ড হয়ে গেছে। কিন্তু তার সামনে আমি ভান করলাম সাধারণ ঠাণ্ডাজ্বর ছাড়া আর কিছু হয় নি। এই মুখটা আর দেখতে পাবো না ভাবতেই আমার হৃদয় ভেঙে খান খান হয়ে গেলো। তার মুখ নিঃসৃত আবোল তাবোল কথাগুলোও এখন আমার কাছে অনেক অর্থপূর্ণ হয়ে উঠলো যেনো।

রাতের বেলায় শংকরের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে গেলো। তরল জাতীয় কোনো কিছু খেতে পাচ্ছে না। একটা মাত্র চাপাতি খেতে পারলো কোনো মতে। জ্বরে তার কপাল আগুনের মতো পুড়ে যাচ্ছে। থার্মোমিটার দিয়ে মেপে দেখি ১০৫ ডিগ্।

"জি-জ্যা-হিশ্-উ!" কাঁদতে কাঁদতে সে বললো। আমি তাকে যত্নআত্তি করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমি নিজেই যেখানে বিপর্যস্ত সেখানে এটা করা প্রায় কঠিন একটি কাজ।

সেই রাতের শেষের দিকে আমি শংকরের বিছানা থেকে গোঙানীর শব্দ শুনতে পেয়ে ঘুম থেকে উঠে শংকরের দিকে তাকালাম। তার চোখ দুটো বন্ধ কিন্তু ঠোঁট দুটো নড়ছে। সে কী বলছে শোনার চেষ্টা করতেই বিস্ময়ে লাফ দিয়ে উঠলাম। আমি কসম খেয়ে বলছি শংকর বলছে, "মা, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে আর মেরো না।"

"শংকর! শংকর!" আমি তার বিছানায় উঠে বসলাম। "তুমি এইমাত্র কিছু একটা বললে, তাই না?"

কিন্তু শংকর আমাকে খেয়ালই করতে পারছে না। নিজের জগতে হারিয়ে গেলো সে। মুখ দিয়ে ফেনা বের হতে লাগলো তার। "আমাকে তাড়িয়ে দিলে কেন, মা?" সে বিড়বিড় ক'রে বললো। "আমি দুঃখিত, আমার উচিত ছিলো দরজায় নক্ ক'রে ঢোকা। আমি কি ক'রে জানবো কাকা ঘরের ভেতর তোমার সাথে আছে? আমি তোমাকে ভালোবাসি, মা। তোমার একটা ছবি এঁকেছি আমি। আমার নীল রঙের ডায়রিতে আছে সেটা। আমি তোমাকে ভালোবাসি, মা। অনেক অনেক ভালোবাসি। আমাকে মেরো না, মা। আমি কসম খেয়ে বলছি, কাউকে বলবো না। মা, মা, মা!"

শংকর তার ছয় বছর বয়সের কথা বলছে। সে ফিরে গেছে অনেক অনেক আগের সময়ে। এমন একটা সময় যখন তার মা ছিলো। যখন তার জবান ছিলো। আমি জানি না কি ক'রে সে এখন এতো স্পষ্ট কথা বলতে পারছে। ডাক্তার তো বলেছিলো এই সময় তার জবান বন্ধ হয়ে যাবে। তবে এর কারণ খোঁজার কোনো চেষ্টা আমি করলাম না। অলৌকিক কোনো কিছুকে কেউ প্রশ্ন করতে পারে না।

সেই রাতে এই কথাটুকুই আমি শংকরের কাছ থেকে শুনতে পেলাম। কিন্তু সকালে যখন ঘুম থেকে উঠলো সে আবার ষোলো বছরের সেই শংকর হয়ে গেলো। তবে তার বলা নীল রঙের ডায়রির কথাটা আমার মনে ছিলো। তার বিছানার নীচ থেকে অবশেষে সেটা খুঁজেও পেলাম।

ওটাতে একটা আলগা কাগজে ছবি আঁকা আছে। পেন্সিলে আঁকা সুন্দর এক মহিলার ছবি। ড্রইংটা খুবই নিখুঁত। কিন্তু আমি তার অসাধারণ ড্রইংয়ের দিকে নয়, ছবির মহিলার দিকে স্থির চেয়ে রইলাম। কারণ ছবিটা স্বপ্না দেবির।

"আমি জানি এতোদিন তুমি আমার কাছ থেকে কি লুকিয়ে রেখেছিলে, শংকর। আমি এখন জেনে গেছি স্বপ্না দেবি তোমার মা হয়," নীল ডায়রিটা তার সামনে তুলে ধরে বললাম আমি।

ভয়ে তার চোখমুখ অস্থির হয়ে উঠলো। আমার হাত থেকে ডায়রিটা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করলো সে। "আ-জি-জি-ই-উ!" আর্ত চিৎকার করলো।

"আমি জানি এটা সত্য, শংকর। আমার মনে হয় তুমি তার নোংরা গোপন কথা জেনে গিয়েছিলে বলেই তোমাকে পরিত্যাগ করেছে। বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। আর তখনই তুমি সাধারণ ছেলেদের মতো কথা বলার ক্ষমতা হারিয়েছো। তোমার মা এজন্যে অপরাধবোধ থেকে তোমার জন্যে কোনো ভাড়া নেন না। বরং তোমার খাওয়া পরার জন্যে টাকা দেন। কিন্তু এখন আমি তোমার মার কাছে যাবো। তাকে বলবো তোমার চিকিৎসার সমস্ত খরচ দিতে।"

"ইক-ইক-জি-অ্যা-ফি-আ-আ!" চিৎকার ক'রে বললো সে। কিন্তু আমি তার কথা না শুনে স্বপ্না দেবির কাছে চলে গেলাম।

প্রথমে রাণী সাহেবা আমার সাথে দেখা করতে অস্বীকৃতি জানালেন। বললেন কেবলমাত্র আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা থাকলেই তিনি দেখা করেন। কিন্তু তার দরজার সামনে দু'ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকলে অবশেষে তিনি দেখা করতে রাজি হলেন।

"হ্যা। আমাকে বিরক্ত করার জন্যে কেন এসেছো, বলো?" একটু রেগেই বললেন কথাটা।

"আমি আপনার গোপন কথা জেনে গেছি, স্বপ্না দেবি," তার মুখের উপরেই কথাটা বলে ফেললাম। "আমি জেনে গেছি শংকর আপনার ছেলে হয়।"

তার কড়া মেকাআপের চেহারাটায় কিছুক্ষণের জন্যে চিড় ধরলো। একটু ফ্যাকাশে হয়ে গেলো সেটা। কিন্তু খুব দ্রুতই তিনি সামলে নিয়ে আমাকে ভড়কে দিলেন। "দু'পয়সার রাস্তার ছেলে, তোমার কতো বড় আস্পর্ধা! আমার বিরুদ্ধে এরকম জঘন্য কথা বলছো? শংকরের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। তাকে একটু আশ্রয় দিয়েছি বলে আমার ছেলে হিসেবে চালিয়ে দিতে চাইছো? এক্ষুণি এখান থেকে বের হয়ে যাও। নইলে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দেবো।"

"আমি চলে যাবো," তাকে বললাম, "কিন্তু চার লাখ রুপি আপনার কাছ থেকে নেবার পরই। শংকরের চিকিৎসার জন্যে এই টাকাগুলো আমার দরকার। তার জলাতঙ্ক হয়েছে।"

"মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি তোমার? আমি তোমাকে চার লাখ রুপি দেবো?" তেঁতে উঠলেন তিনি।

"কিন্তু আপনি যদি টাকাটা না দেন শংকর তো চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মারা যাবে।"

"তাতে আমার কিছুই আসে যায় না। আমাকে এ নিয়ে আর বিরক্ত কোরো না।" তারপরেই তিনি সবচাইতে জঘন্য কথাটা বললেন। "সম্ভবত সে মরে গেলেই ভালো হয়। বেচারা গরীব ছেলেটা দুঃখ কষ্ট থেকে বেঁচে যাবে। আর শোনো, শংকর আমার ছেলে এই জঘন্য মিথ্যে কথাটা আর কাউকে বলবে না বলে দিচ্ছি।" দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলেন তিনি।

অশ্রুসজল চোখে আমি তার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম। জন্মের সময় আমার মা আমাকে পরিত্যাগ করেছে বলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করলাম আমি। কিন্তু বেচারা শংকরকে তো তার মা তার জ্ঞান হবার পর ত্যাগ করেছে। আর এখন কিনা নিজের মা হয়ে মহিলা সন্তানের মৃত্যু কামনা করছে!

ভগ্ন হৃদয়ে আমি শংকরের কাছে ফিরে এলাম। জীবনে এর আগে আর কখনও দারিদ্রকে এতোটা অসহায় লাগে নি আমার কাছে। ইচ্ছে করলো কুকুরটাকে গিয়ে বলি শংকরকে কামড়ানোর আগে তার বোঝা উচিত ছিলো তার পক্ষে ওষুধ কেনার সামর্থ্য আছে কিনা।

পরের দিন আমি এমন একটা কাজ করলাম যা আমি এর আগে কখনও করেছি ব'লে মনে পড়লো না। আমি প্রার্থনা করলাম। দূর্গা মন্দিরে গিয়ে মা দূর্গার কাছে শংকরের সেরে ওঠার জন্যে আর্শীবাদ চাইলাম। সেন্ট জন চার্চে গিয়ে ঈশ্বরকে বললাম শংকর যেনো সুস্থ হয়ে ওঠে। কালি মসজিদে গিয়ে আল্লাহর কাছে তার জীবন ভিক্ষা চাইলাম খাস দিলে। কিন্তু এতো প্রার্থনায় কোনো কাজই হলো না। তার অবস্থা খারাপ হতেই থাকলো। শংকরের শ্বাসপ্রশ্বাস অনিয়মিত হয়ে পড়লো আচম্‌কা।

রাত নামলো। অমাবস্যা। কিন্তু স্বপ্না দেবির বাড়ির দিকে তাকালে তা মনে হবে না। হাজার হাজার বাতি জ্বলছে সেখানে। রাণী সাহেবার বাড়িতে একটা পার্টি হচ্ছে। স্বয়ং পুলিশ কমিশনার, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আর স্থানীয় গন্যমান্য ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, লেখক, রাজনীতিবিদ উপস্থিত আছেন। বাড়ি থেকে মৃদু সংঙ্গীত আর হাস্যরোলের আওয়াজ ভেসে আসছে। কিন্তু আমার ঘরে কঠিন স্তব্ধতা। সেই স্তব্ধতা মাঝে মধ্যেই শংকরের শ্বাস কষ্টের জন্যে বিঘ্নিত হচ্ছে। পানি খেতে পারছে না সে। শুরু হয়ে গেছে জলাতঙ্ক রোগের শেষ প্রতিক্রিয়া। অসম্ভব কষ্টের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে আমার বন্ধু শংকর।

এভাবে পানিবিহীন মৃত্যু আমার কাছে মনে হলো সবচাইতে নির্মম মৃত্যু। কারণ ক্যান্সোরের রোগীও পানি খেতে পারে। কিন্তু শংকর পারছে না। তার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। পিপাসায় ছটফট করছে সে। অথচ পানি দেখলেই আতঙ্কে অস্থির হয়ে পড়ছে।

শংকরকে এভাবে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে দেখে আমি

বুঝতে পারলাম স্বপ্না দেবি কতোটা পাষাণ। তার ছেলে বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে আর সে কিনা পার্টিতে আমোদ ফূর্তি করছে! তার ভাগ্য ভালো, নদীতে আমি কোল্ট রিভলবারটা ফেলে দিয়েছিলাম, নইলে আজকেই রাণী সাহেবাকে খুন করতে আমার একটুও হাত কাঁপতো না।

রাত বাড়তে থাকলে শংকরের অবস্থা একেবারে চরমে গিয়ে পৌছালো। আমি বুঝতে পারলাম তার মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে।

রাত বারোটা সাত চল্লিশ মিনিটে শংকর মারা গেলো। মারা যাবার আগে আরেকবার পরিস্কার কথা বলতে পারলো সে। আমার হাত ধরে সে বললো, "রাজু।" তারপর নীল রঙের নোটবুকটা শক্ত ক'রে ধরে কেঁদে কেঁদে বললো, "মা, মা।" এরপর চিরতরের জন্যে চোখ দুটো বুজে এলো তার।

আগ্রা এক মৃত্যুপুরীতে পরিণত হলো। আমার ঘরে একটা লাশ আর হাতে নীল রঙের একটা নোটবুক। লক্ষ্যহীনভাবে আমি পাতাগুলো উল্টে দেখলাম তার হৃদয়হীনা মায়ের অনেকগুলো পেন্সিল স্কেচ রয়েছে তাতে। না, আমি সেই মহিলাকে 'মা' বলবো না। কারণ তাতে সমগ্র মা জাতির অপমান হবে।

আমি জানি না শংকরের মৃত্যুতে আমি কী ধরণের প্রতিক্রিয়া দেখাবো। বিহারির মতো চিৎকার ক'রে অনেক কিছুর বিরুদ্ধে নালিশ করতে পারি আমি। কিংবা উচ্চস্বরে কাঁদতে পারি নিজের সমস্ত দুঃখকে উজার ক'রে দিয়ে। কিন্তু আজ আমার চোখ দিয়ে কোনো রকম অশ্রুজল গড়িয়ে পড়ছে না। তার বদলে আমার ভেতরে এক ধরণের ক্রোধ জমতে শুরু করলো। আমি নোটবুকের পাতাগুলো ছিড়ে কুচি কুচি ক'রে ফেললাম। তারপর আচম্কা শংকরের মৃতদেহটা দু'হাতে তুলে নিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলাম আলো ঝলমলে প্রাসাদের দিকে।

দ্বাররক্ষী আমার পথরোধ করলো, কিন্তু আমার হাতে মৃতদেহ দেখে সরে দাঁড়ালো পথ থেকে। আমি বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়লাম। ফয়ারে ঢুকতেই অতিথিরা আমাকে দেখতে পেয়ে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলা থামিয়ে দিলো।

একটা টেবিলের সামনে গিয়ে শংকরের মৃতদেহটা সেখানে রেখে দিলাম। ওয়েটাররা পাথরে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলো। কারো মুখে কোনো কথা নেই। অতিথিদের চেহারা দেখে মনে হলো তারা অনেকটা অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেছে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আর পুলিশ কমিশনার আমার দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। দামি গহনা আর সিল্কের শাড়ি পড়া স্বপ্না দেবি অবস্থা দেখে মনে হলো তার দম বন্ধ হয়ে গেছে। কিছু একটা বলতে গিয়েও তিনি বলতে পারলেন না। তার কণ্ঠস্বর আটকে এলো। তার দিকে ঘৃণাভরে তাকালাম আমি।

"মিসেস স্বপ্না দেবি, এটা যদি আপনার প্রাসাদ হয়ে থাকে আর আপনি যদি এই প্রাসাদের রাণী হয়ে থাকেন তবে এই যুবরাজকে স্বীকৃতি দিন। আমি আপনার কাছে আপনার সন্তান কুমার শংকর সিং গৌতমের মৃতদেহ নিয়ে এসেছি। আধ ঘণ্টা আগে সে মারা গেছে আপনার বাড়ির পাশে আপনারই চালাঘরে। যেখানে আপনি তাকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। আপনি তার চিকিৎসার জন্যে কোনো টাকা-পয়সা দেন নি। একজন মা হিসেবে যা করার তা আপনি করেন নি। এবার বাড়ির মালিক হিসেবে আপনার একজন কপর্দকহীন ভাড়াটিয়ার প্রতি দায়িত্ব পালন করুন। আয়োজন করুন শেষকৃত্যের।"

আমি আমার কথা বলে অতিথিদের দিকে তাকিয়ে জনাকীর্ণ প্রাসাদ থেকে হিমশীতল রাতে বের হয়ে এলাম। পরে জানলাম ঐ রাতে কেউ আর বাকি খাবারটুকু খেতে পারে নি।

শংকরের মৃত্যু আমার মধ্যে গভীর প্রভাব ফেললো। কাঁদলাম, ঘুমালাম আবার কাঁদলাম। তাজমহলে যাওয়া বন্ধ ক'রে দিলাম আমি। নিতার সাথেও দেখাসাক্ষাত করলাম না। জীবনের 'প্লে' বাটনটা যেনো থামিয়ে দিলাম। শংকরের মৃত্যুর পনেরো দিন পর আমি পাগলা জন্তুর মতো আগ্রার আশে পাশে ঘোরাঘুরি করলাম। এক রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শাকিল আমাকে শংকরের ঘরের সামনে দরজার তালার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে দেখলো। বিহারি নামের লোকটা আমাকে অশ্রুসজল চোখে বসে থাকতে দেখলো মিউনিসিপ্যালিটির কলের সামনে। শীতের সময় শহরটা আমার কাছে অসহ্য গরম আর ফাঁকা মরুভূমির মতো অসহনীয় হয়ে উঠলো। আমি যেনো আমার মধ্যে নেই। আমার মুখের জবান পর্যন্ত থেমে গেলো সেই তীব্র শোকে।

এক দিন ঘুম থেকে উঠে শুনতে পেলাম শাকিল নামের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেটি আমাকে ডাকছে। "রাজু। রাজু। নিতা নামের একজন তোমাকে ফোন করেছিলো। সে বলছে সে নাকি এখন সিংহানিয়া হাসপাতালের ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে আছে। তোমাকে এক্ষুণি যেতে বলেছে।" আমাদের চালাঘরের পাশে একটা পাবলিক কল অফিস আছে। সেখানেই ফোন করা হয়েছে।

কথাটা শুনে আমার গলা শুকিয়ে এলো। পুরো তিন মাইল দৌড়ে আমি চলে এলাম সিংহানিয়া হাসপাতালে। এমনভাবে ভেতরে ঢুকলাম যেনো বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটে গেছে।

"নিতা কোথায়?" বিস্ময়ে হতবাক হওয়া নার্সকে আমি বললাম।

"আমি এখানে, রাজু," নিতা দুর্বল কণ্ঠে বললো। একটা পর্দা দেয়া বেডে শুইয়ে আছে সে। তাকে দেখেই আমি আৎকে উঠলাম। তার সারা মুখে

আঘাতের চিহ্ন। ঠোঁট দুটো একেবারে ফুলে আছে। তার চোয়ালটাও ফোলা। দুটো দাঁতে রক্ত লেগে রয়েছে। বাম চোখের নিচে কালচে দাগ।

"কে...কে তোমার এমন অবস্থা করেছে?" আমি উদ্বেগের সাথে জানতে চাইলাম।

কথা বলতে তার সমস্যা হলো। "মুম্বাইর এক লোক। শ্যাম আমাকে প্যালাস হোটেলে তার কাছে পাঠিয়েছিলো। সে আমাকে হাত-পা বেঁধে এসব করেছে। তুমি আমার মুখে যা দেখছো সেটা আমার শরীরের আঘাতের তুলনায় কিছুই না।"

নিতা ঘুরে তার পিঠ দেখালে আমি দেখতে পেলাম সারা পিঠে চাবুকের আঘাতের মতো দাগ। তার বুকে সিগারেট দিয়ে অসংখ্য ছ্যাকা দেয়া হয়েছে। এরকম দৃশ্য আমি এর আগেও একবার দেখেছি।

আমার রক্ত বলক দিয়ে উঠলো। "আমি জানি এ কাজ কে করেছে। সে কি তার নাম বলেছে? আমি তাকে খুন করবো।"

"আমি তার নাম জানি না। তবে লোকটা বেশ লম্বা আর—"

এক প্যাকেট ওষুধ হাতে শ্যাম ঘরে ঢুকলো। আমাকে দেখেই তেলবেগুনে জ্বলে উঠলো সে। "বানচোত, তুই!" আমার কলার ধরে বললো সে। "তোর এতো সাহস এখানে এসেছিস? তোর জন্যেই নিতার আজ এ অবস্থা।"

"তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেলো, শ্যাম?" আমি চিৎকার ক'রে বললাম।

"আরে তোর জন্যেই নিতার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তুই ওকে স্বপ্ন দেখিয়েছিস। সেজন্যেই আজকাল সে কোনো কাস্টমার নিতে চায় না। আরে তুই জানিস, মুম্বাইর লোকটা কতো টাকা দিয়েছিলো? পুরো পাঁচ হাজার রুপি। কিন্তু আমার বোন তার সাথে হয়তো ওসব করতে অনীহা প্রকাশ করেছিলো। ফলে তার আজ এই অবস্থা। এবার তোকে বলছি, নিতার সাথে যদি আবার দেখা করতে আসিস তো সঙ্গে করে চার লাখ রুপি নিয়ে আসবি। আর না যদি না পারিস তবে নিতার কথা ভুলে যা। তোকে হাসপাতালের আশেপাশে ঘুর ঘুর করতে দেখলে আমি খুন ক'রে ফেলবো। বুঝলি? এবার এখান থেকে কেটে পড়।"

শ্যামকে খুন ক'রে ফেলতে ইচ্ছে করলো আমার। কিন্তু নিতাকে যে আমি কথা দিয়েছি এ ধরণের কোনো কিছু করবো না। নিজের রাগ দমন করলাম। যেভাবেই হোক আমাকে চার লাখ রুপি জোগার করতে হবে। কিন্তু কোত্থেকে?

আমি একটা পরিকল্পনা করলাম। স্বপ্না দেবি কখন বাড়ির বাইরে যায় সেজন্যে অপেক্ষায় থাকলাম। দু'দিন পর রাণী সাহেবাকে বাড়ির বাইরে একটা পার্টিতে যেতে দেখলাম। স্বপ্না দেবির বাড়ির দেয়ালের বাইরে মাটির গর্ত খুড়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়লাম সবার অগোচরে। লাজওয়ান্তির কাছ থেকে আগেই জানতে পেরেছিলাম কোন্ ঘরের কোন্ জায়গায় স্বপ্না দেবির সিন্দুকটা লুকিয়ে রাখা আছে। তার জানালার কাঁচ খুলে শোবার ঘরে ঢুকে পড়লাম আমি। দেয়ালে একটা পেইন্টিং দেখতে পেলাম। একটা ঘোড়ার ছবি। সিগনেচারের জায়গায় হুসেইন নামের কারো নাম লেখা আছে। পেইন্টিংটা সরিয়ে দেয়াল সিন্দুকটি খুঁজে পেলাম। ম্যাট্রেসের নিচে সেটার চাবি যথারীতিই পেয়ে গেলে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম আমি। সিন্দুকের ভেতরটা দেখে একেবারে হতবাক হলাম। বলতে গেলে একেবারে খালি সেটা। কোনো দামি বালা কিংবা নেকলেস নেই। চারটা টাকার বান্ডিল আছে কেবল। সেই সাথে কিছু দলিল দস্তাবেজ। ওগুলোর পেছনে একটা সাদাকালো ছবি চোখে পড়লো আমার। ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম ছবিটা শংকরের। চারটা টাকার বান্ডিল পকেটে ভরে সিন্দুকটা তালা মেরে চাবিটাও আগের জায়গায় রেখে দিলাম।

নিজের ঘরে ফিরে এসে আমি দরজা বন্ধ ক'রে টাকাগুলো গুণে দেখলাম। চারটা বান্ডিলে মোট ৩৯৯৮৪৪ রুপি আছে। নিজের পকেট হাতরিয়ে ১৫৬ রুপি বের কললাম আমি। সবগুলো মিলিয়ে মোট চার লাখ রুপি হলো। মনে হচ্ছে মা দূর্গার আর্শীবাদ রয়েছে আমার।

একটা বাদামি রঙের কাগজের ব্যাগে টাকাগুলো ভরে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম সঙ্গে সঙ্গে। ইমার্জেন্সি রুমে ঢুকতেই মধ্যবয়স্ক চশমা পরা এক লোকের সাথে আমার ধাক্কা লেগে গেলে হাত থেকে কাগজের ব্যাগটা মেঝেতে পড়ে টাকার বান্ডিলগুলো বের হয়ে পড়লো। টাকাগুলো দেখে চক চক ক'রে উঠলো লোকটার চোখ। বাচ্চাদের মতো টাকাগুলো কুড়িয়ে নিতে থাকলে আমি ভাবলাম আবারো কি আমার সবর্স্ব ডাকাতি হয়ে যাচ্ছে কিনা। কিন্তু সবগুলো টাকা কুড়িয়ে লোকটা আমার হাতে তুলে দিয়ে দু'হাত জোর করে বললো, "এই টাকাগুলো তোমার। কিন্তু আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি, ভাই। আমাকে টাকাগুলো ধার দিয়ে আমার ছেলের জীবন বাঁচাও। তার বয়স মাত্র ষোলো। নিজের চোখের সামনে তাকে আমি মরে যেতে দেখতে পারবো না। এটা কোনোভাবেই সহ্য করতে পারবো না আমি।"

আমি তার কাছ থেকে বান্ডিলগুলো নিয়ে চলে যেতে উদ্যত হলাম।

"আপনার ছেলের কি হয়েছে?"

"তাকে পাগলা এক কুকুর কামড়িয়েছে। এখন জলাতঙ্ক দেখা দিয়েছে

তার। ডাক্তার বলেছে যদি আমি র‍্যাবকিউর নামের একটা ভ্যাকসিন কিনে আনতে না পারি তাহলে আজ রাতেই সে মারা যাবে। কিন্তু সেটার দাম চার লাখ টাকা। আমার মতো সামান্য এক স্কুল শিক্ষকের পক্ষে এতো টাকা জোগার করা কোনো মতেই সম্ভব নয়। আমি জানি তোমার কাছে টাকা আছে, ভাই। তোমার কাছে আমি আমার ছেলের জীবন ভিক্ষা চাইছি," কথাগুলো বলেই কাঁদতে শুরু করলো লোকটা।

"এই টাকা আমার এক ঘনিষ্ঠ লোকের চিকিৎসায় ব্যয় হবে। আমি দুঃখিত, আপনাকে সাহায্য করতে পারছি না," কথাটা বলেই আমি নিতার ওয়ার্ডে ঢুকে পড়লাম।

লোকটা আমার পেছন পেছন এসে আমার পায়ে লুটিয়ে পড়লো। "ভাই, একটু দাঁড়াও। এই ছবিটা দ্যাখো। এ আমার ছেলে। আমাকে বলো আজ রাতে সে মারা গেলে আমি কিভাবে বেঁচে থাকবো?"

ছবিটা দেখে আমার শংকরের কথা মনে পড়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে মুখটা সরিয়ে নিলাম আমি। "আমি তো বলেছি, আমি দুঃখিত। আমাকে বিরক্ত করবেন না," পা'টা ছাড়িয়ে নিয়ে আমি চলে গেলাম।

পেছনের দিকে আর না তাকিয়ে জলদি চলে এলাম নিতার বেডের কাছে। শ্যাম আর পতিতালয়ের আরেকজন ষণ্ডামার্কা লোক নিতার পাশে বসে আছে। পাহারা দিচ্ছে তাকে। একটা সংবাদপত্রের উপর কিছু সমোচা রেখে সেগুলো খাচ্ছে তারা। মনে হলো নিতা ঘুমিয়ে আছে। তার মুখে এখন ব্যান্ডেজ লাগানো।

"তুই?" সমোচায় কামড় দিয়ে বললো শ্যাম। "আবার কি জন্যে এসেছিস, বানচোত?"

"তুমি যে টাকার কথা বলেছিলে সেই টাকা আমি নিয়ে এসেছি। পুরো চার লাখ রুপি। এই যে, দ্যাখো।" আমি নোটের বান্ডিলগুলো শ্যামকে দেখালে সে শিষ বাজালো।

"টাকাগুলো কোত্থেকে চুরি করেছিস?"

"সেটা তোমার জানার দরকার কি? আমি নিতাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে এসেছি।"

"নিতা কোথাও যাবে না। ডাক্তার বলেছে তার সেরে উঠতে চার মাস লাগবে। আর তোর জন্যেই যেহেতু এসব হয়েছে, সুতরাং তুই ওর চিকিৎসার সব খরচ বহন করবি। তার প্লাস্টিক সার্জারির দরকার হবে। অনেক খরচের ব্যাপার। কমপক্ষে দু'লাখ টাকা লাগবে। ছয় লাখ টাকা নিয়ে আয়, তা না হলে আমার বন্ধু তোর বারোটা বাজিয়ে দেবে।"

শ্যামের সাথে থাকা লোকটা কোমর থেকে একটা চাকু বের করলো।

আমি বুঝে গেলাম নিতাকে আমি আর কখনই পাবো না। তাকে কখনও আমার হাতে তুলে দেবে না শ্যাম। আমি যদি ছয় লাখ রুপিও নিয়ে আসি শ্যাম আরো বেশি টাকা দাবি ক'রে বসবে। আমার হাত-পা অসাড় হয়ে পড়লো। চারপাশে অন্ধকার দেখতে লাগলাম। বমি বমি ভাব হলো। সম্বিত ফিরে এলো যখন দেখতে পেলাম একটা ময়লা পত্রিকা মেঝেতে পড়ে আছে। ওটাতে একটা বিজ্ঞাপন নজরে এলো। লম্বা মতো এক লোক হাতে হাজার হাজার রুপির নোট নিয়ে দাঁত বের ক'রে হাসছে। ছবিটার নিচে ক্যাপশনে লেখা আছে টেলিভিশনের ইতিহাসে সবচাইতে বড় গেম শো'য়ে আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি—হু উইল উইন এ বিলিয়ন? ফোনলাইন খোলা আছে। এখনই ফোন করুন, কিংবা আমাদের কাছে লিখুন। দেখি আপনিই সেই বিলিয়নেয়ার হতে পারেন কিনা!

ঠিকানার জায়গায় লেখা আছে 'প্রেম স্টুডিও, খার, মুম্বাই।' সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেলাম আমি মুম্বাই যাচ্ছি।

যন্ত্রের মতো আমি ইমার্জেন্সি রুম থেকে বের হয়ে এলাম। চশমা পরা মাঝবয়সী লোকটা এখনও করিডোরে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু আমাকে দেখে সে আর ছুটে এলো না। বললোও না কিছু। সম্ভবত নিজের ছেলের মৃত্যুকে মেনেই নিয়েছে সে। আমার হাতে কাগজের ব্যাগটা ধরা। তাকে ইশারায় ডাকলে দৌড়ে ছুটে এলো সে। "নিন। এই টাকাগুলো রাখুন।" ব্যাগটা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললাম। "এর ভেতরে চার লাখ রুপি আছে। যান, ছেলেকে বাঁচিয়ে তুলুন।"

লোকটা ব্যাগ হাতে নিয়েই আমার পায়ে লুটিয়ে পড়লো আবার। কেঁদে ফেললো সে। "তুমি মানুষ না। তুমি স্বয়ং ঈশ্বর," বললো লোকটা।

আমি হেসে ফেললাম। "আমি যদি ঈশ্বর হতাম তাহলে আমাদের আর হাসপাতালের দরকার হোতো না। না, আমি নিতান্তই এক টুরিস্ট গাইড যেকিনা বিশাল একটা স্বপ্ন দেখে," কথাটা বলে আমি চলে যেতে উদ্যত হলে লোকটা আমার পথরোধ ক'রে দাঁড়ালো। পকেট থেকে একটা কার্ড বের ক'রে বললো, "তুমি আমাকে যে টাকা দিয়েছো সেটা তো তোমাকে ফেরত দিতে হবে। এটা আমার কার্ড। যতো দ্রুত সম্ভব আমি তোমার টাকা শোধ ক'রে দেবো। কিন্তু এই মুহূর্ত থেকে আমি তোমার গোলাম।"

"আমার মনে হয় না আপনাকে আমার আর দরকার হবে। সত্যি বলতে কী, আগ্রায় আমার আর কাউকেই প্রয়োজন নেই। আমি মুম্বাই চলে যাচ্ছি," অনেকটা আনমনেই আমি কার্ডটা পকেটে ঢুকিয়ে নিলাম। লোকটা আমার দিকে আবারো অশ্রুসজল চোখে তাকিয়ে হাসপাতাল থেকে দৌড়ে বের হয়ে

গেলো। আমি জানি সে এখন রেকাব গঞ্জের গুপ্তা ফার্মেসিতে যাচ্ছে।

হাসপাতাল থেকে বের হতেই পুলিশের একটা জিপ এসে থামলো সেখানে। একজন ইন্সপেক্টর আর দু'জন কনস্টেবল নেমে এলো। পেছনের সিট থেকে আরো দু'জন লোক নামলো যাদের আমি চিনতে পারলাম। একজন স্বপ্না প্যালাসের রক্ষী আর অন্যজন বাগানের মালি আব্দুল। রক্ষী আমার দিকে আঙুল তুলে বললো, "ইন্সপেক্টর সাহেব, এই ছেলেটাই রাজু। সে-ই রাণী সাহেবার ঘর থেকে টাকা চুরি করেছে।"

ইন্সপেক্টর তার কনস্টেবলদেরকে নির্দেশ দিলো, "যেহেতু তার ঘর থেকে আমরা কিছু পাই নি তাই আমার মনে হচ্ছে টাকাগুলো ওর সাথেই আছে। বানচোতটার পকেট চেক ক'রে দ্যাখো।"

কনস্টেবল দু'জন আমাকে চেক ক'রে দেখলো। কিন্তু তারা বাবলগাম আর এক রুপির কয়েন ছাড়া অন্য কিছু খুঁজে পেলো না।

"তার কাছে তো কিছু নেই, সাহেব," একজন কনস্টেবল বললো।

"তাই নাকি? তারপরেও তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। আমাদেরকে খুঁজে দেখতে হবে সেই রাতে সে কোথায় ছিলো," ইন্সপেক্টর তিক্ত কণ্ঠে বললো।

"জি-অ্যা-ই-ই-উ?" আমি ঠোঁট বেঁকিয়ে বললাম।

"কি বললি? বুঝতে তো পারছি না," বললো ইন্সপেক্টর।

"জি-জি-অ্যা-হিশ্!"

"কী আবোল তাবোল বকছে?" রেগেমেগে ইন্সপেক্টর বললো। "আমার সাথে ফাজলামো করা হচ্ছে? বানচোত। তোরে এমন শিক্ষা দেবো..." হাতের লাঠিটা তুলে আমাকে মারতে উদ্যত হলো সে, কিন্তু আব্দুল বাধা দিলো।

"ওকে মারবেন না, ইন্সপেক্টর সাহেব। রাজু তার বন্ধু শংকরের মৃত্যুর পর থেকেই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। শংকরও এভাবে কথা বলতো।"

"ওহ্, এই ব্যাপার? তাহলে তাকে সন্দেহ করলে কেন? পাগল-ছাগলকে তল্লাশী করে আমরা কিছু পাবো না। আসো, একে ছেড়ে দাও," কনস্টেবলদের বললো সে। তারপর আমার দিকে ফিরলো। "মনে কিছু কোরো না। তুমি বাড়ি যেতে পারো।"

"হিশ্-অ্যা-জি-জি!" আমি বললাম। "হিশ্-অ্যা-জি-জি-উ-উ!"

আমি স্মিতার বিছানায় বসে আছি অশ্রুসজল চোখে। আমার হাতটা ধরে স্মিতা আমাকে আশ্বস্ত করলো। লক্ষ্য করলাম তার চোখ দুটোও ভিজে গেছে।

"বেচারা শংকর," সে বললো। "তোমার কাছ থেকে যা শুনলাম তাতে মনে হচ্ছে সে একজন অটিস্টিক শিশু ছিলো। কী করুণ মৃত্যুই না হয়েছে তার। তোমারও অনেক কষ্ট হয়েছে, টমাস। তুমিও অনেক কঠিন অবস্থার ভেতর দিয়ে গেছো। তোমার তো এতো যন্ত্রণা পাবার কথা নয়।"

"কিন্তু আমার চেয়ে নিতার যন্ত্রণাটা অনেক বেশি। একবার ভাবুন, বারো বছর বয়স থেকে কী ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্য দিয়ে সে যাচ্ছে।"

স্মিতা মাথা নেড়ে সায় দিলো। "হ্যা, আমি তার অবস্থাটা কল্পনা করতে পারছি। সে কি এখনও আগ্রায় আছে?"

"তাই তো থাকার কথা। তবে আমি নিশ্চিত জানি না। বিগত চার মাস ধরে আমি তার কোনো খবর পাই নি। জানি না আর কখনও তাকে দেখতে পাবো কিনা।"

"আমি নিশ্চিত তুমি তার দেখা পাবে। চলো, এবার শেষ প্রশ্নের আগেরটা দেখি।"

স্টুডিওর সাইনটা বলছে 'সাইলেন্স', কিন্তু দর্শক সেটা আমলেই নিচ্ছে না। তারা আমাকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলেই যাচ্ছে। আমি এমন একজন গর্দভ ওয়েটার যে কিনা একশ মিলিয়ন রুপি ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছি।

ক্যামেরার সামনে লুক দিয়ে প্রেম কুমার বললো, "আমরা এখন দশ কোটি রুপির জন্যে এগারো নাম্বার প্রশ্নে যাবো। বিশ্বাস করুন, আমি নিজেই একটু ঘাবড়ে আছি। তো, মিঃ টমাস, তুমিও কি নার্ভাস?"

"না।"

"অসাধারণ! এখন পর্যন্ত তোমার জেতা কোটি রুপি নিয়ে জুয়া খেলছো আর তুমি কিনা একদম ঘাবড়াচ্ছো না! মনে রেখো, ভুল জবাব দিলে তুমি সব হারাবে। তবে সঠিক জবাব দিতে পারলে একশ' কোটি রুপির মালিক হয়ে যাবে তুমি। এই পরিমাণ টাকা কেউ লটারিতেও জেতে না। তো দেখা যাক, তুমি আজ কোন্ ইতিহাস সৃষ্টি করবে। ঠিক আছে, এগারো নাম্বার প্রশ্নটি এসেছে..." প্রেম কুমার একটু নাটকীয়তা সৃষ্টি করার জন্যে থামলো। তারপর বাক্যটি শেষ করলো বেশ গম্ভীর গলায়..."ইংরেজি সাহিত্য থেকে!"

হাত তালি দেবার জন্যে সিগনাল দেয়া হলে দর্শক তাই করলো।

"মিঃ টমাস, তোমার কি ইংরেজি সাহিত্যের ব্যাপারে কোনো ধারণা আছে? তুমি কি ইংরেজি উপন্যাস, নাটক, কবিতা পড়েছো কখনও?"

"আমি 'বা বা, ব্লাক শিপ' আবৃত্তি করতে পারি, এটাকে যদি আপনি ইংরেজি কবিতা বলেন তো পড়েছি।"

দর্শক হেসে ফেললো।

"আমাকে স্বীকার করতেই হচ্ছে আমি আসলে তারচেয়েও কঠিন কিছুকে বোঝাচ্ছিলাম। বাদ দাও। তুমি নিশ্চয় শেক্সপিয়ারের নাম শুনেছো?"

"শেখ কি?"

"তুমি ইংরেজি সাহিত্যের মহান নাট্যকারকে চেনো না? ওহ্ আমি যদি আমার কলেজ জীবনে ফিরে যেতে পারতাম! সেই সময় আমি অনেকগুলো শেক্সপিয়ারের নাটকে অভিনয় করেছিলাম। হ্যামলেট-এর নাম তো শুনেছো? 'টুবি অর নট টুবি দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন।' অনেক পেচাল হয়েছে। এবার আসল কাজে আসি। দশ কোটি রুপির প্রশ্ন। শেক্সপিয়ারের কোন্ নাটকে আমরা কস্টার্ড চরিত্রটি পাই? এ) কিং লিয়ার, বি) দ্য মার্চেন্ট অব ভেনিস, সি) লাভ্স লেবার্স লস্ট, নাকি ডি) ওথেলো?"

মিউজিক বাজতে শুরু করলো। আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে প্রেম কুমার। "আমাকে বলো, মিঃ টমাস, আমি যা বললাম সে ব্যাপারে কি তোমার কোনো ধারণা আছে?"

"না।"

"না? তাহলে তুমি কী করবে? তোমাকে তো একটা না একটা জবাব দিতেই হবে। এমন কি সেটা কয়েন দিয়ে টস্ করে হলেও। কে জানে, ভাগ্য ভালো থাকলে সঠিক জবাব দিয়ে তো বসতে পারো। জিতে যেতে পারো দশ কোটি রুপি। তাহলে তোমার সিদ্ধান্ত কি?"

আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না। বুঝতে পারছি অবশেষে আমাকে কোণঠাসা ক'রে ফেলা হয়েছে। ত্রিশ সেকেন্ড ধরে ভাবলাম, তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম আমি। "আমি একটা লাইফবোট ব্যবহার করবো।"

আমার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে প্রেম কুমার তাকালো। মনে হয় সে ভুলেই গেছে লাইফবোট নামের একটা অপশন আছে এই অনুষ্ঠানে। একটু পরই সে ধাতস্থ হলো। "লাইফবোট? হ্যা। অবশ্যই। তোমার দুটো লাইফবোটই তো অক্ষত আছে। তাহলে কোন্টা ব্যবহার করবে? হাফ অ্যান্ড হাফ নাকি ফর এ ফ্রেইন্ডলি টিপ?"

আমি আবারো ধন্দে পড়ে গেলাম। কার কাছে আমি এই প্রশ্নের জন্যে সাহায্য চাইবো? সেলিমের কথা তো বাদই দিলাম। জিমি'স বারের মালিক শেক্সপিয়ার সম্পর্কে ততোটুকুই জানে একজন মাতাল যতোটুকু জানে কোন্টা কোন্ দিক। ধারাবি বস্তিতে ইংরেজি সাহিত্যানুরাগী পাওয়া পুলিশের মধ্যে সৎ লোক পাওয়ার মতোই বিরল ব্যাপার। কেবলমাত্র আমার জানা ফাদার টিমোথিই এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তো আর জীবিত নেই। আমি কি হাফ অ্যান্ড হাফ ব্যবহার করবো? আমি আমার শার্টের পকেটে

হাত ঢুকিয়ে আমার বিশ্বস্ত লাকি কয়েনটা বের করতে গিয়ে একটা কার্ডের দেখা পেলাম। একটা ভিজিটিং কার্ড, যাতে বলা আছে 'উৎপল চ্যাটার্জি, ইংলিশ শিক্ষক, সেন্ট জন স্কুল, আগ্রা।' তার নিচে একটা ফোন নাম্বারও দেয়া আছে। প্রথমে আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। এ নামে তো কাউকে আমি চিনি না। তারপরই আচম্‌কা মনে পড়ে গেলো আগ্রার হাসপাতালে সেই ঘটনাটার কথা। আমার অজান্তেই আমার মুখ দিয়ে একটা শব্দ বেরিয়ে গেলো।

প্রেম কুমার সেটা শুনতে পেয়ে আমার দিকে ভুরু কুচকে তাকালো। "বুঝলাম না, কী বললে?"

"আমি বলতে চাচ্ছি এই ভদ্রলোককে কি ফোন করা যাবে?" কার্ডটা প্রেম কুমারের হাতে দিলাম। "আমি ফ্রেইন্ডলি টিপ লাইফবোটটি ব্যবহার করবো।"

প্রেম কুমার কার্ডটা হাতে নিয়ে দেখলো। "আচ্ছা। তাহলে তুমি এমন কাউকে চেনো যে কিনা তোমাকে এই প্রশ্নের ব্যাপারে সাহয্য করতে পারবে।" তার চোখেমুখে উদ্বিগ্নতার ছাপ স্পষ্ট। প্রযোজকের দিকে তাকিয়ে সে ইশারা করলে ভদ্রলোক হাত তুলে সায় দিতেই 'লাইফবোট' লেখাটি পর্দায় ভেসে উঠলো।

ডেস্কের নীচ থেকে প্রেম কুমার একটা কর্ডলেস ফোন তুলে নিয়ে আমার দিকে বাড়িয়ে দিলো। "এই নাও। যাকে খুশি তাকে তুমি ফোন করতে পারো। তবে সময় পাবে মাত্র দু'মিনিট। তোমার সময় শুরু হলো," সে তার ঘড়ির দিকে তাকালো, "এখন থেকে...!"

আমি কার্ডের নাম্বারটা ডায়াল করলে ফোনের অপর প্রান্তে, আগ্রায় রিং হতে শুরু করলো। কিন্তু রিংই হচ্ছে। কেউ ধরছে না। এভাবে আধ মিনিট পার হয়ে গেলো। স্টুডিওতে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে এখন। দম বন্ধ অবস্থা। এমন কি দর্শকদেরও দম আঁটকে আছে যেনো। তাদের কাছে আমি সার্কাসের সেই লোক যে কিনা একটা দড়ির উপর দিয়ে হেটে যাচ্ছে। একটু এদিক ওদিক হলেই পড়ে যাবে নিচে। আর নব্বই সেকেন্ড আছে কোটি কোটি রুপি হারানোর জন্যে। এখন আমার হাতে এক মিনিটের মতো সময় বাকি আছে। "হ্যালো?"

"হ্যালো। আমি মিঃ উৎপল চ্যাটার্জির সাথে একটু কথা বলতে পারি?" আমি খুব দ্রবত বললাম।

"আমিই উৎপল চ্যাটার্জি বলছি।"

"মিঃ চ্যাটার্জি, আমি রাম মোহাম্মদ টমাস।"

"রাম মোহাম্মদ...কি?"

"টমাস। আপনি হয়তো আমাকে আমার নামে চেনেন না, তবে আমিই সেই ছেলে যে আপনাকে সিংহানিয়া হাসপাতালে সাহায্য করেছিলাম। আপনার ছেলে তখন সেখানে ভর্তি ছিলো। চিনতে পেরেছেন?"

"হায় ঈশ্বর।" আচম্‌কা লোকটার কণ্ঠস্বর পাল্টে গেলো। "আরে চার মাস ধরে আমি তোমাকে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে বেড়াচ্ছি। তোমাকে ধন্যবাদ যে আমাকে ফোন করেছো। তুমি আমার ছেলের জীবন বাঁচিয়েছো। তুমি জানো না আমি—"

আমি তাকে থামিয়ে দিলাম। "মিঃ চ্যাটার্জি, আমার হাতে বেশি সময় নেই। আমি একটা কুইজ শোতে আছি। আমি চাই আপনি আমাকে চট জলদি একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে সাহায্য করুন।"

"একটা প্রশ্ন? হ্যা। অবশ্যই। বলো কি সেটা?"

মাত্র তিরিশ সেকেন্ড বাকি আছে। সবার চোখ ঘড়ির দিকে।

"জলদি বলুন। শেক্সপিয়ারের কোন্ নাটকে কস্টার্ড নামের চরিত্রটি আছে? এটা কি এ) কিং লিয়ার, বি) দ্য মার্চেন্ট অব ভেনিস, সি) লাভ্‌স লেবার্‌স লস্ট নাকি ডি) ওথেলো?"

চ্যাটার্জি কিছু বলছে না। ওপাশ থেকে নীরবতা নেমে এলো যেনো।

"মিঃ চ্যাটার্জি, আপনি কি উত্তরটা আমাকে বলতে পারবেন?"

মাত্র পনেরো সেকেন্ড বাকি আছে। ঠিক তখনই চ্যাটার্জি জবাব দিলো, "আমি জানি না।"

আমি যারপরনাই হতাশ। "কি?"

"আমি দুঃখিত, উত্তরটা আমার জানা নেই। মানে আমি নিশ্চত নই আর কি। মার্চেন্ট অব দি ভেনিস কিংবা ওথেলো'তে এ নামে কোনো চরিত্র আছে কিনা আমার জানা নেই। হয় কিং লিয়ার নয়তো লাভ্‌স লেবার্‌স লস্ট, এ দুটোর মধ্যে যেকোনো একটি হবে। তবে আমি নিশ্চিত নই কোন্‌টা।"

"আমাকে তো একটা উত্তর দিতে হবে।"

"তাহলে লাভ্‌স লেবার্‌স লস্ট। তবে যেমনটি বলেছি, আমি একদম নিশ্চিত নই। দুঃখিত, খুব বেশি সাহায্যে আসতে—"

প্রেম কুমার মাঝখানে বাঁধা দিয়ে বললো, "দুঃখিত, মিঃ টমাস। তোমার দু'মিনিট শেষ হয়ে গেছে। এখন তোমাকে উত্তরটা দিতে হবে।"

স্টুডিওর মিউজিক শুনে আমার কাছে সেটাকে আর সাসপেন্সের ব'লে মনে হলো না। সেটা এখন ইতিবাচকভাবেই ভয়ঙ্কর শোনাচ্ছে। আমি বেশ গভীরভাবে মনোযোগ দিয়ে ভাবলাম।

"মিঃ টমাস, তুমি মিঃ চ্যাটার্জিকে কতো দিন ধরে চেনো?" প্রেম কুমার জানতে চাইলো।

"তার সাথে আমার মাত্র একবারই দেখা হয়েছে।"

"উনি ইংরেজির শিক্ষক হিসেবে কেমন?"

"আমার কোনো ধারণা নেই।"

"তাহলে তার জবাবের উপর কি তুমি আস্থা রাখতে পারবে, নাকি তোমার যেটাকে সঠিক ব'লে মনে হয় সেটাই বলবে?"

আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। "আমার কাছে যেটা সঠিক মনে হয় আমি সেটাই বলবো। আর আমার কাছে মনে হচ্ছে মিঃ চ্যাটার্জির জবাবই সঠিক। সি। লাভ্স লেবার্স লস্ট।"

"আরেকবার ভেবে দ্যাখো। মনে রেখো, ভুল জবাব দিলে তুমি দশ কোটি রুপি হারাবে।"

"তারপরেও আমি বলবো, আমার জবাব হবে 'সি'।"

"তুমি কি একশত ভাগ নিশ্চিত?"

"হ্যা।"

"আমি আবারো তোমাকে বলছি। তুমি কি পুরোপুরি নিশ্চিত?"

"হ্যা।"

ড্রামের শব্দ বেজে উঠলো। সঠিক জবাবের লেখাটি ভেসে উঠলো পর্দায়।

"ওহ্ গড! তোমার জবাব সঠিক। একদম ঠিক!" প্রেম কুমার উঠে দাঁড়ালো। "রাম মোহাম্মদ টমাস, তুমি এই শোয়ের প্রথম ব্যক্তি যে একশ মিলিয়ন রুপি জিতেছো। লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলমেন, ইতিহাস সৃষ্টি হয়ে গেছে! এখন আমাদেরকে একটা বিরতিতে যেতে হবে।"

দর্শক যেনো পাগল হয়ে গেলো। সবাই আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাত তালি দিতে শুরু করলো প্রায় মিনিটখানেক সময় ধরে। প্রেম কুমারের চেহারাটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। কপাল বেয়ে দরদর ক'রে ঘাম পড়ছে তার।

"তো, কেমন লাগছে তোমার?" সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো।

"জি-জ্যা-ই-হিশ্!" আমি বললাম।

প্রেম কুমার বোকা বনে গেলো। "কী বললে?"

"বললাম খুব দারুণ লাগছে," জবাবে বললাম। উপরে তাকালাম আমি। দেখতে পেলাম শংকর আমার দিকে চেয়ে হাসছে। মনে হচ্ছে দূর্গা দেবি আজ রাতে আসলেই আমার দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছে।

প্রশ্ন নাম্বার তেরো

আমরা এখনও বিজ্ঞাপন বিরতিতে আছি। এক কোণে গিয়ে লম্বা চুলের প্রডিউসারের সাথে প্রেম কুমার শলাপরামর্শ করছে। আমি স্টুডিওর চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম। ক্যামেরা, লাইট, হাইটেক সাউন্ড সিস্টেম ইত্যাদি। দর্শকদের অনেকেই আমাকে দেখছে, সম্ভবত ভাবছে আমার মনে কী ভাবনা খেলে যাচ্ছে।

প্রেম কুমার শলাপরামর্শ শেষে আমার কাছে এলো। তার মুখে তেতো একটা হাসি।

"টমাস, আমরা জানি না তুমি এ পর্যন্ত কি ক'রে এগারোটি প্রশ্নের জবাব দিতে পারলে। কিন্তু শেষ প্রশ্নটি তুমি কোনোভাবেই জবাব দিতে পারবে না।

"দেখি পারি কিনা।"

"আমিও দেখবো। সব হারাবার প্রস্তুতি নিতে পারো," নিজের আসনে বসতে বসতে বললো প্রেম কুমার।

হাত তালি দেবার সংকেত দেয়া হলো। বেশ জোরেই হাত তালি দিলো উপস্থিত দর্শকেরা। প্রেম কুমার ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে বললো, "লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলমেন, আমরা ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি। রাম মোহাম্মদ টমাস, আঠারো বছর বয়সী মুম্বাইয়ের একজন ওয়েটার এই শোয়ে এখন পর্যন্ত যে জায়গায় এসেছে সেখানে এর আগে আর কেউ আসতে পারে নি। সে এখন আরেকটি মাইলস্টোন সৃষ্টি করতে যাচ্ছে। সে যদি এই শেষ প্রশ্নটির জবাব ঠিক ঠিক দিতে পারে তবে সে হবে ইতিহাসের সবচাইতে বড় গেম শোয়ের বিজয়ী। সেই সাথে পাবে এক বিলিয়ন রুপি। কিন্তু সে যদি সঠিক জবাব দিতে না পারে মুহূর্তেই সে হারাবে একশো মিলিয়ন রুপি। সেটাও হবে একটা রেকর্ড। যেভাবেই হোক, আজ একটা রেকর্ড হবেই। সুতরাং আপনারা ঠিকঠাক মতো বসে পড়ুন। গভীর মনোযোগের সাথে এই শেষ কয়েকটি মুহূর্ত অবলোকন করুন। সেলুট জানান আমাদের আজকের প্রতিযোগী রাম মোহাম্মদ টমাসকে!"

সমস্ত দর্শক এমনকি প্রেম কুমার নিজেও উঠে দাঁড়িয়ে হাত তালি দিতে লাগলো।

অনুষ্ঠানের কৌশলটাকে সাধুবাদ না জানিয়ে পারলাম না। এই শো থেকে খালি হাতে ফেরার আগে আমাকে একটু বিখ্যাত করা হচ্ছে। অনেকটা ছাগলের মতো, জবাই করার আগে নাদুস নুদুস করা আর কি। এর পরের প্রশ্নেই আমাকে জবাই করা হবে। যে মুহূর্তের জন্যে আমি অপেক্ষা ক'রে আছি, সেটা অবশেষে ঘনিয়ে এসেছে। গভীর করে দম নিয়ে আমি আমার নিয়তির জন্যে প্রস্তুত হয়ে নিলাম।

"লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলমেন, আমি বারো নাম্বার প্রশ্নটি করতে যাচ্ছি। শেষ প্রশ্ন। এক বিলিয়ন রুপির জন্যে। এই দুনিয়াতে এতো বড় অঙ্কের টাকা আর কোনো গেমশো'তে হয় নি। আর মনে রাখবেন, আমরা এখন আছি চূড়ান্ত পর্বে। এখন হয় সব জিততে হবে নয়তো একেবারে খালি হাতে ফিরে যেতে হবে। ঠিক আছে। আর কোনো কথা নয়। এবার তোমার জন্যে শেষ প্রশ্ন, রাম মোহাম্মদ টমাস। আর এটা এসেছে...ইতিহাস থেকে! আমরা সবাই জানি মুমতাজ মহল হলেন শাহজানের স্ত্রী। তার স্মরণেই সম্রাট বিখ্যাত তাজ মহল বানিয়েছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো মুমতাজ মহলের বাবার নাম কি ছিলো? এটা কিন্তু এক বিলিয়ন রুপির প্রশ্ন। তোমার চয়েজগুলো হলো, এ) মির্জা আলী কুলি বেগ, বি) সিরাজদ্দৌলা, সি) আসাফ ঝাঁ, নাকি ডি) আব্দুর রহিম খান খানান?

"খুব ভালো ক'রে প্রশ্নটা খেয়াল করো, রাম মোহাম্মদ টমাস। তুমি দাঁড়িয়ে আছো ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে। আমি জানি তুমি এটা জবাব দেবে একটু ভেবে চিন্তে। আমরাও চাই তুমি ভেবেচিন্তে জবাবটা দাও। সুতরাং তোমার স্বার্থে আমরা ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতি নেবো। আপনারা কোথাও যাবেন না। আমরা এক্ষুণি ফিরে আসবো।"

আমার দিকে তাকিয়ে প্রেম কুমার দাঁত বের ক'রে হাসলো। "কি, বলেছিলাম না? তুমি মধ্যযুগের ইতিহাসের উপর এম.এ ডিগৃধারী যদি না হও তবে এই প্রশ্নের জবাব কোনোভাবেই দিতে পারবে না। সুতরাং এখান থেকে কানাকড়িও তোমার জুটছে না। ফিরে যাও আবার সেই ওয়েটারের জীবনে। কে জানে, আগামীকাল হয়তো আমি নিজেও জিমি'স বারে আসতে পারি। আমাকে তুমি কি সার্ভ করবে? বাটার চিকেন আর ল্যাম্ব ভিনডালু?" হেসে উঠলো সে।

আমিও পাল্টা হাসলাম। "হা! আমার তো কোনো এমএ ডিগৃ নেই। তবে আমি এই প্রশ্নের জবাবটা জানি।"

"কি? ঠাট্টা করছো, তাই না?"

"ঠাট্টা নয়। সঠিক জবাব হলো আসফ ঝাঁ।"

প্রেম কুমারকে একেবারে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে এখন। "কিভাবে...কিভাবে তুমি এটা জানো?"

"আমি জানি কারণ আমি একজন গাইড হিসেবে দু'বছর তাজমহলে কাজ করেছি।"

এবার প্রেম কুমারের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেলো। এই প্রথম আমার দিকে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকালো সে। "তুমি...মনে হচ্ছে তুমি একধরণের জাদু দেখাচ্ছো, আমি নিশ্চিত," কথাটা বলেই সে প্রডিউসারের কাছে ছুটে গেলো। নিজেদের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা বললো তারা। আমার দিকে কয়েকবার ইঙ্গিত করলো প্রেম কুমার। এরপর তারা একটা মোটা বই নিয়ে এসে সেটার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো। দশ মিনিট পার হয়ে গেলো এভাবে। অস্থির হয়ে উঠলো দর্শক শ্রোতারা। এ পর্যায়ে প্রেম কুমার নিজের সিটে ফিরে এসে বসলো। তার মুখ দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। তবে আমি নিশ্চিত সে ভীষণ ভাবনায় পড়ে গেছে।

আবারো হাত তালি দেবার ইঙ্গিত করা হলে সিগনেচার টিউনটা বাজতে শুরু করলো।

"লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলমেন। আমরা ব্রেকে যাবার আগে আমি একটা প্রশ্ন করেছিলাম, মুমতাজ মহলের বাবার নাম কি? আমি নিশ্চিত আপনরা ভেবেছেন এটাই শেষ প্রশ্ন। কিন্তু তা নয়।"

দর্শক একেবারে থ বনে গেলো। আমি নিজেও হতবাক। তারা কি আরেকটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছে? টেনশনে বাতাস ভাবি ঠেকলো আমার কাছে।

প্রেম কুমার বলতে লাগলো। "এটা কেবল শেষ প্রশ্নই নয়, বরং এটা আসলে কোনো প্রশ্নই ছিলো না। আমরা আসলে মুমতাজ চায়ের একটা বিজ্ঞাপন রেকর্ড করছিলাম, যারা কিনা আমাদের অন্যতম একটি স্পন্সর। এজন্যে আমাদেরকে একটা ডামি প্রশ্ন করতে হয়েছে।"

দর্শকদের মধ্যে অনেকেই ফিসফাস্ করতে শুরু ক'রে দিলো। মুখ চেপে কেউ কেউ হাসছেও। আবার কয়েকজন চিৎকার ক'রে বললো, "আপনি সত্যি আমাদেরকে বোকা বানিয়েছেন, মিঃ প্রেম কুমার!" টেনশনটা কমে এলো। স্টুডিও সাইনটা আবারো হাত তালি দিতে বলছে।

একমাত্র আমিই কেবল হাসছি না। এখন আমি বুঝে গেছি এই শো'টা আসলেই প্রতারকরা চালিয়ে থাকে।

সিগনেচার টিউনটা বাজতে শুরু করলে দর্শকেরা হাত তালি থামিয়ে

দিলো। ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে প্রেম কুমার বললো, "লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলমেন, এখন আমি প্রশ্ন নাম্বার বারো করতে যাচ্ছি। এটাই আমাদের শেষ প্রশ্ন। এক বিলিয়ন রুপির জন্যে। মিঃ টমাস, এই প্রশ্নটি ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের ক্ষেত্র থেকে এসেছে! বিটোফেনের পিয়ানো সোনাটা নাম্বার ২৯, ওপাস ১০৬, যা কিনা 'হ্যামারক্লাভিয়ার সোনাটা' নমেও সমধিক পরিচিত, সেটা কোন কি থেকে শুরু হয়? এটা কি এ) বি ফ্ল্যাট মাইনর, বি) জি মাইনর, সি) ই ফ্ল্যাট মেজর, নাকি ডি) সি মাইনর?

"মনোযোগ দিয়ে সতর্কভাবে জবাব দিও। মনে রাখবে তুমি এখন ঐতিহাসিক এক মুহূর্তের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছো। এটা তোমার জীবনের সবচাইতে স্মরণীয় ঘটনা। আমি জানি জবাবটা দেবার জন্যে তোমাকে একটু সময় নিতে হবে। এজন্যেই আমরা ছোট্ট একটা বিরতিতে যাচ্ছি। লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলমেন, ভুলেও কোথাও যাবার চিন্তা করবেন না। আমরা এক্ষুণি ফিরে আসছি।"

প্রেম কুমার আমার দিকে তাচ্ছিল্যভরে তাকালো। দর্শকেরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে এখন।

উঠে দাঁড়ালো প্রেম কুমার। "আমি একটু আসছি।"

আমিও উঠে দাঁড়ালাম। "আমাকে টয়লেটে যেতে হবে।"

"তাহলে আমার সাথেই যেতে হবে," বললো সে। "শোয়ের নিয়ম হলো প্রতিযোগীকে আমাদের কারোর সাথেই সবখানে যেতে হবে।"

* * *

স্টুডিওর ফ্লুরোসেন্ট বাতির ওয়াশরুমে আছি আমি। জায়গাটা একেবারেই পরিস্কার। সাদা টাইলস্‌গুলো চকচক করছে। বিশাল একটা আয়না আছে সেখানে। কিন্তু দেয়ালে কোনো আঁকিবুকি নেই।

আমি আর প্রেম কুমারই কেবল আছি সেখানে। প্রশ্রাব করতে করতে সে শিষ বাজাচ্ছে। এরপরই খেয়াল করলো আমি তার দিকে তাকিয়ে আছি। "তুমি দাঁড়িয়ে আছো কিভাবে? আমাকে আবার বোলো না শেষ প্রশ্নটা এতোটাই কঠিন মনে হচ্ছে যে, কিভাবে মুততে হবে সেটাও ভুলে গেছো।" কথাটা বলেই হেসে ফেললো সে। "এভাবে শেষ হচ্ছে বলে খুব খারাপ লাগছে। কিন্তু আমার সাহায্য ছাড়া তুমি অনেক আগেই বিদায় হতে। দ্বিতীয় প্রশ্নটার কথা বলছি আর কি। এর অর্থ হলো তুমি মাত্র এক হাজার রুপি নিয়ে

বাড়ি ফিরতে। তো আমরা একটা চুক্তি করলে কেমন হয়? আগামীকাল যখন আমি তোমার রেস্টুরেন্টে আসবো তোমাকে আমি এক হাজার রুপি বখশিস দেবো। কথা দিচ্ছি। তুমিও জানো আমি আমার কথা রাখবো।" আমাকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে হাসলো সে।

"দ্বিতীয় প্রশ্নটার জবাব আমাকে জানিয়ে দিয়ে আপনি আমার কোনো উপকার করেন নি। আপনি নিজেই আপনার উপকার করেছেন," বললাম আমি।

আমার দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকালো প্রেম কুমার। "কি বলতে চাচ্ছো?"

"আমি বলতে চাচ্ছি মিঃ প্রেম কুমার, টাকার জন্যে আমি আপনার শো'তে আসি নি। না, কোনোভাবেই না," আমি তীব্রভাবে আমার মাথা নাড়লাম। "আমি আপনার শো'তে এসেছি প্রতিশোধ নেবার জন্যে।"

মাঝপথেই প্রেম কুমার তার প্রশ্রাব করা থামিয়ে দিলো। তাড়াহুড়া করে জিপার লাগাতে লাগাতে এক দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলো সে। "প্রতিশোধ? কি বলতে চাচ্ছো? কার উপরে প্রতিশোধ?"

"আপনার উপরে," আমি দৃঢ়তার সাথে বলে একটু পিছিয়ে গিয়ে আমার কোমরের বেল্টে গুঁজে রাখা রিভলবারটা বের করলাম। খুবই ছোটোখাটো একটা অস্ত্র। ব্যারেলটা একেবারেই ছোটো। আমার হাতের তালুর সমান হবে জিনিসটা। তার দিকে তাক্ করলাম সেটা।

প্রেম কুমারের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেলো। "তুমি...তুমি ভুল করছো, মিঃ টমাস। এর আগে আমাদের কখনও দেখাই হয় নি," ফিস্‌ফিসিয়ে বললো সে।

"না, ভুল আপনি করছেন। আমাদের একবার দেখা হয়েছিলো, নিলীমা কুমারীর ফ্ল্যাটের সামনে। খুব সকালে। সাদা শার্ট আর নীল রঙের জিন্স পরেছিলেন আপনি। আপনার চুলগুলো ছিলো উসকোখুসকো, চোখ দুটো একেবারে লাল। আপনার হাতে কতোগুলো নোট ছিলো। আপনার আরেক হাতে ছিলো গাড়ির চাবি। আপনি তাকে শেষ করে ফেলেছেন। কিন্তু সেটাও আপনার কাছে যথেষ্ট বলে মনে হয় নি। আপনি আমার প্রাণপ্রিয় নিতার সাথেও একই কাজ করেছেন।"

"নিতা?" প্রেম কুমার ভুরু তুলে বললো। "এ নামে কাউকে তো আমি চিনি না।"

"আগ্রাতে ঐ মেয়েটা আপনার হাতে মরতে বসেছিলো," আমি অস্ত্রটা শক্ত করে ধরে বললাম, "এবার আপনার পালা।"

আমার হাতের দিকে প্রেম কুমার উদ্বিগ্ন হয়ে তাকালো। একটু ভেবে বললো, "আগ্রার কথা বলছো? আমি তো কয়েক মাস ধরে আগ্রায় যাই নি।"

"তাহলে আপনার স্মৃতিটাকে একটু চাগিয়ে দেই। চার মাস আগে আপনি প্যালাস হোটেলে অবস্থান করছিলেন। নিজের রুমে এক মেয়েকে ডেকে পাঠান আপনি। তাকে হাত পা বেধে প্রচণ্ড মারধোর করেন, জ্বলন্ত সিগারেট দিয়ে তার সারা শরীর ঝলসে দেন। ঠিক যেমনটি করেছিলেন নিলীমা কুমারির সাথে।"

আমি তার ঠোঁট দুটো কাঁপতে দেখলাম।

"আরে ঐ মেয়েটা তো বেশ্যা ছিলো। আমি তার দালালকে পাঁচ হাজার রুপি দিয়েছিলাম। তার নামটা পর্যন্ত আমার মনে নেই।"

"তার নামই নিতা।" অস্ত্রটা তার কপাল বরাবর তাক্ করলাম।

আমার সামনে হাতের তালু বাড়িয়ে দিয়ে প্রেম বললো, "না...না..." চিৎকার করে পিছু হটে গেলো সে। তার ডান পা'টা তার পেছনের ড্রেনে ঢুকে গেলো। "গুলি কোরো না—এই জিনিসটা এক্ষুণি ফেলে দাও। প্লিজ।" ডান পা'টা ড্রেন থেকে তুলে নিলো প্রেম কুমার।

ঠিক তার বুকে অস্ত্রটা তাক করলাম এবার। তার কাঁপুনিটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এখন। "আমি কসম খেয়েছিলাম, নিতার ক্ষতি যে লোক করেছে তার উপর আমি প্রতিশোধ নেবোই। কিন্তু কিভাবে খুঁজে পাবো জানতাম না। তারপরই আগ্রায় এক সংবাদপত্রে একটা বিজ্ঞাপন দেখলাম। ওটাতে আপনার ছবি ছিলো। বানরের মতো হাসছেন। মুম্বাইতে এক কুইজ শো'র জন্যে লোকজনকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। এজন্যেই আমি এখানে এসেছি। প্রথম প্রশ্নটির জবাব দিতে না পারলে তখনই আমি আপনাকে গুলি করতাম। কিন্তু অলৌকিকভাবে আমি প্রায় সবগুলো প্রশ্নের উত্তরই সঠিক দিতে লাগলাম। সুতরাং দ্বিতীয় প্রশ্নটির জবাব দেবার জন্যে আপনি যে আমাকে সাহায্য করেছেন সেটা আদতে আমাকে নয় বরং আপনি নিজেকেই সাহায্য করেছেন। নিজেকে আরো বেশিক্ষণ বাঁচিয়ে রাখার মাধ্যমে। এখন আর কোনো পালাবার উপায় নেই।"

"আমার কথা শোনো," প্রেম কুমার অনুনয় করে বললো। একেবারেই ভেঙে পড়েছে সে। "আমি নিলীমার সাথে বাজে ব্যবহার করেছি। আগ্রার ঐ বেশ্যার সাথেও জঘন্য কাজ করেছি। কিন্তু আমাকে গুলি করে তুমি কী এমন লাভবান হবে? তুমি তোমার টাকা পাবে না। অস্ত্রটা নামিয়ে রাখো। কথা দিচ্ছি, তোমাকে শো'তে জয় লাভ করার জন্যে আমি সহায্য করবো। একবার ভাবো, একজন ওয়েটার হিসেবে তুমি এতো টাকা পাবে যে এই জীবনে কখনও চিন্তা করতেও পারবে না।"

তাচ্ছিল্যভরে আমি হেসে উঠলাম। "এতো টাকা দিয়ে আমি কি করবো? শেষ পর্যন্ত একজন মানুষের তো সাড়ে তিন হাতের বেশি কাপড়ও লাগে না।"

মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো তার। দু'হাত দিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টায় মুখ ঢেকে রাখলো সে। "প্লিজ, গুলি কোরো না। ভেবে দেখো, আমাকে গুলি করার পরই তোমাকে পুলিশ গ্রেফতার করবে। তারপর ফাঁসিতে ঝুলে মরবে তুমি। তুমিও তো মারা যাবে।"

"তাতে কি? আমি তো প্রতিশোধ নেবার জন্যেই বেঁচে আছি।"

"টমাস, আরেকবার ভেবে দ্যাখো। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, আমার জীবন রক্ষা করলে আমি তোমাকে প্রশ্নের জবাবটি জানিয়ে দেবো। তুমি হবে এই দুনিয়ার সবচাইতে বড় গেম শো'র বিজয়ী।"

"আমি কুইজ শো'তে আর ফিরে যাচ্ছি না, আপনিও যাচ্ছেন না," কথাটা বলেই সেফটি ক্যাচটা সরিয়ে ফেললাম। প্রেম কুমার রীতিমতো থর থর করে কাঁপছে এখন। কাপুরুষের মতো লাগছে তাকে। ভয়ে দু'চোখ বন্ধ করে ফেললো সে। চার মাস ধরে আমার অপেক্ষা করার মুহূর্তটি অবশেষে এসে গেলো। অস্ত্র হাতে আমি প্রেম কুমারকে আঁটকে রেখেছি। আমার হাতের অস্ত্রটি বেশ ভালো। একটা বুলেট টেস্ট করার জন্যে ফায়ার করেছিলাম। খুব কমই ঝাঁকি খেয়েছি। পয়েন্ট ব্লাঙ্ক রেঞ্জে আমি কোনোভাবেই ব্যর্থ হবো না।

কিন্তু আমি ট্রিগার টানার চেষ্টা করলেও সেটা যেনো আসছে না। মনে হচ্ছে যতোই আমি টানতে চাচ্ছি ততোই সেটা শক্ত হয়ে আঁটকে যাচ্ছে। আমার হাতের আঙুলগুলো যেনো পাথর হয়ে গেছে।

ফিল্মে লোকজনকে পাখির মতো পটাপট মারতে দেখা যায়। ধূম ধূম...এমনকি একেবারে নতুন হিরো পর্যন্ত, যেকিনা জীবনে অস্ত্র ধরে নি সেও পাঁচশ ফুট দূর থেকে ভিলেনের ডেরায় ঢুকে দশ বারোজনকে খতম করে দিতে পারে। কিন্তু বাস্তব জীবন একেবারেই আলাদা। অস্ত্র তুলে নেয়াটা খুব সহজ কিন্তু জীবন্ত একজন মানুষকে নিজ হাতে চোখের সামনে খুন করাটা ভিন্ন একটি ব্যাপার। মানুষ মারা অতো সহজ নয়। প্রথমে তোমাকে নিজের মস্তিষ্কটাকে বন্ধ করতে হবে, মদ খেলে হয়তো সেটা করা সম্ভব। রাগের সাহায্যেও সেটা করা যায়।

সুতরাং আমি নিজের মধ্যে প্রচণ্ড রাগ জমানোর চেষ্টা করলাম। নিলীমা কুমারি আর নিতার কথা ভাবলাম। দেখতে পেলাম নিলীমা কুমারির শরীরে সিগারেটের কালো দাগ। বেল্টের আঘাতে নিতার পিঠে লাল লাল দাগ। তার মুখে ঘুষি আর চড়থাপড়ের চিহ্ন। তার চোখের নিচে কালশিটে পড়ে গেছে। চোয়াল ভাঙা। কিন্তু রাগের বদলে আমার মধ্যে দুঃখবোধের আর্বিভাব ঘটলো। হাতটা কোনোভাবেই ট্রিগারে চাপ দিতে পারছে না। টের পেলাম দু'চোখ বেয়ে অশ্রুজল গড়িয়ে পড়ছে।

অন্য জায়গা থেকে সাহায্য পাবার জন্যে আমি চেষ্টা করলাম। আমি আমার জীবনের সমস্ত অপমান আর যন্ত্রণার কথা ভাবলাম। ফাদার টিমোথির মতো দয়ালু লোকের রক্তাক্ত মৃতদেহ চোখের সামনে ভেসে উঠলো। ভেসে উঠলো শংকর নামের সবচাইতে ভদ্র যে ছেলেটির সাথে আমার পরিচয় হয়েছিলো তার দোমড়ানোমোচড়ানো শরীরটা। স্বপ্না দেবি, শান্তারাম আর মামান আমার মাথায় ভন ভন করে ঘুরতে শুরু করলো। সমস্ত আবেগকে পুঁজি করে আমি ক্রোধে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তারপরেও বুঝতে পারলাম আমার পক্ষে কোনো লোককে ঠাণ্ডায় মাথায় খুন করা প্রায় অসম্ভব। এমনকি সেটা প্রেম কুমারের মতো জঘন্য লোক হলেও।

অস্ত্রটা নামিয়ে রাখলাম আমি।

পুরো ঘটনাটি ঘটেলো মাত্র আধ মিনিটে। প্রেম কুমার এই সময়টা চোখ বন্ধ ক'রে রেখেছিলো। কোনো গুলির শব্দ না শুনে এক চোখ খুললো। কুত্তার মতো ঘামছে সে। আমার দিকে তাকিয়ে সে কিছুই বুঝতে পারলো না।

এরপর দু'চোখই খুললো। "আমার জীবন বাঁচানোর জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ, টমাস," এক বুক দম নিয়ে কথাটা বললো সে। "এই ক্ষমা করার বিনিময়ে আমি তোমাকে শেষ প্রশ্নের উত্তরটা জানিয়ে দিচ্ছি। ইতিমধ্যে তুমি বেশ টাকা জিতে গেছো। মমতাজ মহলের প্রশ্নটিই আসলে শেষ প্রশ্ন ছিলো। তুমি সেটার সঠিক জবাবই দিয়েছিলে। এখন তোমাকে নতুন প্রশ্নটির জবাব জানিয়ে দিচ্ছি।"

"আমি কিভাবে জানবো শেষ মুহূর্তে আবার সেটা বদলে ফেলা হবে কিনা?"

"এই অস্ত্রটা তো তোমার কাছেই থাকবে। তবে আমাকে বিশ্বাস করো, এটা আর তোমাকে ব্যবহার করতে হবে না। এখন আমি আন্তরিকভাবেই চাই তুমি বিজয়ী হও। এক বিলিয়ন রুপি। পুরো এক বিলিয়ন। একেবারে নগদ।"

এই প্রথম আমি টাকার ব্যাপারে একটু লোভী হয়ে উঠলাম। এক বিলিয়ন রুপি দিয়ে আমি অনেক কিছু অর্জন করতে পারবো। নিতার মুক্তি কিনে নিতে পারবো অনায়াসে। সেলিমের নায়ক হবার স্বপ্নটাও পূরণ করতে পরাবো এ দিয়ে। আমার মতো এতিম আর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো লক্ষ লক্ষ পথশিশুদের জীবন পাল্টে দেওয়াও সম্ভব। চমৎকার লাল রঙের ফেরারি গাড়ির মালিক হতে পারবো আমি। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। এক বিলিয়নই সই। হত্যাকাণ্ডকে গুডবাই।

"ঠিক আছে, তাহলে উত্তরটা কি?" আমি জানতে চাইলাম।

"আমি তোমাকে বলবো," বললো প্রেম কুমার। সে তার পায়ের দিকে চেয়ে থেমে গেলো।

"সমস্যা কি?" আমি জানতে চাইলাম।

"আমি বুঝতে পারছি আমি যদি তোমাকে জবাবটা দিয়ে দিই তবে সেটা আমার সাথে এই অনুষ্ঠানের যে চুক্তি সেটার বরখেলাপ হবে। তোমার পুরস্কারটিও বাতিল করা হতে পারে।" আস্তে আস্তে মাথা দোলালো সে। "না। আমি তোমাকে উত্তরটা বলবো না।"

আমি বুঝতে পারছি না।

প্রেম কুমারের মুখে ক্ষীণ একটা হাসি দেখা গেলো। "আমি বলছি আমি উত্তরটা বলতে পারবো না, কিন্তু আকার ইঙ্গিতে বলতে তো কোনো সমস্যা নেই। আমার চুক্তিতে এটার উল্লেখ নেই। এবার মনোযোগ দিয়ে শোনো। ই শোয়ের পর আমি রেলস্টেশনে গিয়ে একটা ট্রেনে উঠবো। আমাকে এলাহাবাদ, বোরোদা, কোচিন আর দিল্লির চারজন বন্ধু দাওয়াত দিয়েছে। কিন্তু আমি যেতে পারবে যেকোনো একজনের কাছে। সুতরাং আমি ঠিক করেছি আমি এলাহাবাদই যাবো, সেখানে গিয়ে সঙ্গম নদীতে গোসল করে নিজের সমস্ত পাপ স্খলন করবো। ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে," আমি সায় দিয়ে বললাম।

আমরা বাথরুম থেকে ফিরে এসে নিজেদের সিটে বসলাম। প্রেম কুমার আমার দিকে এমনভাবে তাকালো যে আমার মনে হলো সে বুঝি তার কথা রাখতে পারবে না। আমি বসার সময় সব দর্শক হাত তালি দিলো দীর্ঘক্ষণ ধরে। আমার রিভলবারটা আমার সাইডপকেটে রাখা আছে। অস্বস্তি লাগছে খুব। সেটার উপরে হাত রেখে দিলাম আমি।

আমার দিকে ফিরলো প্রেম কুমার। "মিঃ রাম মোহাম্মদ টমাস, আমরা আমাদের শেষ বিরতিতে যাওয়ার আগে শেষ প্রশ্নটি অর্থাৎ এক বিলিয়ন রুপির জন্যে বারো নাম্বার প্রশ্নটি করেছিলাম। প্রশ্নটি আমি আবারো করছি। বিথোফেনের সোনাটা নাম্বার ২৯, ওপাস ১০৬, যা কিনা 'হামারক্লেভিয়ার সোনাটা' নামেও পরিচিত, সেটা কোন্ কর্ড থেকে শুরু হয়? এ) বি ফ্ল্যাট মেজর, বি) জি মাইনর, সি) এ ফ্ল্যাট মেজর নাকি ডি) সি মাইনর? তুমি কি জবাব দেবার জন্যে প্রস্তুত?"

"না।"

"না?"

"মানে আমি এই প্রশ্নের জবাব জানি না।"

আমার মুখের উপর ক্যামেরা জুম করা হলো। দর্শকদের মাঝখান থেকে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে।

"মিঃ টমাস, আমি যেমনটি তোমাকে বলেছি, তুমি দাঁড়িয়ে আছো ঐতিহাসিক এক মুহূর্তে। এক দিকে তুমি অকল্পনীয় সম্পদের মালিক হবে।

আর অন্য দিকে একেবারে খালি হাতে ফিরে যাওয়া। সুতরাং আন্দাজে জবাব দিলেও খুব সাবধানে দেবে। এটা হবে তোমার জীবনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত।"

"আমি আমার একটা লাইফবোট ব্যবহার করবো।"

"ঠিক আছে। তোমার হাতে এখনও একটা লাইফবোট বাকি আছে। আর সেটা হলো হাফ অ্যান্ড হাফ। তো এতে ক'রে দুটো ভুল জবাব উধাও হয়ে যাবে। বাকি থাকবে একটা সঠিক আর একটা ভুল জবাব। তখন তোমার কাছে ফিফটি ফিফটি অপশন থাকবে।"

পর্দায় লাইফবোট লেখাটা ভেসে উঠলো। আমরা দেখতে পেলাম একটা অ্যানিমেশন। একটা নৌকার কাছে সমুদ্রে এক সাঁতারু লাইফবোটের জন্যে চিৎকার করলে তাকে একটা লাল টকটকে লাইফবয় ছুঁড়ে দেয়া হলো। পর্দাটা বদলে পুরো প্রশ্নটি আবার ভেসে উঠলো। দুটো উত্তর উধাও হয়ে গেলো, বাকি রইলো এ এবং সি।

"এই হলো তোমার অপশন," বললো প্রেম কুমার। "হয় এ, না হয় সি। আমাকে সঠিক জবাব দিয়ে ইতিহাসের সবচাইতে বড় অঙ্কের টাকা জিতে নাও। আর যদি ভুল জবাব দাও তাহলে সেটাও হবে ইতিহাস। সবচাইতে বড় অঙ্কের টাকা হারানোর ইতিহাস। তোমার সিদ্ধান্তটা কি?"

আমি আমার এক রুপির লাকি কয়েনটা বের করলাম। "হেড পড়লে আমার জবাব হবে এ। আর টেইল পড়লে সি। ঠিক আছে?" আমার দুঃসাহসে দর্শকশ্রোতা আৎকে উঠলো যেনো। প্রেম কুমার মাথা নাড়তে লাগলো। চোখ দুটো আবার চকচক করতে শুরু করলো তার।

আমি কয়েনটা টস্ করলাম।

সবার চোখ এখন কয়েনটার দিকে। সময় যেনো প্রলম্বিত হয়ে গেছে। এটা হবে ইতিহাসের একমাত্র এক রুপি যার মূল্য এক বিলিয়ন রুপি। আমার ডেস্কে পড়ে কয়েনটা ঘুরতে ঘুরতে স্থির হলে প্রেম কুমার ঝুঁকে দেখে বললো, "হেড পড়েছে!"

"তাহলে আমার জবাবটাও হবে এ।"

"তুমি কি একশ ভাগ নিশ্চিত, মিঃ টমাস? ইচ্ছে করলে এখনও তুমি সি বলতে পারো।"

"কয়েনটাই আমার হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। আমি বলবো এ।"

"তুমি একেবারে নিশ্চিত?"

"হ্যা। আমি একশত ভাগ নিশ্চিত।"

ড্রাম বেজে উঠলো। শেষ বারের মতো পর্দায় ভেসে উঠলো সঠিক

জবাবের সাইনটি।

"আ! একদম সঠিক জবাব! মি: রাম মোহাম্মদ টমাস, তুমি এইমত্র ইতিহাসের সবচাইতে বড় গেমশোয়ের বিজয়ী হবার রেকর্ড সৃষ্টি করেছো। এক বিলিয়ন রুপি! হ্যা, পুরো এক বিলিয়ন রুপি এখন তোমার। খুব জলদি তোমাকে সেটা দেয়া হবে। লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলমেন, সাবই উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের বিজয়ীকে অভিবাদন জানান!"

আমার মাথার উপরে রঙ্গিন কাগজের টুকরো *কনফেত্তি* পড়তে লাগলো বিরামহীনভাবে। লাল, নীল হলুদ আর সবুজ রঙের স্পটলাইট পুরো মঞ্চটাকে ভাসিয়ে দিলো যেনো। সবাই উঠে দাঁড়িয়ে তালি বাজাচ্ছে। শিষ বাজানোর শব্দও পাচ্ছি আমি। প্রেম কুমার ম্যাজিশিয়ানের মতো বাও করলো আমাকে। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলো। তবে আমি আর পাল্টা চোখ টিপলাম না।

আচমকা প্রোডিউসার প্লাটফর্ম থেকে ছুটে এসে প্রেম কুমারকে নিয়ে এক কোণে চলে গেলো। উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হলো তাদের মধ্যে।

হিউস্টন, মনে হয় আমাদের এখানে বড় কোনো সমস্যা হয়েছে।

* * *

স্মিতা তার হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালো। "উফ্! অদ্ভুত একটি শো। কী দারুণ গল্প! তো আমি এবার জেনে গেলাম কিভাবে তুমি এক বিলিয়ন রুপি জিতেছো। শেষ দিকে কয়েন টস্ করাটা নিছক একটা শো ছিলো, তাই না? তুমি আসলে জানতে সঠিক জবাব হলো এ।"

"হ্যা। আপনি ঠিক করুন আমি শো'য়ের প্রাইজমানি পাবো কিনা। আমি তো আপনার কাছে সবই স্বীকার করলাম। সবই বললাম। আমার সব গোপন কথা আমি আপনাকে বলে দিয়েছি।"

"তাই তো আমার মনে হচ্ছে এখন আমার সব কথা তোমার জানা উচিত। তা না হলে সেটা হবে অন্যায়। তুমি হয়তো ভাবছো আমি কে আর কেনই বা আচমকা থানায় গিয়ে হাজির হলাম।

"হ্যা। কিন্তু আমি ঠিক করেছি অলৌকিক কোনো ব্যাপার নিয়ে প্রশ্ন করবো না।"

"আমি সেই গুড়িয়া। আমি সেই মেয়ে যাকে তুমি চাউলে থাকার সময় সাহায্য করেছিলে। আর আমার বাবাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে খুন করেছো ব'লে নিজেকে দোষী ভাববে না। তার কেবল একটা পা ভেঙেছিলো, সেই সাথে

ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো মাথার সামান্য একটা অংশ। সেই ঘটনার পর থেকে সে আর আমাকে জ্বালাতন করে নি। তোমার কাছে আমি ঋণী। অনেক বছর ধরে আমি তোমাকে খুঁজছি, কিন্তু কোথাও পাই নি। এরপরই গতকালের পত্রিকায় তোমার নামটা দেখলাম। ওতে বলা ছিলো রাম মোহাম্মদ টমাস নামের এক ছেলেকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। আমি জানতাম রাম মোহাম্মদ টমাস নামটি কেবল একজনেরই হতে পারে। তাই পুলিশ স্টেশনে ছুটে যাই সঙ্গে সঙ্গে। সুতরাং এটাকে আমার কাছে তোমার যে ঋণ আছে সেটার সামান্য একটা শোধ করা বলতে পারো।"

আমি প্রচণ্ডভাবে আবেগতাড়িত হয়ে পড়লাম। স্মিতার হাত দুটো ধরলাম আমি। ওর মাংস আর হাড় অনুভব করলাম নিজের হাতে। দু'চোখ বেয়ে অশ্রুজল গড়িয়ে পড়তে লাগলো আমার। জড়িয়ে ধরলাম তাকে। "তুমি আমাকে খুঁজে পেয়েছো বলে আমি খুব খুশি হয়েছি। একই সাথে আমি একজন উকিল, বোন আর বন্ধুকে পেয়ে গেছি।"

"তোমার সব সমস্যা এখন আমার, রাম মোহাম্মদ টমাস," চোখেমুখে সুতীব্র দৃঢ়তা নিয়ে স্মিতা বললো। "আমি তোমর জন্যে লড়াই করবো, ঠিক যেভাবে তুমি আমার জন্যে লড়াই করেছিলে।"

উপসংহার

আমার জীবনের দীর্ঘ রাতটির পর ছয় মাস কেটে গেছে।

স্মিতা তার কথা রেখেছে। একজন মা যেভাবে তার সন্তানের জন্যে লড়াই করে ঠিক সেভাবে সে আমার হয়ে লড়াই করলো। তাকে প্রথমে পুলিশকে মোকাবেলা করতে হলো। তাদেরকে সে বোঝাতে সক্ষম হলো যে, আমাকে গ্রেফতার করার কোনো ভিত্তি নেই। তাদের কাছে এ রকম কোনো অভিযোগ বা প্রমাণও নেই। সে আরো খুঁজে বের করলো, ট্রেনে কোনো ডাকাতের মৃত্যুর কথা কেউ শোনে নি। সুতরাং আমার বিরুদ্ধে এ নিয়ে কোনো তদন্ত করার দরকারও নেই। ফলে নামহীন ডাকাতটি এমন কি মৃত্যুর পরেও নামহীন একজন হয়েই রইলো।

এরপর কুইজ কোম্পানির মোকাবেলা করলো সে। তারা আমাকে ধোকাবাজি আর জালিয়াতি হিসেবে প্রমাণ করার হুমকি দিলেও স্মিতা এটা প্রমাণ ক'রে ছাড়লো যে, ডিভিডি ফুটেজ স্পষ্টতই প্রমাণ করে আমি বৈধভাবেই অনুষ্ঠানে বিজয়ী হয়েছি। চার মাস টালবাহানা করার পর কোম্পানি বাধ্য হলো পুরস্কার হিসেবে আমার পাওনা টাকা পরিশোধ করতে।

আমি অবশ্য পুরো এক বিলিয়ন রুপি পেলাম না। পেলাম একটু কম। সরকার আমার পুরস্কারের টাকা থেকে কিছু কেটে রেখে দিলো, তাদের ভাষায় 'গেমশো ট্যাক্স' হিসেবে। থ্রি-ডব্লিউ.বি কোম্পানি আমাকে আমার পাওনা পরিশোধ করার পর বিশাল আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে পাততাড়ি গোটাতে বাধ্য হলো। সুতরাং সেই শোয়ের আমিই হলাম প্রথম এবং শেষ বিজয়ী।

প্রেম কুমার দু'মাস আগে মারা গেছে। পুলিশের মতে, নিজের গাড়িতে গ্যাস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে সে। তবে পত্রপত্রিকায় এ নিয়ে অনেক কথা লেখা হয়েছে। আমার নিজের মতামত হলো, যেসব গডফাদার শো'য়ের জন্যে টাকাপয়সা দিয়েছিলো তারা প্রতিশোধ নিতেই তাকে মেরে ফেলেছে।

অনেক দিন আগেই আমি বুঝতে শিখেছিলাম স্বপ্নের কেবল তোমার নিজের মনের উপরেই প্রভাব ফেলতে পারে। তবে টাকা থাকলে অন্যদের

উপরেও এর প্রভাব ফেলানো যায়। পুরস্কারের টাকা পাবার পর আমি দেখতে পেলাম পুলিশের উপরেও আমার প্রভাব তৈরি হয়ে গেছে। তো, বেশ কয়েকজন পুলিশের প্রহরায় আমি গত মাসে গুরগাওঁয়ের পাম গাছে ঘেরা বিশাল বাড়িটাতে আবার গেছিলাম। পুলিশ সেখান থেকে পাঁচজন লোককে গ্রেফতার করে আর ত্রিশজনের মতো পঙ্গু ছেলেকে মুক্ত করে বন্দীদশা থেকে। তারা সবাই এখন একটি আর্ন্তজাতিক খ্যাতি সম্পন্ন শিশু কল্যাণ এজেন্সির তত্ত্বাবধানে রয়েছে।

লাজওয়ান্তিকে জেল থেকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে গত মাসেই। এখন সে আমার সাথেই মুম্বাইতে বসবাস করছে। সত্যি বলতে কি, গত সপ্তাহে সে তার বোনের বিয়ে দিয়ে দিল্লি থেকে ফিরে এসেছে। ইন্ডিয়ান প্রশাসনিক সার্ভিসে কর্মরত এক ছেলের সাথে তার বোন লক্ষ্মীর বিয়ে হয়েছে। ছেলেপক্ষ কোনো ধরণের যৌতুক দাবি না করলেও লাজওয়ান্তি তার বোনকে একটা টয়োটা কোরোলা, বত্রিশ ইঞ্চির রঙ্গি টিভি, বিশটি রেমন্ড সুট আর এক কিলো সোনাদানা দিয়েছে।

সেলিম প্রখ্যাত পরিচালক চিম্পু দেওয়ানের নতুন কমেডি ছবিতে সতেরো বছরের এক কলেজ ছাত্রের চরিত্রে অভিনয় করতে যাচ্ছে। ছবিটির শুটিং হবে মেহবুব স্টুডিওতে। তার ধারণা ছবির প্রযোজকের নাম মোহাম্মদ ভাট, তবে আসলে সেটা আমি নিজে।

মুম্বাইয়ে আমার ভালোবাসার মানুষটি আমার সাথে যোগ দিয়েছে। এখন সে আমার আইনত স্ত্রী। একেবারে যথাযথ পদবী সহকারে। নিতা মোহাম্মদ টমাস।

* * *

স্মিতা আর আমি মেরিন ড্রাইভে হাটছি। বাতাসে মিষ্টি একটা গন্ধ ভেসে আসছে। মাঝেমধ্যে সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ে সেখান থেকে পানির ছিটা এসে লাগছে আমাদের মুখে। পোশাক পরা ড্রাইভার মার্সিডিজ বেঞ্চ গাড়িটা পার্ক ক'রে আমাদের থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে আমাদের সাথে সাথেই হাটছে। মার্সিডিজটার পেছনের বাম্পারে একটা স্টিকার লাগানো। তাতে লেখা আছে, 'আমার অন্য গাড়িটা হলো ফেরারি।'

"আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছিলাম," স্মিতাকে বললাম আমি।

"বলে ফেলো।"

"পুলিশ স্টেশন থেকে যে রাতে তুমি আমাকে বাঁচালে তখন কেন সোজাসুজি বলো নি তুমিই গুড়িয়া?"

"কারণ আমি তোমার কাছ থেকে গল্পটা শুনতে চাচ্ছিলাম। জানতে চাচ্ছিলাম সত্যটা কি। আমি তোমার সামনে বসে আছি এটা না জেনেই তুমি যখন আমার নিজের গল্পটা বললে তখনই বুঝলাম তুমি সত্য বলছো। একদম সত্য। সেজন্যেই তোমাকে বলেছিলাম কোনো বই ছুঁয়ে শপথ করার দরকার নেই। আমিই তোমার সত্য-মিথ্যার সাক্ষী। যেমনটি তুমি আমার।"

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

"তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি?" স্মিতা এবার আমাকে বললো।

"অবশ্যই।"

"তোমাকে পুলিশ স্টেশন থেকে আমার বাড়িতে নিয়ে এলে তুমি তোমার গল্প বলার আগে একটা কয়েন দিয়ে টস্ করেছিলে। কেন?"

"তোমাকে বিশ্বাস করবো কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছিলাম না। কয়েনটা আমার সিদ্ধান্ত নেবার একটা মেকানিজম। হেড হলে তোমাকে গল্পটা বলতাম, টেইল হলে বলতাম না। হেড পড়েছিলো সেদিন।"

"তাহলে ঐ দিন হেড না পড়লে তুমি আমাকে কিছুই বলতে না?"

"টেইল কখনই পড়তো না।"

"তুমি দেখি ভাগ্যে একটু বেশিই বিশ্বাস করো।"

"এর সাথে ভাগ্যের কি আছে? এই যে, দ্যাখো কয়েনটা।" পকেট থেকে কয়েনটা বের করে তার হাতে তুলে দিলাম।

কয়েনটা হাতে নিয়ে দু'পাশই উল্টে দেখলো স্মিতা। বার কয়েক দেখলো সে। "এটা...এটার তো দেখি দু'দিকেই হেড!"

"ঠিক। এটাই আমার সৌভাগ্যের কয়েন। তবে যা বলেছি, এর সাথে ভাগ্যের কোনো সর্ম্পকই নেই।"

আমি কয়েনটা তার কাছ থেকে আমার হাতে নিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে দিলাম। সূর্যের আলোতে মুহূর্তের জন্যে সেটা চকচক ক'রে উঠে সমুদ্রের পানিতে গিয়ে পড়লো।

"তুমি তোমার লাকি কয়েনটা ফেলে দিলো কেন?"

"আমার আর এটার কোনো দরকার নেই। কারণ ভাগ্য এমনিতেই আসে।"

বাতিঘর প্রকাশনীর উল্লেখযোগ্য এবং জনপ্রিয় বইয়ের তালিকা :

দ্য দা ভিঞ্চি কোড : মূল : ড্যান ব্রাউন, অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, পৃ : ৪৪৮, মূল্য: ৩০০.০০ টাকা

দু'হাজার বছরের পুরনো একটি সত্যকে চিরতরে নির্মূল করার জন্যে প্যারিসে একই দিনে চারজন প্রখ্যাত ব্যক্তিকে হত্যা করা হলো। সত্যটি জনাজানি হয়ে গেলে একটি প্রতিষ্ঠিত ধর্মের ভিত্তি কেঁপে যাবে, হাজার বছরের ইতিহাস লিখতে হবে একেবারে নতুন ক'রে। হাজার বছর ধরেই সেই সত্যটি লালন ক'রে আসছে একটি গুপ্ত সংঘ—সেই গুপ্ত সংঘের সদস্য ছিলেন আইজ্যাক নিউটন, ভিক্টর হুগো, বত্তিচেল্লি আর লিওনার্দো দা ভিঞ্চির মতো ব্যক্তিবর্গ। এ দিকে উগ্র ক্যাথলিক সংগঠন ওপাস দাই সেই সত্যকে চিরতরে ধ্বংস করার আগেই গুপ্তসংঘের গ্র্যান্ডমাস্টার তার ঘনিষ্ঠ একজনের কাছে হস্তান্তর ক'রে দেয় আর ঘটনাচক্রে এরকম একটি মারাত্মক মিশনে জড়িয়ে পড়ে হারর্ভাডের এক অধ্যাপক এবং সিম্বোলজিস্ট।

সাম্প্রতিককালের সবচাইতে আলোড়নসৃষ্টিকারী এই উপন্যাসটি পাঠকের মনোজগৎ নাড়িয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে।

গডফাদার : মূল : মারিও পুজো, অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, পৃ : ৪০০, মূল্য : ২৪০.০০ টাকা

দুর্বল যখন আদালতের সুবিচার পায় না তখন হাজির হয় এক গোপন বিচারকের কাছে। রাজনীতিবিদরা ক্ষমতার স্বাদ নিতে আর ব্যবসায়ীরা সাহায্যের জন্যে ছুটে যান তারই কাছে। নিজেই নিজের নিয়ম তৈরি করে সৃষ্টি করেছেন এক জগৎ। সেই জগতে তিনিই একচ্ছত্র অধিপতি। বন্ধুর জন্যে নিজের জীবন বিপন্ন করতে পিছ পা হন না, শত্রুর কাছে ভয়ঙ্কর এক বিভীষিকা। তিনি বিশ্বাস করেন প্রতিটি মানুষের একটাই নিয়তি থাকে আর সেটা তৈরি হয় ঘটনাচক্রে। সমাজের ভেতর সমাজ আর রাষ্ট্রের ভেতর রাষ্ট্রের যে জগৎ সেই জগতের শক্তিকেন্দ্রে ব'সে সবার অলক্ষ্যে কলকাঠি নাড়েন গডফাদার।

মারিও পুজো'র কালজয়ী এই উপন্যাসটি পাঠকের অবশ্যই পড়া উচিত।

দ্য ডে অব দি জ্যাকেল: মূল:ফ্রেডরিক ফরসাইথ, অনুবাদ:মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন,পৃ: ৩২০ মূল্য : ২৪০.০০টাকা

লম্বা সোনালী চুলের এক ইংরেজ। পেশায় ভাড়াটে খুনি। পৃথিবীর বড় বড় গোয়েন্দা সংস্থা কিংবা সিক্রেট সার্ভিসের কাছে সে অজ্ঞাত-অপরিচিত। সম্পূর্ণ একা, বিশেষভাবে তৈরি করা একটি রাইফেল নিয়ে ইতিহাসের গতিপথ বদলে দেবার মিশনে নেমেছে সে। অপ্রতিরোধ্য জ্যাকেলকে থামাবে কে, কিভাবে—কেউ জানে না।

এটি ফ্রেডরিক ফরসাইথ'র কালজয়ী থ্রিলার।

সাইলেন্স অব দি ল্যাম্বস্: মূল :টমাস হ্যারিস, অনুবাদ:মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, পৃ : ৩২০ মূল্য : ২৪০.০০ টাকা

অজ্ঞাতনামা এক সিরিয়াল কিলার একের পর এক তরুণীকে বীভৎসভাবে হত্যা ক'রে চলেছে। প্রবল চাপে দিশেহারা এফবিআই সেই খুনির পরিচয় জানতে তাদের এক এজেন্টকে পাঠায় নয়টি নরহত্যার দায়ে অভিযুক্ত মানুষখেকো ডক্টর হ্যানিবাল লেকটারের কাছে। দুর্বোধ্য আর ধূর্ত লেকটার তার অসাধারণ মেধার সাহায্যে সেই খুনিকে ধরিয়ে দিতে সাহায্য করবে নাকি চরিতার্থ করবে নিজের উদ্দেশ্য—সেই প্রশ্নের উত্তর পাঠক খুঁজে পাবেন শতাব্দীর সেরা অসাধারণ এই সাইকো থ্রিলারে।

রেড ড্রাগন : মূল : টমাস হ্যারিস, অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, পৃ : ৩২০ মূল্য : ২৪০.০০ টাকা

ভয়ঙ্কর এক সিরিয়াল কিলারকে ধরার জন্যে মরিয়া এফবিআই তাদের সেরা এজেন্ট উইল গ্রাহামকে কুখ্যাত ডক্টর লেকটারের কাছে পাঠায়। ভয়ঙ্কর সেই খুনির পিছু নিতে গিয়ে উইল গ্রাহাম বুঝতে পারে ধূর্ত খুনি এখন তাকেই টার্গেট ক'রে ফেলেছে আর এ কাজে বন্দী অবস্থায়ও সাহায্য করেছে স্বয়ং ডক্টর লেকটার। বাঁচার একটাই পথ খোলা আছে—সেই ধূর্ত খুনিকে পাকড়াও করা। এক সময় সবাই যখন নিশ্চিত হয় খুনি মারা গেছে তখনই চূড়ান্ত আঘাত হানা হলো—কিন্তু কে, কিভাবে?

এই উপন্যাসের মাধ্যমে ডক্টর হ্যানিবাল লেকটার চরিত্রটির আর্বিভাব ঘটে। এটি বিশ্ববিখ্যাত সাইকো থ্রিলার *সাইলেন্স অব দি ল্যাম্বস্*'র প্রিকুয়েল।

বর্ন আইডেন্টিটি : মূল রবার্ট লুডলাম, অনুবাদ মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, পৃ ৫১২ মূল্য : ৩৫০.০০ টাকা

তার কোনো অতীত নেই। সম্ভবত ভবিষ্যৎও নেই। তার স্মৃতিভাণ্ডার একেবারেই শূন্য। সে কেবল জানে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ভূ-মধ্যসাগর থেকে একদল জেলে তাকে উদ্ধার করেছে। নিজের শরীরে সংযুক্ত থাকা অদ্ভুত একটি ক্লু উদ্ধার হলে নিজের পরিচয় উদঘাটনের জন্যে মরিয়া ওঠে সে আর সেই সঙ্গে প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী আর হিংস্র একদল লোক তাকে হত্যা করার জন্যে হন্যে হয়ে ওঠে। ওদিকে সন্ত্রাসের যুবরাজ কার্লোস দি জ্যাকেলও তাকে খুন করার জন্যে পিছু নেয়—কিন্তু কেন, কিসের জন্যে, তার কিছুই জানে না জেসন বর্ন। একে একে বদলে যেতে থাকে তার পরিচয়, বেরিয়ে আসতে থাকে লোমহর্ষক সব ঘটনা। শেষপর্যন্ত কি জেসন বর্ন এই সব ভয়ঙ্কর লোকের হাত থেকে বাঁচতে পারবে, জানতে পারবে নিজের ভয়ঙ্কর অতীত আর সত্যিকারের পরিচয়—*বর্ন আইডেন্টিটি*তে পাঠক সেই প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাবেন।

বর্ন ট্রলোজির এই প্রথম পর্বটি পাঠককে অসাধারণ চরিত্র জেসন বর্ন-এর সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে।

বর্ন সুপ্রমেসি : মূল : রবার্ট লুডলাম, অনুবাদ : রিশাদ হাবীব, পৃ : ৪৪৮ মূল্য : ৩২০.০০ টাকা

জেসন বর্ন আবার ফিরে এসেছে! চায়নার ভাইস প্রিমিয়ারকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে। জানা গেলো তার নাম ব্যবহার ক'রে আরেক খুনি সুদূর প্রাচ্যে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে গভীর এক ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে। সেই খুনিকে থামাতে না পারলে পৃথিবীকে চরম মূল্য দিতে হবে। আর এ কাজ করতে পারে কেবল আসল জেসন বর্ন। আবারো তাকে এ কাজ করতে বাধ্য করা হলো। কিন্তু যারা তাকে এ কাজ করতে বাধ্য করলো তারা বুঝতে পারলো, তাকে নিয়ে খেলতে যাওয়াটা মোটেও ঠিক হয় নি।

দান্তে ক্লাব : মূল : ম্যাথিউ পার্ল, অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, পৃ : ৪৩২ মূল্য : ৩০০.০০ টাকা

গৃহযুদ্ধের বিভীষিকা শেষ হতে না হতেই বোস্টন শহরে ঘটতে থাকে ভয়ঙ্কর সব হত্যাকাণ্ড—অভিনব আর বীভৎসভাবে হত্যা করা হয় শহরের গন্যমান্য ব্যক্তিদেরকে। ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে সবগুলো হত্যাকাণ্ডই মহাকবি দান্তের মহাকাব্য ইনফার্নো'র অনুপ্রেরণায় করা হয়েছে। মারাত্মক এক ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায় দান্তের সাহিত্যকর্ম। এ দিকে হারভার্ড কেন্দ্রিক দান্তে ক্লাবের কয়েকজন পণ্ডিতব্যক্তি এবং বিখ্যাত কবি লংফেলো এই রহস্যের জট খুলতে নেমে পড়েন—কে খুন করছে, আর কেনই বা করছে, সেই প্রশ্নের জবাব পাবার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠেন তারা। যারা দান্তে সম্পর্কে জানেন এবং যারা কিছুই জানেন না উভয়ের জন্যে এই বইটি হতে পারে কৌতূহলোদ্দীপক।

মোনালিসা : মূল :ডোনাল্ড সাসুন, অনুবাদ: মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, পৃ : ৩০৪ (১৬ পৃ: রঙ্গিন) মূল্য : ২৫০.০০ টাকা

কী জন্যে মোনালিসা এ বিশ্বের সবচাইতে বিখ্যাত চিত্রকর্ম? কেন? পাঁচশত বছর ধরে ছবিটা রহস্যের উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। ডোনাল্ড সাসুন অনবদ্য ভঙ্গীতে মোনালিসা'র ইতিহাস, নান্দনিকতা, রহস্য আর আধুনিক বিশ্বে এর প্রভাব বিবৃত করতে গিয়ে শিল্পজগতের যে চিত্র উন্মোচন করেছেন—এক কথায় তাকে অসাধারণ বলতেই হয়। সংগ্রহে রাখার মতো একটি বই।

ওডেসা ফাইল : মূল:ফ্রেডরিক ফরসাইথ, অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, পৃ : ২৮৮ মূল্য : ২০০.০০

পরাজিত নাৎসিদের গোপন সংগঠন ওডেসার ক্ষমতাশালী কয়েকজন সদস্য বিদেশের মাটিতে ব'সে এক ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। কিন্তু কাকতালীয়ভাবেই সেই ঘটনায় ঢুকে পড়ে ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক পিটার মিলার। নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে সে ঢুকে পড়ে ওডেসার অভ্যন্তরে। নিতান্তই কি একটি এক্সক্লুসিভ রিপোর্টিংয়ের জন্যে মিলার এমনটি করছে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ওডেসার ভেতরে—নাকি এর পেছনে রয়েছে অন্য কোনো ঘটনা!

ফ্রেডরিক ফরসাইথের আরেকটি অসাধারণ থ্রিলার।

ডগ্‌স অব ওয়ার : মূল :ফ্রেডরিক ফরসাইথ, অনুবাদ:মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, পৃ : ৩২০ মূল্য : ২৪০.০০ টাকা

আফ্রিকার এক ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে আবিষ্কৃত হলো প্লাটিনাম সমৃদ্ধ দশ বিলিয়ন ডলারের একটি পাহাড়। বৃটিশ এক ধনকুবের সেই দেশের সরকারকে উৎখাত ক'রে পুরো পাহাড়টি কুক্ষিগত করার জন্যে একদল ভাড়াটে যোদ্ধাকে নিয়োগ করে। কিন্তু ভাড়াটে যোদ্ধাদের দলনেতা ক্যাট শ্যাননের পরিকল্পনা সম্পূর্ন ভিন্ন রকম। ফরসাইথের এই উপন্যাসটি সত্যিকারের একটি ঘটনা অবলম্বনে যাতে স্বয়ং লেখকও জড়িত ছিলেন ব'লে গুজব রয়েছে।

দি আফগান : মূল : ফ্রেডরিক ফরসাইথ, অনুবাদ : নাভিদ হোসেন, পৃ : ২৮৮ মূল্য : ২২০.০০ টাকা

আল কায়েদা যখন টুইন টাওয়ারের চেয়েও মারাত্মক একটি আক্রমণের পরিকল্পনা করছে তখনই ঘটনাচক্রে

তাদের সেই পরিকল্পনার কথা জেনে যায় বৃটিশ-মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা। কিন্তু কবে, কিভাবে, কোথায় সেই হামলা হবে সে সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই নেই। এসব জানার জন্যে তারা আল কায়েদার অভ্যন্তরে একজন এজেন্টকে অনুপ্রবেশ করায়। এজেন্ট মাইক মার্টিন যখন পুরো ঘটনাটি জানতে পারে তখন তাদেরকে থামানোর জন্যে তার আর কিছু করার থাকে না। কিন্তু হাল ছেড়ে দেয়ার পাত্রও সে নয়। কিভাবে থামানো যাবে—সেই প্রশ্নের উত্তর নিহিত আছে *আফগান* উপন্যাসে।

শ্যাডো ওভার ব্যাবিলন: মূল:ডেভিড ম্যাসন, অনুবাদ:নাভিদ হোসেন, পৃ : ৩৫২ মূল্য : ২৫০.০০ টাকা

সাদ্দাম হুসেনকে হত্যার জন্যে পর্দার আড়াল থেকে একটি শক্তি একদল ভাড়াটে যোদ্ধাকে নিযুক্ত করেছে—আমেরিকা আর বৃটেন অনেকটা কাকতালীয়ভাবেই সেই খবরটা জানতে পেরে বিস্মিত হয়। তাদের অগোচরে কারা এ কাজ করতে মাঠে নেমেছে? পরিস্থিতির কারণে বাধ্য হয়েই তারা নিজেদের টার্গেটকে বাঁচানোর জন্যে সেই ভাড়াটে যোদ্ধাদেরকে নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর হয়। ওদিকে ভাড়াটে যোদ্ধারা বিভিন্ন বাধা পেরিয়ে তাদের কাজে সফল হয়, আবার সাদ্দাম হুসেনও জীবিত থেকে যান! এমনই এক রোমাঞ্চকর কাহিনী।

সবশেষে যখন পাঠক জানতে পারবেন সেই আড়ালে থাকা শক্তিটির কথা নিঃসন্দেহে অবাক হবেন।

ফার্স্ট ব্লাড : মূল : ডেভিড মোরেল, অনুবাদ : নাভিদ হোসেন, পৃ : ২০২ মূল্য : ১৮০.০০ টাকা

ভিয়েতনাম যোদ্ধা র‍্যাম্বো। যুদ্ধের বিভীষিকা আর ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা নিয়ে বিপর্যস্ত মানসিক অবস্থায় ফিরে এসেছে নিজ দেশে। সন্দেহজনক গতিবিধির কারণে পুলিশ তাকে গ্রেফতার ক'রে থানায় নিয়ে গেলে শুরু হয় এক প্রলয়ংকরী কাণ্ড। অসাধারণ যোদ্ধা র‍্যাম্বোকে আটকে রাখার মতো ক্ষমতা রাখে না কোনো পুলিশ কিংবা সেনাবহিনী। একের পর এক হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে পুরো রাজ্যে হৈচৈ ফেলে দেয় সে। তাকে ধরার জন্যে মরিয়া ওঠে কয়েকটি রাজ্যের নিরাপত্তাবাহিনী। কিন্তু তাকে ধরা কিংবা হত্যা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। শুরু হয় মানুষ শিকারের এক মহা আয়োজন।

বিশ্বখ্যাত র‍্যাম্বো চরিত্রটি এই উপন্যাসের মাধ্যমেই আর্বিভূত হয়েছিলো। পাঠকের জন্যে দারুণ একটি উপন্যাস।

এ্যাবসলিউট পাওয়ার: মূল:ডেভিড বালদাশি, অনুবাদ: মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন,পৃ: ৩৫২ মূল্য: ২৫০.০০ টাকা

নিশুতি রাতে গোপন এক অভিসারে লিপ্ত হয় প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী এক লোক। দূর্ঘটনাক্রমে সেখানে একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হলে সেই বাড়িতে চুরি করতে আসা এক চোর পুরো ঘটনাটি দেখে ফেলে। যখন জানা যায় এই কর্মকাণ্ডের একজন সাক্ষী রয়েছে, শুরু হয় সেই চোরকে নির্মূল করার অভিযান। কিন্তু লুথার হুইটনি দমে যাবার পাত্র নয়। সেও এ বিশ্বের সবচাইতে ক্ষমতাশালী লোকটির বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধের সূচনা করে। বেরিয়ে আসতে থাকে একের পর ঘটনা। অবশেষে লুথার হুইটনি তার মিশনে সফল হয়েছিলো কিনা সেই প্রশ্নের জবাব পেতে হলে পড়ুন *এ্যাবসলিউট পাওয়ার*।

পেলিকান বৃফ : মূল : জন গৃশাম, অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, পৃ : ৩২০ মূল্য : ২৪০.০০ টাকা

এক রাতে আমেরিকার সুপৃমকোর্টের দু'জন বিচারক খুন হলে তদন্ত কাজ শুরু হয়। আইনের এক ছাত্রি নিতান্তই কৌতুহল আর একাডেমিক কারণে জড়িয়ে পড়ে সেই ঘটনায়। নিজের জীবন বিপন্ন দেখে আত্মগোপনে চলে যায় সে। আরো অনেকগুলো হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। এক সময় মনে হয় খুনির সাথে হোয়াইট হাউজের সম্পর্ক আছে, কিন্তু শেষে গিয়ে পাঠক দেখবেন একেবারেই ভিন্ন একটি ঘটনা।

ট্রু হিস্টোরি অব দি কেলি গ্যাং: মূল: পিটার ক্যারি, অনুবাদ:রাই শিল্পী, পৃ:৩২০ মূল্য : ২৪০.০০ টাকা

উনিশ শতকে অস্ট্রেলিয়ার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে নায়ক বনে যাওয়া কেলি এবং তার দলের সত্যিকারের উপাখ্যান নিয়ে রচিত একটি মর্মস্পর্শি উপন্যাস। লেখক এখানে কেলির বর্ণনায় কাহিনীটি বিবৃত করলেও নিজরে দক্ষতারও স্বাক্ষর রেখেছেন। অসাধারণ বর্ণনা আর কৌতুহলোদ্দীপক সব চরিত্র নিয়ে এই উপন্যাসের কাহিনী এগিয়েছে। পিটার ক্যারির এই উপন্যাসটি মর্যাদাপূর্ণ বুকার প্রাইজ এবং কমনওয়েলথ রাইটার্স প্রাইজ লাভ করেছে।

কোমা : মূল : রবিন কুক, অনুবাদ : প্রিন্স আশরাফ, পৃ : ৩২০ মূল্য : ২৪০.০০ টাকা

বোস্টন মেমোরিয়াল হাসপাতালে একের পর এক রোগী অপারেশন থিয়েটারে কোমায় আক্রান্ত হচ্ছে। সুজান হুইলার নামের এক মেডিকেল ছাত্রি হাসপাতালে তার প্রথম কর্মদিবসেই জড়িয়ে পড়ে সেই ঘটনার রহস্য উদঘাটনে। কিন্তু অদৃশ্য একদল লোক তার জীবননাশের জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে। এ কাজ থেকে তাকে বিরত রাখতে চায় তারা। অদম্য সুজান যখন সেই রহস্য উদঘাটনে সফল হলো তখন দেখা গেলো তার

নিজের জীবনটাই বিপন্ন হতে বসেছে। কিন্তু অন্য আরেকজন শেষ মুহূর্তে সমস্ত হিসেব নিকেশ পাল্টে দেয়। মেডিকেল থ্রিলারের জনক রবিন কুকের এই উপন্যাসটি বর্তমানে একটি ক্লাসিক হিসেবে স্বীকৃত।

অ্যাভেঞ্জার : মূল : ফ্রেডরিক ফরসাইথ, অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, পৃ ২৫৬ মূল্য ২০০.০০ টাকা

এক আশ্চর্য চরিত্র ক্যালভিন ডেক্সটার। ভিয়েতনাম যুদ্ধ ফেরত একজন, নিজের একমাত্র সন্তান মেয়ে আর স্ত্রীকে হারানোর পর বদলে যায় তার জীবন। অ্যাভেঞ্জার নাম নিয়ে শুরু করে নতুন এক মিশন। ওদিকে ধনী এক লোক তার নাতির হত্যাকারী সার্বিয়া-বসনিয়ার এক কুখ্যাত গণহত্যাকারীকে ধরার জন্যে নিয়োগ করে ডেক্সটারকে। শুরু হয় ডেক্সটারের অভিযান।

প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে ভিয়েতনাম, সার্বিয়া থেকে আমেরিকা, সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান, আল কায়েদা এবং সব শেষে টুইন টাওয়ারের ধ্বংসলীলা——সুবিস্তৃত এক পুট বিধৃত হয়েছে *অ্যাভেঞ্জার*-এ। পাঠক ক্যালভিন ডেক্সটারে মুগ্ধ হবেন এবং সত্যিকারের রোমাঞ্চ অনুভব করবেন।

আইকন : মূল : ফ্রেডরিক ফরসাইথ, অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, পৃ : ২২৪ মূল্য : ১৭০.০০ টাকা

এক সময়কার পরাশক্তি বর্তমানে অরাজকতার দ্বারপ্রান্তে। ক্যারিশম্যাটিক এক নেতা দেশবাসীকে নতুন আশার আলো দেখাচ্ছেন, বিশ্ববাসীকে শান্তির অভয় বাণী শোনাচ্ছেন, অন্যদিকে এক ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন তিনি। ঘটনাচক্রে তর পরিকল্পনার কথা জেনে যায় পশ্চিমা বিশ্ব। এই বীভৎস ষড়যন্ত্র থামানোর জন্যে দায়িত্ব দেয়া হয় জেসন মঙ্ককে। যেকোনো মূলে এই ষড়যন্ত্রও থামানোর মিশন নিয়ে মাঠে নামে সে। কিন্তু তারপর...ইতিহাসের এই অনিবার্য গতিপথ কি থামানো যাবে।

বডি অব এভিডেন্স : মূল : প্যাট্রিশিয়া কর্নওয়েল, অনুবাদ : বশীর বারহান, পৃ : ৩৩৬ মূল্য : ২৫০.০০ টাকা

প্যাট্রিসিয়া কর্নওয়েল-এর অসাধারণ সৃষ্টি স্কারপেট্টাকে মোকাবেলা করতে হয় ভয়ঙ্কর এক খুনির, যেকিনা বিখ্যাত এক সাহিত্যিককে হত্যা করেছে। ঔপন্যাসিকার অতীত জীবনের সাথে এই হত্যা রহস্যের সংযোগ রয়েছে। সুতরাং স্কারপেট্টাকে আগে জানতে হবে নিহতের ব্যক্তি জীবন। আর সেটা জানতে গিয়েই বিপদে পড়ে যায় সে। ভিন্নধর্মী এই মার্ডার থ্রিলারটি পাঠককে বেশ ভালো আনন্দ দেবে।

দ্য মানচুরিয়ান ক্যানডিডেট: মূল : রিচার্ড কনডন, অনুবাদ : নাভিদ হোসেন, পৃ : ৩০৪ মূল্য : ২৪০.০০ টাকা

ভয়ঙ্কর এক পরিকল্পনা—এক সৈনিককে ব্রেনওয়াশ করা হয় অসাধারণ একটি ষড়যন্ত্রের কারণে। তারপর...বাকিটার আস্বাদ গ্রহণ করতে পাঠককে সাদর আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

রিচার্ড কনডনের এই মাইলস্টোন থ্রিলারটি পাঠকের ভালো লাগবে।

যুযুধা : প্রিন্স আশরাফ, পৃ : ৩২০ মূল্য : ২৪০.০০ টাকা

দেশীয় প্রেক্ষাপটে নির্মিত চমৎকার একটি থ্রিলার। নানান ষড়যন্ত্র আর ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেছে এর কাহিনী। এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলার মতো একটি সাহসী আর ভিন্নধর্মী থ্রিলার।

মে ডে : মূল : ক্লাইভ কাসলার, অনুবাদ : মখদুম আহমেদ, পৃ : ২১৮ মূল্য : ২০০.০০ টাকা

ক্লাইভ কাসলা'র সৃষ্ট চরিত্র ডার্ক পিট'এর প্রথম অভিযান এটি। পাঠকের ভালো লাগবে।

রেড অ্যালার্ট : মূল : অ্যালিয়েস্টার ম্যাকলিন, অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, পৃ : ২৭২, মূল্য : ২০০.০০ টাকা

অ্যালিয়েস্টার ম্যাকলিনের টান টান উত্তেজনার অনবদ্য একটি থ্রিলার।

হোয়াইটআউট : মূল : কেন ফোলেট, অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, পৃ : ৩২০ মূল্য : ২৫০.০০ টাকা]

সুরক্ষিত এক ল্যাবরেটরি থেকে প্রাণঘাতি ভয়ঙ্কর ভাইরাস চুরি হয়ে গেলে এর নিরাপত্তায় থাকা টনি গ্যালো পিছু নেয় উদ্ধারের জন্যে। এটা কেবল মাত্র অসংখ্য মানুষকেই বিপন্ন করবে না, ধ্বংস করে দেবে তাকে এবং তার প্রিয় একজন মানুষকে। একে একে যখন জট খুলতে থাকে তখন বদলে যেতে থাকে সমস্ত দৃশ্যপট। কিন্তু টনি গ্যালো হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। বিরূপ আবহাওয়া আর নিজেদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা শত্রুকে পরাস্ত করে এগিয়ে যেতে থাকে সে।

দ্য নাইট অব দি জেনারেল: মূল : এইচ.এইচ কার্স্ট, পৃ: ৩৩৬ মূল্য : ২৪০.০০ টাকা

জার্মান অধিকৃত পোল্যান্ডে এক বেশ্যার হত্যাকাণ্ড থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসতে থাকে এক গোপন ষড়যন্ত্র। হিটলারের সেনাবাহিনীর মধ্যেকার এক অজানা কাহিনী উন্মোচিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উপর লেখা হান্স হেলমুট কার্স্টের অসাধারণ এই থ্রিলারটি পাঠকের অবশ্যই পড়ে দেখা উচিত।

মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন-এর মৌলিক থ্রিলার

■ **নেমেসিস :** দেশের সবচাইতে জনপ্রিয় লেখক পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবস্থায় মারা গেলেন। সন্দেহের তীর গিয়ে পড়লো লেখকের যুবতী স্ত্রীর ওপর। বেরিয়ে এলো নানান কাহিনী। একে একে সন্দেহের আওতায় চলে এলো অনেক হোমরা চোমরার নাম। হোমিসাইড ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগ শুরুতে সফলতা পেলেও এক পর্যায়ে ঘটনার কূলকিণারা করতে গিয়ে হিমশিম খেতে শুরু করলো। পর্দার আড়াল থেকে একটি শক্তিশালী মহল সক্রিয় হয়ে উঠলো তদন্তে বাধা দেবার জন্যে। শেষ পর্যন্ত জেফরি বেগ যা জানতে পারলো তা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। কী সেই ঘটনা জানতে হলে পড়ুন *নেমেসিস*।

■ **ম্যাজিশিয়ান :** উঠতি এক ম্যাজিশিয়ান প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রাম করে যাচ্ছে আর একদল লোক মরিয়া হয়ে উঠছে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্যে। শুরু হলো একটি ভয়াবহ ষড়যন্ত্র। তারপর...বিশ্বাসঘাতকতা আর পাল্টা ষড়যন্ত্র। সব কিছু ভেদ করে ম্যাজিশিয়ান কি পারবে নিজেকে রক্ষা করতে? ভিন্নধর্মী একটি থ্রিলার–ভিন্নধর্মী স্বাদ পাবেন পাঠক।

■ **মেডুসা কানেকশান** ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরের দু'দিন আগে, সুদূর আফগানিস্তানে একটি ঘটনা ঘটে গেলো। ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সেই আফগানিস্তানে শুরু হলো গোপন একটি অপারেশন। সেই ঘটনা আবার শুরু করলো নতুন আরেকটি ষড়যন্ত্রের। কি সেই ষড়যন্ত্র–জানতে হলে পড়ুন *মেডুসা কানেকশান*।

আরো যেসব বই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে:

■ *বর্ন আলটিমেটাম*–রবার্ট লুডলামের বর্ন ট্রিলোজির শেষ উপাখ্যান

■ *পয়েন্ট অব ইম্প্যাক্ট*–স্টিফেন হান্টারের অসাধারণ একটি থ্রিলার

■ *ফায়ার ফক্স*–ক্রেইগ টমাসের হাইস্পিড থ্রিলার

■ *থ্রি মিসটেক্স অব মাই লাইফ*–চেতান ভগতের অসাধারণ একটি উপন্যাস। পাঠককে ভিন্নধর্মী স্বাদ দেবে

■ *ওয়ান নাইট এ্যাট দি কলসেন্টার*–চেতান ভগতের আরেকটি অসাধারণ উপন্যাস।

■ *হ্যানিবাল*–টমাস হ্যারিসের হ্যানিবাল লিগ্যাসির তৃতীয় পর্ব

■ *দি আমেরিকান*–হেনরি জেমসের ক্লাসিক উপন্যাস

■ *ভিক্টোরিয়া ভিলা*–আগাথা ক্রিস্টির চমৎকার একটি বই

■ *জাস্ট এ্যানাদার সাকার*–রিচার্ড হেডলি চেজের একটি থ্রিলার

■ *আফটার দি ফিউনারেল*–আগাথা ক্রিস্টির আরেকটি সেরা কাজ

■ *নো ওয়ান হিয়ার গেটস্ আউট এ্যালাইভ*–প্রখ্যাত রক গায়ক জিম মরিসনের জীবনীমূলক উপন্যাস

■ *কিপ দ্য ফ্লেমিং এলাইভ*–ম্যাকলিনের আরেকটি চমৎকার থ্রিলার